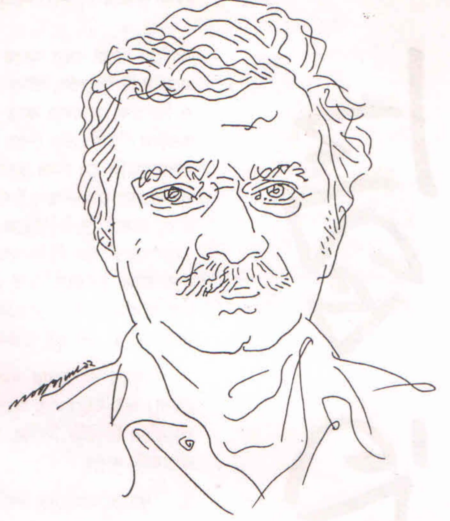


পৌষ ১৪১৯ : জানুয়ারি ২০১৩



মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা

স্কেচ ও ক্যালিগ্রাফি : দেবব্রত ঘোষ

কবিতায় ফটোগ্রাফ : অরুণাভ পাত্র

কার্টুন : তাপস সরকার

কাহিনিকার্টুন : পিনাকপাণি ঘোষ ও সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

শূ ন্য স্থা ন পূ র ণ

ওপ্‌নে হিংসার কথা বলি

প্রায় একবছর আগে, যখন আলগোছে তাঁকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা করার প্রাথমিক ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলাম, মৃদুলদা যেভাবে রিয়্যাক্ট করেছিলেন, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শেষমেশ যে রাজি হয়েছেন, সে-জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মৃদুল দাশগুপ্তকে নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটাই আমাদের কাছে একটা ঘটনা!

তবে, বলে রাখা ভালো, একেবারেই কোনো ব্যক্তিপুজোর মোটো নিয়ে এই সংখ্যা করা নয়। খুব নিরপেক্ষ জায়গা থেকে স্রষ্টা ও মানুষ মৃদুল দাশগুপ্তকে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। সেই প্রয়াসে যে কিছুটা অসাফল্য রয়েছে, শুরুতেই স্বীকার করে নিই। কোথাও বা পুনরাবৃত্তিও খুঁজে পাবেন পাঠক। এসব সত্ত্বেও, এই সংখ্যায় সেই মৃদুল দাশগুপ্ত নিশ্চিতভাবে আছেন, যিনি শুধু 'কবি' নন, বরং 'স্রষ্টা'। আমরা এ-ও বিশ্বাস করি, তিনি যদি কবিতা না লিখতেন, তবুও, স্রেফ তাঁর গদ্য ও ছড়ার কারণে বাঙালি পাঠক তাঁকে মনে রাখত। এখন ব্যাপারটা এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তিনি যেহেতু কবিতার রাস্তা ধরেই পাড়ি দিতে চেয়েছেন, বাংলা বাজার-ও তাঁর ছড়া বা গদ্যের গলিতে সেভাবে ঢুঁ মারা জরুরি মনে করেনি। তাঁর ছড়ার বই চারটি; কিন্তু আজ তা আদৌ পাওয়া যায় কিনা, গেলে কোথায় — ক-জন জানেন? যদি আউট অফ প্রিন্টই হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও ইকনমিক্স এটুকু প্রমাণ করতে পারে — সে-বই-এর চাহিদা আছে, জোগান নেই। আবার, মৃদুল দাশগুপ্তের ছোটোগল্প ক-জন 'সিরিয়াস' বাঙালি পাঠকও পড়েছেন, বোধহয় হাতে গুনে বলা যাবে। তাঁর গদ্যগ্রন্থ দু-টির প্রোডাকশন কি আর-একটু যত্ন নিয়ে করা যেত না? এসবের জন্য দায়ী কে — প্রকাশক, প্রুফ রিডার, মৃদুলদা স্বয়ং, নাকি আমাদের 'গরিব' বাংলা বাজার?

কবিতার ক্ষেত্রেও সংস্করণ ভেদে বানান-বৈষম্য, স্পেসের গোলমাল চোখে পড়ার মতো। একই বই-এর প্রচ্ছদে একরকম বানান, টাইটেল পেজে আরেকরকম, নামকবিতায় আবার তা বদলে গিয়েছে! অন্য সংস্করণে বা সংগ্রহেও মূলের থেকে মেজর বদল ঘটেছে কোথাও-কোথাও। এত বড়ো একজন কবির বই, যত্ন নিয়ে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হবে না কেন? এই সংখ্যার কাজ যত এগিয়েছে, এসব প্রশ্নের তালিকা তত বেড়েছে।

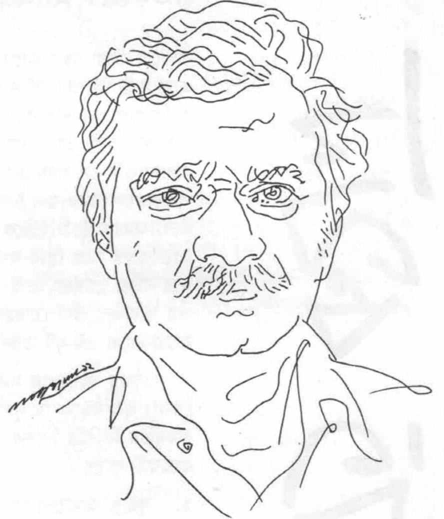
এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, তাঁর প্রথম দু-টি কাব্যগ্রন্থের বানান আমরা সাধারণত 'জলপাইকাঠের এসরাজ' ও 'এভাবে কাঁদে না' লিখলাম।

এই সহিংস শূন্যস্থান পূরণের শেষে মৃদুল দাশগুপ্তের দুই নিবিড় পাঠকের কথা না বললেই নয়। বরুণ চট্টোপাধ্যায় ও সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁরা *বোধশব্দ*-রই — নানা পরামর্শে ও পরিশ্রমে, এ সংখ্যায় মেন্টরবৎ উপস্থিত।

সম্পাদক ও প্রকাশক : সুস্নাত চৌধুরী

সহ-সম্পাদকমণ্ডলী : সম্বিত পাল ও জয়িতা দাশগুপ্ত
যোগাযোগ : ৪৭/১ ষষ্ঠীতলা লেন, ভদ্রকালী, হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ, সূচক : ৭১২২৩২ □ চলভাষ : ৯৩৩০৯ ৪৪৪৪২
বৈদ্যুতিন বার্তা : bodhshabdo@gmail.com
অক্ষরবিন্যাস : শৈবাল ঘোষ, উত্তরপাড়া
মুদ্রণ : ডায়মন্ড আর্ট প্রেস, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট
ম্যাকাও, উত্তরপাড়া

বন্ধুত্বে : অতীন ভট্টাচার্য, শৈবাল মুখোপাধ্যায়, বরুণ চট্টোপাধ্যায়
দেবক বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিক মল্লিক, প্রসূন মজুমদার
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ দে ও উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব



মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা

নতমস্তকে হাজির

এগারো-বারো বছর আগে পার্কস্ট্রিট বইমেলায় আলো-আঁধারি একটা ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসে দু-টি কিশোর, তাঁরা বনগাঁর একটি ছোটো পত্রিকার দুই সম্পাদক, দু-জনেই মণ্ডল, অর্ঘ্য ও কিংশুক, আবদার করে বসেন, তাঁদের *সাধের লাউ* পত্রিকাটির 'মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা' করবেন। আমি ভয় পেয়ে যাই। মৃত্যুভয়। ওইসময় কিছুটা অসুস্থ ছিলাম। আমার শরীরের বাদ্যযন্ত্রগুলি সে-সময় এলোমেলো বাজছিল। বরানগরে ওইসময় অস্থায়ী বসবাসকালে, পদ্মপাতায় যেমন জল টলমল করে, আমাকে ঠিক ওইভাবে, যেন হাতের তেলোয় ধরা হয়েছে, ধরে, আমার স্ত্রী দিগ্বিদিকে চিকিৎসকদের কাছে ছুটতেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ, এবং ডাক্তারদের সঙ্গে তিনি যখন আমার আড়ালে ফিসফিস করে কথা বলতেন, আমি ভাবতাম মরে যাচ্ছি বোধহয়, তাই ওই গোপনীয়তা। ওইরকম সময়ে কিংশুক, অর্ঘ্যর প্রস্তাবে আমার ভয় ধরেছিল, ওঁরা বোধহয় একটি প্রাক-স্মরণিকা প্রকাশ করতে চাইছেন। অনেক চেষ্টায় আমি নাছোড়বান্দা ওই দুই তরুণকে নিবৃত্ত করি।

গতবছর বইমেলার সময় আমি তো ফুর্তির চুড়োয়। শ্রীরামপুরে স্বগৃহে ফিরেছি, যেন বাল্যে ফেরা। ওই বইমেলায় সুস্নাত যখন এই প্রস্তাব দিলেন এবং একবছরব্যাপী এ বিষয়ে তাঁর কর্মসূচির ফিরিস্তি দিলেন, আমি একটু কিন্তু-কিন্তু করে রাজি হয়ে গেলাম। রাজি হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ :

১. সুস্নাত আমাদের হুগলি জেলার ছেলে। ওই উত্তরপাড়ায় আমি কলেজে পড়েছি।

২. এই কারণে ওঁর পত্রিকা, যা প্রথমে *বোধ* নামে বের হত, পরে *বোধশব্দ*, আমি তার নিয়মিত লেখক।

৩. সম্পাদক হিসেবেও যেমন ওঁর বিবিধ পরিকল্পনা, চিন্তাভাবনা, নিখুঁতের দিকে ধাবমান ওঁর তৎপরতা — আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

৪. ওঁর মা-কে আমি দেখিনি, একদিন দেখা করতে যাব, শুনেছি তিনি আর আমি একই বছর, ১৯৭১ সালে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছি। ভিন্ন-ভিন্ন স্কুল থেকে যদিও, তবু সহপাঠী।

সামান্য এক কবিতা প্রয়াসী আমি। তবু কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছি। তার বাইরেও এমন-এমন প্রাপ্তি আমার ঘটেছে, যা মনে হয়েছে আমার শরীরে এই পৃথিবীর হস্তাবলেপন। *বোধশব্দ*-র এই সংখ্যাটিও সেইরকম। ঈশ্বরবিশ্বাসী নই আমি। ব্যাখ্যাতীত যে সকল ঘটনা আমার জীবনে কয়েকটি ঘটেছে, আমি তার কার্যকারণ খুঁজেছি। কবিতা বিবিধ সঙ্কটকালে আমাকে রক্ষা করেছে। নচেৎ *কবিতা সহায়* নামে গদ্যগ্রন্থটি আমি লিখতে যাব কেন?

আবার আরেকটি দিক থেকে ভাবলে, এই সংখ্যাটি, সে তো আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। আমি নতমস্তকে হাজির। আমার স্বপক্ষে কাগজপত্র বলতে, সুস্নাত আমার যে লেখাগুলি প্রকাশ করছে — কুড়িটি ছড়া, তিনটি গল্প, সেগুলি পুনর্মুদ্রণ। আমি দিয়েছি ছ-টি কবিতা, সদ্য লেখা, আনকোরা। বিচারালয়ে, এ-ই আমার একজিবিট।

SATAVISHA-PROKASH শতভিষা AUGUST-OCTOBER 1981

ত্রিশ বছর ধরে
বাংলা ভাষার একমাত্র
কবিতা ত্রৈমাসিক

শতভিষা

কবিতার আন্দোলনকে সার্থকতার ও অগ্রগতির
দিকে নিয়ে চলেছে।
আমাদের অভিনন্দন জানাই।

শতভিষা

সন্তবামি এন্টারপ্রাইজ
১৪, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২২-৯০৭১

শ্রীমতী মিনু সরকার ৪৫এ রাসবিহারী অ্যাভেন্যু, কলকাতা-২৬ থেকে প্রকাশ করেছেন। মুদ্রণ : অমি প্রেস, ১৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট কলকাতা-৯।
দাম : তিন টাকা

শতভিষা-র ব্যাক কভারে লিখে ফেলা কবিতার পাণ্ডুলিপি

কবিতার পাণ্ডুলিপি

মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা

এক

সহজ হাওয়ার স্রোতে, তাদের কমলা গ্রীবা, কতিপয় সারসের পাশে
ধাতব ঝলক দিয়ে উড়ে যায় ভোরের বিমান
একটি নিমেষে রৌদ্র চুরমার খানখান মৃদু-মৃদু ত্রাসে
বাহুর বিস্তারে, বাক্যে, এরপর আমিও তো দ্রুত ধাবমান

কাকভোরে সরোবর, নেমে যাবে পাখিদের ঝাঁক
তত নয়, তাও বড়ো সহস্র বাতির ঘেরে হিথরো বন্দর
ধীরে সিন্ধু পার হব, অতি ঊর্ধ্বে জ্বলজ্বল দেখাবে পোশাক
হিমেল বাতাসখানি অহেতুক মনে হবে ঝড়

৩-৪ নভেম্বর ২০১২, মধ্যরাত

দুই

জানে না মাধবী* কিছু, যখন একেলা আমি, মুণ্ডহীন ধড়
গৃহ শূন্য, অর্থাৎ উড্ডীয়মান, তবে শীর্ষে ক-টি কবুতর
ভাবি তা আকাশফেরি নীলনভে অতিকায় উড়ন্ত শহর
চাঁদ সূর্য একযোগে ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতর

কত না দুর্যোগ ঘটে এর ফলে, হয়ে যায় দিন রাত্রি রদ
ওড়ে গ্রন্থ, কাঠ-খড়, ঢেউ টিন, পোপের সনদ
চন্দ্র সুভদ্র অতি, তবে সূর্য অতিশয় বদ
খ্যা-খ্যা করে হাসে আর খালিগায়ে ঢেলে দেয় মদ

৪ নভেম্বর ২০১২, শেষরাত

* 'মাধবী' নামটির বদলে 'গৃহিণী', 'ঘরণী' এসব শব্দ বসিয়েও পড়া যাবে

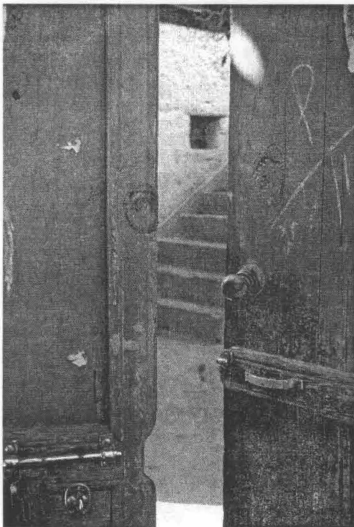
তিন

আমি ও কবিতাখানি মুখোমুখি বসে আছি, আমাদের উভয়ের কথোপকথনে
ভাবে রাত্রি, থাকি থাকি; মদিরার ঢেউ দেয় বঙ্গোপসাগর
থামে চন্দ্র, তারাদল, নাটকীয় কত কিছু ঘটে যায় গগনে-গগনে
আবছা বাতাস এসে আমাদের টেনে নেয়, বিনা ঝড়ে ওড়ে এই ঘর

সেগুন মঞ্জরী ঝরে গোপন কাঠের ভীরু মোহময় আবরণ থেকে
উল্কার আলো লেগে সচকিত লোহা যেন জ্বলে
শীতের কুয়াশা দেয় আমাদের ধীরে-ধীরে নীল রঙে ঢেকে

এ কবিতা মৃদুলের, প্রভাতে গুঞ্জনরত শিশুগণ বলে

৫ নভেম্বর ২০১২, রাত ৩.৩০



চার

আঙুলের মৃদু স্পর্শে আমার দোতারাখানি অতি উর্ধ্বে বাজে
কখনো কাতরভাবে, ফুর্তিতে আবার যেন টিঙি টিঙি গুব গুব গুব
এ ভূমি কম্পিত হয়, তোমারও কি নিদ্রা যায় আওয়াজে-আওয়াজে?
এক চন্দ্র যথাস্থানে, আর চন্দ্র জলে দেয় ডুব

কেননা ক্রন্দনরত বাতাসের মাঝে ঢুকে সে সুর বেরিয়ে আসে পুনরায় খ্যাপার উল্লাসে
তোমাকে খোঁজে না আর, নেচে-নেচে মনে করে ফের ভুলে যায়
অতলের তলে ডুবে চুপচাপ বসে থাকে, ফস করে ওঠে উর্ধ্বাকাশে
দাপাদাপি দেখে ফোটে এমন নিশুতকালে বেগনি-বেগনি ফুল পুঁইয়ের মাচায়

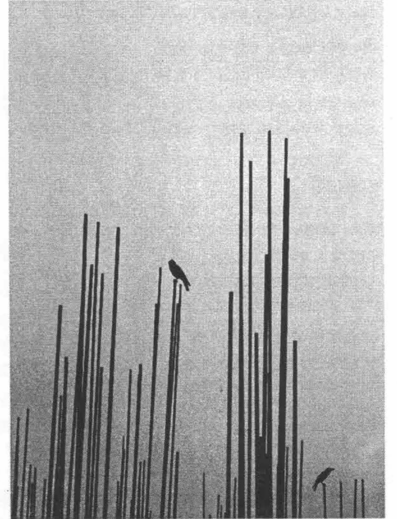
৭ নভেম্বর ২০১২, রাত ২.৫০

পাঁচ

আড়ালে তারকাপুঞ্জ হাসে তাও আমার মোচার খোলা ভাসে
যখন শনির আলো অতিক্ষীণ পড়ে বাঁশঝাড়ে
গ্রহাণু এড়িয়ে যাই ছায়াপথ ছেড়ে দিয়ে ঈষৎ বাঁ-পাশে
ফলে তো পশ্চাতে ফিরি দশ. নয়. বারো থেকে দু-হাজার চারে

এবার বাতাস যেন অতিবাম কেন্দ্রীয় কমিটি, ক্ষোভে বলে, বিচ্যুত-বিচ্যুত
হুলিয়া, শিকল নিয়ে এরপর ঘিরে ধরে অং বং চং মং গ্রহ
তিমির গহ্বরে পড়ে ডিঙিখানি পুড়ে যায়, আমিও তো অতি ভস্মীভূত
উর্ধ্বলোকে দাউ-দাউ ওই জ্বলে কবিতা সংগ্রহ

৯ নভেম্বর ২০১২, ভোর ৪.০৫



ছয়

কিছু না, কেবল স্পর্শে তড়িৎ জাগ্রত হবে, শ্বেতপত্র কাতর, উৎসুক
সে এক পদ্ধতি, যার পথিমধ্যে মরে যাব, কেঁদো না কেঁদো না
বদলে নিকটে এসো, ছুঁয়ে দিই তোমার চিবুক
উচিত চুম্বনে মানো এ পৃথিবী ভেসে আছে যে কারণে তা তো শত কবির বেদনা

তথাপি ক্রন্দনরতা, আমিও বিস্মিত বড়ো, কোন সূত্রে এলে
সাধারণ যানটিতে, ৫০০ টাকার নোট কীভাবে ভাঙলে?
দু-দুটো টাওয়ার ভেঙে পড়ে গেল তোমার ডানায় লেগে সকালে বিকেলে
তাছাড়া কী করে টঙে, মহাকাশে, ফুলকাটা কাঁচুলি টাঙালে?

১০ নভেম্বর ২০১২, রাত ৩.৩০

কুড়িটি স্বনির্বাচিত ছড়া

শহরে রাখাল এক

শহরে রাখাল এক, মহিষের পিঠে
সহসা বাতাস যেন অতিশয় মিঠে।

থেমে গেল বাস, ট্রাক, সারি-সারি ট্রাম
কলকাতা যেন ফের সুতানুটি গ্রাম।

কী খুশির হাওয়া এক, কী যে অনুভূতি
শত প্রজাপতি ওড়ে, অবাক মারুতি।

জনতা উল্লাসরত, আট থেকে আশি
শহরে রাখাল এক, তার হাতে বাঁশি।

চায়ের দোকানে যারা কাজ করে, তারা
সমবেত নাচে, হাতে ঘুড়ি বা পেয়ারা।

খুশি পাতালের ট্রেন, শহিদ মিনার
নাচে অটোচালকেরা, বাসের ক্লিনার।

তা দেখে সড়ক ভুলে ট্রাফিক পুলিশ
খুশিতে গানের সুরে দিয়ে যায় শিস।

সিধু কানু ডহরের অতি আশেপাশে
রামধনু ধীরে-ধীরে নিচে নেমে আসে।

সহসা ধানের ঘ্রাণ ভাসে পার্কস্ট্রিটে
এসেছে রাখাল এক মহিষের পিঠে।

টুংটাং ডিংডং

টুংটাং নদীতীরে ডিংডং গ্রামটি
সেখানে থামুক গিয়ে ৩ নং ট্রামটি।
পাথরের বাড়িঘর রংটং করা নেই
ইস্কুল ঢং ঢং পড়া নেই পড়া নেই।

সেখানে আকাশে চাঁদ টিংটিংয়ে ফালি
আমজাম বাগানের ভীম সিং মালি
সং সেজে বসে থাকে ফল ছুঁতে মানা নেই
অং বং পুলিশের থানা নেই থানা নেই।

এক ঝাঁক পড়ুয়ার ক্রিং ক্রিং ফুর্তি
৩ নং ট্রাম ছাড়া এইভাবে উড়তি?
ভাঁজ করা রামধনু পিংপং সাঁই সাঁই
জং-ধরা লোহাদেরও চং মং প্রাণ চাই।

মহিষবাথান

আমবাগানে চোরপুলিশে তুই যেখানে আমায় ছুঁতি
আজ সেখানে অট্টালিকা, লাল মারুতি নীল মারুতি।
ছিল সে এক ঝুলনতলা, বসত মেলা শ্রাবণ মাসে
আজ সেখানে প্যাঁচ কষেছে এ বাইপাসে সে বাইপাসে।
পুকুর তো নয়, ছিল দিঘিই, ঘাই দিত রুই কাতলা মাছে
আজ সেখানে মস্ত সড়ক, ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।
ছুটছে শত ট্যাক্সি, অটো, বাস, মিনিবাস অজস্র যান
হারিয়ে গেছে সেই আমাদের মহিষবাথান মহিষবাথান।
তবুও ওঠে সেই তারাটা, নাম ছিল যার 'মায়ের আশিস'
ও দিদিভাই, এখনও তুই কুলের আচার ভালোবাসিস?

ফুটবল

হাঁটুতে চোট, জামায় কাদা
ঢুকতে বাড়ি — বাবার ভয়
তখন বয়স ১৪ বছর
জেলার খেলায় স্কুলের জয়।

টিমে প্রথম, বুক দুর-দুর
নেমেই মাঠে তিন কি চার
ধাক্কা খেয়ে ভুল খেলেছি
বসিয়ে দিলেন গেম-টিচার।

ভয় কেটেছে পরের খেলায়
ফাইনালেও আমার পাস
ধরেই বিভাস গোল দিল যেই
শহর জুড়ে জয়োল্লাস।

চুন-হলুদের সোনার স্মৃতি
মায়ের দু-চোখ শঙ্কাময়
ভাবলে এখন বুকের ভেতর
একটু-একটু কষ্ট হয়।

পারিবারিক

লাল ফড়িং-এর ছোঁয়ায় কেন ঘাস-ফুলেরা দোলে?
ভিলাই থেকে রুল্টু মাসি কাল এসেছেন বলে।
পদ্মদিঘির জলে হঠাৎ কাতলা দিল ঘাই —
সাতটি লেটার-সহ তাতাই পাশ করেছে, তাই।
মেঘ ও আলোর চোর-পুলিশে রোদ পড়েছে ঘাসে
ফরিদ আমার বাংলাদেশের বন্ধু যদি আসে!
চাঁদ উঠেছে অন্যরকম, গোপনে কই কারণ —
মাঘেই বিয়ে চৈতিদিদির, এখন বলা বারণ।
হঠাৎ কেন ঢের জোনাকি সাজায় বাঁশের বন?
এইমাত্র পেলাম মামার শিলং থেকে ফোন।
বাতাস কেন বারেবারেই হাত বুলোচ্ছে চুলে?
বড়ঠাকুমা এলেন, কিন্তু আমায় গেছেন ভুলে।
পিসেমশাই এসেই বসে, যেই ধরালেন বিড়ি —
নারিকেলের পাতায় শুরু খুশির ঝিরিঝিরি।
আজকে কেন তারায়-তারায় অধিক ঝিকিমিকি?
কারণ কাকা আজ বললেন পুজোয় দেবেন কী-কী।
হালকা বাতাস দিতেই যখন সজিনা ফুল ঝরে
মাকে মনে পড়ে আমার... মাকে মনে পড়ে।

মনে-মনে

পথে-পথে ঘুরি আমি, মনে-মনে বলি
বাস যেন নিরাপদে যায় কুলতলি।
না ঘটে বিপদ কোনও, খাদে-খালে পড়া
কুটুমের বাড়ি লোকে খায় মনোহরা।
ঢেউ না ডোবায় যেন একটিও নাও
যার খুশি ডিঙি বেয়ে ধামাখালি যাও।
হাসে যেন ধানখেত, চাকা যেন ঘোরে
ধবল বকের ঝাঁক মেঘে-মেঘে ওড়ে।
ছিপ হাতে বসে যারা, পায় যেন মাছ
ফলে ফুলে ভরে যাক দুনিয়ার গাছ।

ভয়ে-ভয়ে লোকালয়ে যত আমি যাই
যেন আমি সকলের ভালোবাসা পাই।
দেখি যেন সুখে আছে পাড়া-প্রতিবেশী
কেউ না কাউকে ভাবে বেজাত-বিদেশি।
যেসব পাখিরা গেছে এ শহর ছেড়ে
মাছরাঙা, বুলবুলি, টিয়া যেন ফেরে।
ধোঁয়া, ধুলো নেই আর, ডাকাত উধাও
নিরাপদে কোলাঘাট, বারাসত যাও।

বনে-বনে যাই আমি, শিরীষের তলে
দেখি যেন জোনাকিরা ঝিকিমিকি জ্বলে।
আঁধারেও যেন ফোটে লাল কলাবতী
সব শুঁয়োপোকা যেন হয় প্রজাপতি।

বাংলার কথা

বলি বাংলার কথা
অতি মনোহর
আসিত গ্রীষ্ম ঋতু
বছর-বছর।

কত না সুখের কাল
আমোদের দিন
সাঁতার কাটিতে জলে
যদু, মহসিন।

চার-দশ হাইটের
ফাইটার দল
একদা খেলিত মাঠে
শুধু ফুটবল।

সেন-র‍্যালে সংস্থার
লাল সাইকেলে
বিশ্বভ্রমণে যেত
বাংলার ছেলে।

ভিজে যায় দুই চোখ
ভারী হয় মন
সেইসব মাঠঘাট
আজ আবাসন।

লিখছি আমি

নাম বলেছি ধাম বলেছি এবং বয়েস কত
সেই সঙ্গে এ-ও বলেছি মা হয়েছেন গত।
দশখানা আঁক কষতে দিলে একটা হবে ভুল
আমাকে তাও নিতে নারাজ — এই তোমাদের স্কুল!

কারণ আমার প্যান্টে ফুটো, জামার কলার ফাঁসা
উড়াল সেতুর নিচে আমার পাখপাখালির বাসা।
বাবা উধাও পুলিসভ্যানে, আমি তখন ছোটো
মরার আগে মা বলেছেন, মানুষ হয়ে ওঠো।
সেই কারণেই বই পড়েছি পথ কুড়োনো বই
তোমার সঙ্গে আজকে না হোক, কালকে তো খেলবই।

পিসি মাসি মামা

যেই না হাওয়ায় শুনতে পেলাম খিলখিলিয়ে হঠাৎ হাসি
নেই তো কোথাও, তা সত্ত্বেও ঠিক বুঝেছি ঝন্টুমাসি!

আবার সেদিন চুঁচড়ো বাসে বাবুবাজার যেই না নামা
ঝাঁকড়া মাথা গাছ বললেন, আমিই এখন কুট্টিমামা!

হতেও পারে, এই পৃথিবী অবাক কত কাণ্ডে ভরা
রামধনুটির পাশে যে মেঘ, সে মেঘ যেন চশমা-পরা।

সাধ জাগে তাই 'আসুন আসুন' খাতির করে সামনে বসাই
কত বছর পরে এলেন, দিল্লিবাসী মেসোমশাই!

টুপ-টুপ-টুপ শিউলিপাতায় যেই পড়েছে শীতের শিশির
আফগান স্নো, রাঙাজবার গন্ধ পেলাম — তিনটি পিসির!

ভাবছি আমার বিশ্বে সবই যেমন ছিল তেমন আছে
হাওয়ায় জলে রোদ আকাশে ধুলোয়-ধুলোয় কিংবা গাছে।

সরস্বতী

সরস্বতীর বীণা
সত্যি বাজে কিনা
দেখতে গিয়ে হাত লাগিয়ে
ধমক খেল তৃণা।

সরস্বতী নিজে
পড়তেন কেমব্রিজে?
বৃষ্টিতে গিয়েছে তার
সার্টিফিকেট ভিজে।

সরস্বতীর হাঁস
সেও কি এমএ পাশ?
কোন বিষয়ে ডক্টরেট?
প্রাচীন ইতিহাস?

এসব ছড়ায় সরস্বতী
ভয়ঙ্কর চটে
বিদ্যে দেননি এই কবিকে
বুদ্ধি দেননি মোটে।

নাচ

নাচ তো জানি অনেকরকম
কিন্তু যদি নাচি
বোলতা এসে হুল ফোটাবে
কামড়াবে মৌমাছি।

কিন্তু আমার কন্যা যদি
অল্প একটু নাচে
প্রজাপতির বসবে মেলা
ফুলগাছে-ফুলগাছে।

ময়ূর মেলবে পেখমটি তার
আলো উঠবে ফুটে
হরিণছানা আর খরগোস
আসবে ছুটে-ছুটে।

৩ নং বাস

জি টি রোডে গঙ্গার হাওয়া ফুরফুর
৩ নং বাস যায় খুশি যত দূর।
ট্রাক-লরি মোটরের থেকে আরও জোরে
দৌড়োয় ছোটে আর মাঝে-মাঝে ওড়ে।

বিমানের পাইলট নীলাকাশ থেকে
মাটিতে তাকিয়ে থাকে ৩ নং দেখে।

তাড়াতাড়ি যেতে চান? বসে যান সিটে
কলিকাতা যাইবেন সাতাশি মিনিটে।
পিসি যায়, মাসি যায়, মামা, দাদা, কাকা,
পথে ব্রেক ফেল নাই, ফাটিবে না চাকা।
লাফাইবে মাঝে-মাঝে রাস্তার দোষে
বিপদের ভয় নাই দাঁড়িয়ে বা বসে।

বিমানের পাইলট কত-শত পাশ
দমদমে নেমে বলে, চালাইব বাস।

ইচ্ছে

ইচ্ছে তো হয়, আজ অফিসে ডুব দিয়ে খুব সাঁতার কাটি
অমনি যেন আকাশ থেকে বাবা হাজির, হস্তে লাঠি।

ফলে অফিস যেতেই তো হয়, যেমন যেতাম ইশকুলেও
যাত্রাপথে আজও যেন স্বর্গগতা মায়ের স্নেহ।

কিন্তু আমি দস্যি কি কম, কাজেকর্মে বড়োই ফাঁকি!
জরুরি সব ফাইলপত্রে কাগের বগের চিত্র আঁকি।

ইচ্ছে তো হয় বহুতল ওই অফিস বাড়ির মাথায় উঠে
বাউনটক্কা ঘুড়ি ওড়াই, ধরাই দিতে আয় রে পুঁটে।

আয় রে আমার পূর্ণচন্দ্র স্কুলের যত বন্ধুসকল
আমরা লাফাই, আমরা ঝাঁপাই, আমরা করি রাজ্য দখল।

পাখির ছড়া

একটি পাখি, দুইটি পাখি
আমি তাদের সঙ্গে থাকি।

এইটুকুনি ছোট্ট ঘরে
বড়োই কিচির মিচির করে।

তিড়িং বিড়িং ছোট্ট পাখি
লাফায় যখন, আগলে রাখি।

কিন্তু বড়ো, ফুড়ুৎ করে
এদিক ওড়ে, সেদিক ওড়ে।

দেখে আমার ভালোই লাগে
মনে আমার পুলক জাগে।

যেবার এলেন ঢাকার চাচা
দেখে বললেন, ঘর না খাঁচা?

আমি বললাম, গাছের ডালই
শুনে চাচার কী হাততালি!

দুই পাখিতে যুক্তি করে
আমায় ওড়ায় দু-হাত ধরে।

ঝড়-ঝাপটায় দুই পাখিতে
খাবার আনে ধারবাকিতে।

দু-এক কলি গাইলে বড়ো
ছোট্ট বলে, সবটা করো

বলেই খুদে নৃত্যরতা
এই তো ছড়ায় জীবনকথা।

বাঁচা

সেই যেখানে টালির চালে বাড়ন্ত লাউ
চার পয়সার মুড়ির ঠোঙায় বাতাসা ফাউ।
উঠোন-কোণে বাছুর-সহ কমলি বাঁধা
পাঁচটি হাঁসের দুইটি হাঁসা দুটোই সাদা।
রোদের খুশির রং মেখে এক পুঁই-এর মাচা —
সেই তো বাঁচা।
চায়ের দোকান, গফুর চাচা
খুঁটির তারে ফিঙের নাচা — সেই তো বাঁচা।

তা নয় যত বহুতলের ঘুপচি ফ্ল্যাটে
একশো চ্যানেল টিভির ঘোরে মন খ্যাপাটে
পেতল টবে যত্নে মলিন এক ফোঁটা জুঁই
পাখি বলতে ঝাঁক-ঝাঁক কাক এবং চড়ুই।
ধোঁয়া-ধুলো, গাড়ির আওয়াজ, ধৈর্যচ্যুতি
এই বাইপাস, ওই বাইপাস, লাল মারুতি।
বিকেল বলতে ফুচকা খাওয়া পার্কে বসা —

বন্দিদশা।

অবনীন্দ্রনাথ

শ্যামলতরু, শ্যামলতরু, 'বুড়ো আংলা' বইটা দিবি?
— কোথায় সে বই! হারিয়ে গেছে, যা তো এখন, দেখছি টিভি!

অর্চনাদি, অর্চনাদি, 'রাজকাহিনী' শোনাও পড়ে
তার বদলে আনব আচার, কালকে বয়েম পাচার করে।
— সে কীরে তুই খোকাই আছিস! যাস না অফিস? ঘুরিস টোটো?
আমার কত কাজ রয়েছে, রান্না সেরে ব্যাঙ্কে ছোটো —।

পলাশকাকু, পলাশকাকু, তোমার কাছে 'নালক' আছে?
— এই নামে তো কেউ থাকে না, ময়রাডাঙা দু-এর পাঁচে।

এবার তবে কোনখানে যাই, মাঠ পেরিয়ে দিঘির ধারে?
কোথায় সে মাঠ, পুকুর ভরাট! রাস্তা কেবল ঘুরিয়ে মারে!

তিনতলায় ওই ফুলটুসি কী? 'ক্ষীরের পুতুল' চাইব ডেকে?
— মা দেখে যাও, একটা পাগল তাকিয়ে আছে তখন থেকে!

ধরুক দেখি

একটি চড়ুই যদি আমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতেই বসে
৯ থেকে নয়, এই বয়সেই পৌঁছে যাব আবার ১০-এ।
ঘন্টা বেজে উঠবে আবার পূর্ণচন্দ্র বিদ্যালয়ে
কদমতলির মাঠ পেরোবে ভূগোল স্যারের বেতের ভয়ে।

একটা ফড়িং যদি আমার ছোঁয়ায় খুশি, না যায় উড়ে
আবার হাতে উঠবে লাটাই, কাগজ কলম ফেলব ছুঁড়ে।
ফলে বাবার ধমক খাব, অঙ্কে পাব উনতিরিশই
মেঘলা হবে মুখটি মায়ের, ভীষণ শাসন করবে পিসি।
এক জোনাকি যদি আমার বুকে বসেই আলো ফোটায়
বড়বাবুর সাধ্য কি আর, আজ আমাকে অফিস ছোটায়!
আজ তো আমি কদমতলির মাঠের শেষে দিঘির ধারে
১০ বছরের বংশীবাদক, কে আমাকে ধরতে পারে!

রাতের আকাশ

আকাশে তাকিয়ে দেখি
সিগারেট ঠোঁটে
চাঁদের বদলে আজ
ফুটবল ওঠে!
নিশীথে ২২ তারা
যেন দু-টি দল
উল্লাসে খেলে সবে
সেই ফুটবল।
চারপাশে লাখো তারা
জ্বলে ধক্‌ধক্‌
মহাকাশ ময়দানে
খ্যাপা দর্শক।
মেঘের গ্যালারি-ঘেরা
সেই মহামাঠে
দুই কোচ বুধ, শনি
চিন্তায় হাঁটে।
কানে বাজে করতালি
'গোল-গোল' রব
ছায়াপথে উচ্ছ্বাসে
জাগে উৎসব।
ভোরবেলা খেলা শেষ।
তারা ফেরে ঘরে,
আকাশে সোনার ট্রফি
ঝলমল করে।

হাওয়া

বাবা নেই, মা-ও নেই
পথে-পথে আমি
সারাদিন ঘুরি আর
মাঝে-মাঝে থামি।

থামি অপরূপ দেখে
হাত ধ'রে মা-র
চলেছ খুশিতে তুমি
শিখতে সাঁতার।

হাওয়া এসে আমারও তো
যেন হাত ধরে
অহেতুক দুই চোখ
ছলছল করে।

আবার কখনো দেখি
ঘামে ভেজা পিঠ
সাইকেলে বাবা, তুমি
সামনের সিট!

ঢং-ঢং বাজে যেন
কবেকার স্কুলে
এলোমেলো হাওয়া এসে
হাত রাখে চুলে।

একেলা আঁধার রাতে
অচেনা শহরে
আকাশে দুইটি তারা
মিটমিট করে।

কোন ছড়াটা?

একটা ছড়া ছড়িয়ে ছিল ঘাসে
একটা ছড়া ছিল ঘরের পাশে
একটা ছড়া দূরের পাহাড় চূড়োয়
একটা ছড়া একমুঠো খুদকুঁড়োয়।
একটা ছড়া কোন সে ছেলেবেলায়
হাত ছেড়ে মা-র হারিয়ে গেছে মেলায়।
একটা ছড়া গিয়েছে কলকাতায়
একটা ছড়া পড়ছ তো এই পাতায়।
একটা ছড়া টুকরো ভেঙে দুটো
একটা ছড়ার হাত দু-খানি মুঠো।
একটা ছড়া উধাও বনে-বনে
কোন ছড়াটা ধরল তোমার মনে?

তিনটি ছোটোগল্প

ধান... পান... তারামাছ

তাদের সব বর্ধমানগামী লোকালে, মেইন-কর্ডে, ইএমইউ কোচে, কত ভেদাভেদি করেছে সে, এ হুগলির, না ওরা বর্ধমানী। ভেন্ডার কামরার গুলতানিতে, চানাগরম চিবোনোর ধরনে, কি অফিসবাবু তাসুড়েদের মগ্ন টু-স্পেড থ্রি-ডায়মন্ড কলে, জটলার বাকবুলিতে বছরের পর বছর সে তফাত করে নিয়েছে অতি সহজেই। তবে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে গেছে চেহারা, বস্তুত মুখের মানচিত্র বুঝে-বুঝে। বিশ্লেষণই তা, না হলই বা কোনো নৃতত্ত্ববিদের। অ্যানথ্রোপলজি কি কোনোভাবে ছায়া ফেলেছিল তার একদা বিদ্যাভ্যাসে? ধুর, স্রেফ নওল মোর্গার মতে সে খুঁট মেরেছিল কেঁচো-কেন্নোয়, জীববিজ্ঞানের সহজপাঠে, বড়োজোর সন্ন্যাসী-কাঁকড়া, সমুদ্র-অশ্ব, আর তারামাছের বিচিত্র জগতে। আর কিছু বা উদ্ভিদের সবুজ রহস্য-কুহেলিতে দিয়েছিল সাড়া। তবে শৈবালে, গুল্মে, গর্ভকেশরের আঠালো ফাঁদে মোটেই ধরা পড়েনি সে, বরং ছিটকে পড়েছিল এক বাতিল পড়ুয়া।

তবু, 'তুমি আমার তারামাছ', গবেষণাকক্ষের আধো আলোর নীলচে নিভৃতিতে একথা কি সে বলেনি বনানীকে? দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে? পাঁচ নয়, দু-বাহুর সহসা সমর্থনে পেয়েছিল সে সমুদ্র নয়, হুগলিরই ধানের গন্ধ। পৌষের তা, নবান্নের।

শুনে যে হাসি, চাপা, তিরতিরে ওষ্ঠের, মানো না-মানো, কাকে বলবে সে, তা পান তাম্বুলে রাঙা, অমর। সে আরও বলতে পারে, তা এক সামন্তকন্যার হাসি, হাওয়ার হাওয়ায় যা চিরকালীন, ধানের পাশাপাশি পানের বরজেও যেন উমনো-ঝুমনো, পরতে-পরতে তার ঝাঁঝ।

সবুজ-কষা সুরাপ্রায় সেই স্বাদ। জিহ্বায় আজও। টের পেল সে এতদিন পর, কেননা সে শুনতে পাচ্ছিল, অভ্র... অভ্রদীপ...। আর কেবলই ট্রেন চলাচলের শব্দ। তাদের সব বর্ধমান-ব্যান্ডেল লোকাল।

সাড়া দেবার ইচ্ছেয় উঠতে গিয়ে বাধা বোধ করে সে। ঘোর-ছাওয়া শরীরেরই সমর্থন নেই। ব্যথা বেদনা। হাত তুলতে গিয়ে সে এবার টের পায় সুঁইফোঁড়। তবু, তলানি শক্তিতেই ভারী হয়ে আসা চোখের পাতা বারবার মেলে দেওয়ালে সে দেখতে থাকে নৈশট্রেনের আলোকিত কামরার ধাবমান ছায়া। আকস্মিক সংশয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন সে আধোচেতনে দোলে, এই স্বাদ — তা কি ওষুধের?

❑

বনানীর মনে হল, ঘুমোক। সামলে উঠতে পারলে, সে আশা কম, দু-কথা শুধোবে। ছেলে-ছোকরাদের মুখে ওই নাম শুনে ছুটে এসেছেন। শেষে তাঁদেরই হাসপাতালে, এখানে! মেট্রনকে দিশেহারা ভাব দেখালে চলে না। মনে পড়ল, ও বলত, ফুক্কুড়িই, বর্ধমানের মেয়েদেরও মন কঠিন ঠাঁই, সহজে গলে না। ঝুঁকে, চশমার ডাঁটিতে বাঁ হাতে আঙুল ছুঁইয়ে ঠোঁট কামড়ে ফেলেছেন, এই যা। হ্যাঁ অভ্র, ঢের বদলেছে, চিনেছেন তবু। ফিসফিস করে এবার নাম ধরেই ডেকেছেন বার দুয়েক। অভ্র... অভ্রদীপ...। কোনোক্রমে যেন চোখ মেলে সাড়াও দিয়েছে সে, অন্তত বনানী বুঝেছেন, তাছাড়া ডানচোখের ভুরুর ওপর ওই কাটা দাগ।

হকি স্টিকের। মনে পড়ল মেট্রন বনানী দত্তের তাঁদের সেইসব প্যারীমোহন কলেজের দিন। বাংলার নীল-সবুজ বটানির অপরূপ কুহেলিতে ওরা ঘুরছিল ভিয়েতনামি গেরিলা, ফিদেল রাউলের খুদে সাকরেদরা। তারা মেয়েরাও, তিনতলার করিডোর থেকে একতলায় সিআরপির মাথায় ফেলে দেয়নি কি হাইবেঞ্চ?

উচিত তৎপরতায় নিজেকে সামলে নিতে হয় বনানীকে। কাছের নার্সটি বলে, স্রেফ ক্যাম্পোজ। দিব্যি ঘুমোচ্ছে। বনানী বলে যান, মালা, একটু দেখো। ডিএম ফোন করেছিলেন, কাল মিনিস্টার ভিজিটে আসবেন।

আড়ালে থাকতেই হাসপাতালে নিজের ঘরে গিয়ে বসেছেন মেট্রন বনানী দত্ত। আর ঝড়ই বইছে কঠিন বর্ধমানিনীর মনে। এমনিতে এত রাতে তাঁর হাসপাতালে থাকার কথা নয়। আজ রাতটা থাকবেন, এ-ঘরেই বসে। 'বনানী বর্ধমানিনী' — ও বলত। রোগের সূত্রপাত ওই সময়টাতেই। একেবারে না-ই বলতে হয়েছিল যখন, যেন হিন্দি ছবির কায়দায় দেশ ছেড়ে যাবারই ভয় দেখিয়েছিল। কী ছেলেমানুষি! কাঠমান্ডুর রানিপোখরি ডাকঘরের ছাপ দেওয়া লেফাফা পৌঁছোয় সপ্তা দুই পর, 'ভারত ছেড়ে চলে এসেছি'। তাতে কি কিছু দ্রবীভূত হয়েছিলেন কঠিন বর্ধমানিনী? — এ-বয়সে ঠিক ততটা মনে হয় না বনানীর। রণজয় অবশ্য হাসাহাসি করতে ছাড়েনি। বিয়ের পর, রণজয়কে, হার্বেরিয়াম অ্যালবামের ভেতরে রেখে দেওয়া নেপালি খামটি দেখাতে ভোলেননি। ঠাট্টাই করেছে রণজয়, গালে ঠোনা মেরে, 'ইস খাঁটি নকশাল, যদি, মাও সে তুঙের দেশেই চলে যেত'। 'যেত' — গড়িয়ে পড়েছেন বনানী। ঘুম না-আসা সে-রাতে মনে-মনে ভেবেছিলেন, বেচারা, পিছুটান বলে কিছু নেই তো ওর, ছোটোবেলাতেই বাপমরা, সেভেনটি ফোরে স্টোভ ফেটে মা-ও।

ওঁদের বিয়ের বছরই বেরিয়েছিল *অভ্রবাজারে রাখাল*। *উপমহাদেশ* পত্রিকায় চিলতে বিজ্ঞাপন নিয়েও ফাজলামি রণজয়ের, আনব নাকি বইটা, বিষাদ না কি বিরহের সব কবিতা? সমালোচনাও দেখেছিলেন এইরকমই।

নিঝুম হয়ে এসেছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট। কোলাপসিবল টেনে ঝিমোচ্ছে দারোয়ানেরা। মেট্রনের ঘরে স্রেফ টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বসে আছেন বনানী। সবুজ কাচ পাতা টেবিলে তাঁর হাতের ছায়ায় নিজেরই মনে হল, আশ্চর্য,

যেন জলতটে তিরতির এক তারামাছ! টপ করে এক ফোঁটা পড়ল বাঁ হাতের চেটোর ওপর। বর্ধমানিনীর পাথর-গলা জল। পারবেন কি ওই হাড়গোড়পাঁজরা-ভাঙাকে ফের খাড়া করতে? শুনশান সমুদ্রতটে যেন অজস্র বাহু, শুঁড়ের তারামাছ, সেপিয়া, স্কুইডের উদ্‌গ্রীব আলোড়ন বোধ করতে লাগলেন তিনি।

শেষ দেখেছিলেন আঠেরো বছর আগে। টিভিতে। *অস্ত্রবাজারে রাখাল*-এর পুরস্কার প্রাপ্তিতে সাক্ষাৎকার। *বনানী সিরিজ*-এর মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছে। পাশের ঘরে প্রিয়াঙ্কাকে ফিজিক্স বোঝাচ্ছে রণজয়। ঢুকে পড়লে বিড়ম্বনায় পড়বেন — রিমোট টিপে সঙ্গে-সঙ্গে চ্যানেল বদলে দিয়েছিলেন বনানী। আর তেমন কিছুই জানেন না মেট্রন। কবিতায় তাঁর কাজই বা কী। নিশ্চয়ই আরও কবিতার বই-টই আছে অভ্র। সে সবও কি বিরহের? বিষাদের? চশমার ব্রিজের ঠিক নীচে নাকের পাটা তিরতির কেঁপে উঠল যেন। সবুজ কাচের ওপর ছায়া-বাহু মেলতে-মেলতে তারামাছ ভাবল, ভাগ্যি ওই ছোকরা ডাক্তার ভাস্কর, খুব কবিতা পড়ুয়া বলেই আইডেন্টিফাই করতে পারল, ইনি নাকি নিখোঁজ ছিলেন দেড় দশক, নইলে তো ভর্তি করা হয়েছে 'সুধন বেরা' নামে। দুপুরে হাড়গোড়-ভাঙাকে নিয়ে এসেছিল যে সার্কাসের লোকেরা, তারাই বলেছে ও-ই তাদের টিকিটবাবুর নাম।

❑

জেনারেল ওয়ার্ডে ওষুধ ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার তদারকি করতে-করতে ডা. ভাস্কর পকেট থেকে পেয়েছিলেন ছোট্ট নোটবুক। দুপুরেই। আর তাতে হাবিজাবি চিরকুট। ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজের ভাঁজ খুলতেই তাঁর আবিষ্কার। আধোচেতনের মুখের কাছে ঝুঁকে বুঝেছেন ইনিই অভ্রদীপ, এবং স্পষ্ট শুনেছেন বিড়বিড়... *অস্ত্রবাজারে রাখাল, সোনার বুদ্বুদ, আশ্চর্য আয়নার কবিতা*। সান্ধ্য দৈনিকগুলির জেলা সাংবাদিকদের খবরটা দিয়ে দেন ভাস্করই। সন্ধের মুখে মারুতি উড়িয়ে পৌঁছে যান কবি রূপকুমার জোয়ারদার। ওর বাল্যবন্ধু, ওঁরা পাঁচ-ছয় জনে একদা শুরু করেছিলেন 'আলো আঁধারি পথ' কাব্য আন্দোলন। রূপকুমারের পিছু-পিছু পৌঁছোয় খাস খবরের ক্যামেরা-দলবল।

❑

বাংলোয় রাতে রূপকুমারের দিকে গেলাস এগিয়ে ডিএম বলছিলেন, ছাত্র বয়সে দেখেছি প্রেসিডেন্সিতে। আপনাকেও তো দু-একবার। উনি নিয়মিতই সিঁড়িতে বসে নব্বই-এর ছেলেদের মজাতেন।

রূপকুমার বলছিলেন ছোটো-ছোটো চুমুক দিতে-দিতে, চাকরি-বাকরি করত না তেমন, দায়-দায়িত্বও বা কীসের। ও চিরকালের ভবঘুরে। নইলে এই হাল!

ডিএম বললেন, কী কাণ্ড বলুন, আমি তখন নর্থ টোয়েন্টি ফোরে, মছলন্দপুরে ভেড়ি মালিককে কুপিয়ে তৃতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি দেওয়ালে লিখল ওঁরই অস্ত্রবাজারের লাইন। সিউড়ির ব্যাপারটা নিয়েও তো সেবার কাগজে খবর হল খুব... কিন্তু ওঁর তো কোনো অস্বস্তির কারণ ছিল না, ততদিনে তো ওঁর পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া সংকলন বেরিয়ে গেছে, তাই না?

ফের এক ছোট্ট চুমুক দিয়ে রূপকুমার বললেন, পলিটিক্যাল আন্ডারগ্রাউন্ড! হাসালেন তো! বোকাটা তো গোড়া থেকেই ভাবত, ধানের কুঁড়ো থেকে কবিতা জন্মায়। কবিরা হল চাষি। বোকা, জেদি, হারামিও কি কম! স্যরি।

❑

বড়োবাবু ধমকাচ্ছিলেন। ব্রিজলাল খান্না বলছিল, মেরা ক্যা কসুর? জুবলি সার্কাসের মালিক কাম ম্যানেজার। মাঝরাতের থানায় জেরা চলছে, ডিএম ফোন করেছেন, সকালেই আসছেন মন্ত্রী। খান্না বলছিল, কী করবেই বা সে। পুরন্দরপুরে শো চলার সময় রিং মাস্টারকে ভজিয়ে দলে ভিড়ে পড়ে। ট্র্যাপিজের উর্বশীও খুব পীড়াপীড়ি করেছিল। তা লোকটা হিসেবপত্রে দড়, কাম-কাজে ফাঁক ছিল না। মাস তিনেকের চাকরিতে সাফ। কাউন্টারে বসে টিকিটবাবু তো সামলাচ্ছিল ঠিকঠাকই। এখানে এসে তেরো দিনের মাথায় এই কাণ্ড। শুনশান সকালে ধারে-কাছে রিং মাস্টার, খেলুড়েরা কেউ নেই, মাঠে-বাঁধা হাতির সঙ্গে ফক্কুড়ি কেন করতে গেল? না ওই কুঁচোকাঁচা ছেলেপিলেদের মজা দিতে! কিঁউ? ফুলবন্তী শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে পুরন্দরপুরের সুধনবাবুকে। ধানখেতে।

বড়োবাবু বলছিলেন, আসলে উনি কে জান? একটু আগেই তাঁকে বড্ড জ্বালিয়ে গেছে জেলা সাংবাদিকদের দলবল। পনেরো বছর আগে নিখোঁজ ছাতা-মাথা কি লেখক না কবি, তাকে চিনে ওঠা পুলিসের কাজ?

❑

ভোর চারটে নাগাদ গুটিগুটি পায়ে এসে দাঁড়ালেন মেট্রন বনানী দত্ত। দেখলেন, ঘুমোচ্ছে সে, ধূসর একটি ছায়া পড়েছে মুখেচোখে। অভিজ্ঞতা, তাঁকে বলল, ঠিক সময়ে এসেছেন। আলতো হাতে উষ্ণতা বুঝতে গিয়ে দেখলেন ঠোঁট নড়ছে বিস্ফোরণের শূন্যে পৌঁছোনোর সংখ্যা পরিবর্তনের ধাঁচে, অস্পষ্ট ধ্বনিতে শুনলেনও যেন, ধান... পান... তারামাছ...। *বনানী সিরিজ*-এর প্রথম কবিতা। কয়েক মিনিট যেন কয়েক ঘণ্টা। এরপর স্যালাইনের নল খুলে দিলেন বনানী। আর দরকার নেই।

❑

ঘুম আসছিল না রূপকুমারের। আসে? বাংলোর পুবদিকটায় নদী। সাদা হয়ে আসছে সেদিকটা। স্বচ্ছ, আরও স্বচ্ছ — একাই এভাবে শেষ করতে চাইছিলেন রাতটা। মিরাট সেমিনারে যাবার পথে বছর আট-নয় আগে ছবি দেখেছিলেন বিলাসপুরের *নঈ আওয়াজ*-এ। হিন্দি কাগজ। ট্রেনে ইংরেজি না পেয়ে কিনেছিলেন। তাইতেই ছবি আওয়ারা মসিহার। জব্বলপুরে হিন্দি কবিদের এক মুশায়রা চলছিল। তাতে শ্রোতাদের মাঝে বসে, একগাল দাড়ি, 'আরে মধুকর' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। দীননাথ শর্মা মধুকর তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে। অভ্রদীপজি! হইহই করে সদলবলে তোলা হয় ছবি। 'ভারী কাম রয়েছে পিলভিটে' — এই বলে সে মুশায়রা থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে হাওয়া। কলকাতায় অনেককেই দেখিয়েছিলেন *নঈ আওয়াজ*-এর ছবি।

আরেকটা ঘটনা তো একেবারে হালের। বছর দুয়েক আগে ঢাকার র‍্যাংকিন স্ট্রিটে রিকশায় ওকে দেখতে পেয়ে দু-দিক থেকে দু-হাত চেপে ধরে সাজ্জাদ শরিফ আর ব্রাত্য রাইসু। চা খাওয়া হাসি-ঠাট্টা হয় একচোট। কিন্তু আচমকা বেবি ট্যাক্সিতে ঝাঁপিয়ে উঠে হাওয়া হয়ে যাওয়াটা, অসভ্যতা। ভাবেন রূপকুমার। সাজ্জাদ অবশ্য *উপমহাদেশ* পত্রিকায় বড়ো আন্তরিক একটা বিবরণী লিখেছিল।

আলো হয়ে গেছে নদীতীর। দরোজায় টোকা পড়ল। ডিএম তৈরি হয়ে এসেছেন। বললেন, শেষ। তৈরি হোন, ওঁকে শেষ দেখে আসি।

❑

সকালবেলা সুপার বলছিলেন, সমস্যাই। ডেথ সার্টিফিকেটে সুধন বেরাই লিখতে হবে। ওই নামেই সার্কাসের লোকেরা ভর্তি করেছে। পুলিস রিপোর্টেও তাই। ডা. ভাস্কর বলছিলেন, কিন্তু স্যার...। বনানী চুপ। সুপার বলছিলেন, এই তো... পিতা নিবারণ বেরা, মল্লিক পাড়া, পুরন্দরপুর।

কোত্থেকে কে বুড়ো এসে বলল, আমরা পুরন্দরপুর থেনে এয়েচি। আমিই নিবারণ। সঙ্গে আলুথালু মহিলা, ইটি অর বউ। বলে বুড়োর হাউহাউ বিলাপ, আমার ছেইলে, সুধন, অ সুধন রে...। ভালোমানুষ দেখতে এক মাঝবয়সিও ঢুকলেন, আমি পুরন্দরপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার। আমি ওদের নিয়ে এসছি। কবি-টবি কি মশাই, আমাদেরই গাঁয়ের ছেলে, আমাদের স্কুলেরই এইচএস। তারকেশ্বরে টুলু পালের গদিতে খাতা লিখত, শেষে এই সার্কাসে।

ভাস্কর তাজ্জব। বনানী নিথর। সাত সকালে বড়ো সমস্যায় পড়ে গেছে উলুবেড়িয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। ডিএম পৌঁছোলেন কবি রূপকুমারকে নিয়ে। সচিবের ফোন এল, সকাল দশটায় মালা দিতে পৌঁছোচ্ছেন মন্ত্রী।

— *কবিতা ক্যাম্পাস*, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৯

পার্টি বলেছিল

বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় যে যত পড়ে, সে তত মূর্খ হয় — কলেজ স্ট্রিটের দেওয়াল থেকে উড়ে এসে যখন আমাদের বালুরঘাট কলেজেরও দেওয়ালে ফুটে উঠল, তখন যে ঝাঁকটি বেরিয়ে পড়ল গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে, আমি ছিলাম তাদেরই একজন। আমি অবশ্য তখন ছাত্র নই। বুর্জোয়া কেমিস্ট্রি অনার্সের বুর্জোয়া সাম্মানিক স্নাতক। মা-বাবা গত, দাদার সংসারে বেকার ভাইটি। এমএসসি পড়ব কী, বুর্জোয়া শিক্ষায়! চক্কর দিচ্ছিলাম, আজ শিলিগুড়ি, কাল সোজা শ্যামবাজার। কলেজ স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিটের দু-একটা মেসে আমার ঠেক ছিল। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, কিন্তু একটু-আধটু লিখতাম। গল্প। নতুন গল্প, শাস্ত্র বিরোধী — এসবের খোঁজ-খবর ছিল। ওই কায়দা ফলিয়ে দু-চারটে গল্প আমার তখন বের হয়েছিল *সংক্রান্তি, নিষাদ, মধ্যরাত্রি, গল্পসরণী* এসব লিটল ম্যাগাজিনে।

আমার কলকাতার বন্ধুরা ভাস্কর, তুষার, সুব্রত, কৃপাসিন্ধুরা কবিতা লিখলেও, জীবনে একটাও পদ্য লিখিনি আমি।

তো, এসে গেল চলো-চলো গ্রামে চলো-র সময়। হাওয়া বাতাসেও কী একটা ঘুরপাক দিয়ে উঠেছিল সে-সময়। পার্টি বলেছিল, এটা রেখে দাও। বুদ্ধিজীবী কমরেডেরও নিরাপত্তা দরকার। কাগজে মুড়ে ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম। দাদা-বউদির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ ছিল না। কিন্তু একদিন অকারণে বউদি আমার ড্রয়ার ঘাঁটতে গিয়ে মেশিনটা দেখতে পেয়ে আঁতকে চোখ কপালে তুলল। তারপর ধাতস্থ হয়ে সারা পাড়া মাথায় করে সে কী বিলাপ — 'তুমি কি তোমার দাদার হাতে হাত-কড়া পরাবে!' তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম — কমিউনিস্ট হওয়ার একটি প্রাথমিক ও আবশ্যিক পদক্ষেপ, গৃহত্যাগ।

যাদের গা থেকে ছাত্রগন্ধ যায়নি, সে দলে আমি ছিলাম মৃদু অগ্রজ। তাছাড়া কলকাতা যাতায়াতের অভিজ্ঞতা আছে আমার। পার্টি আমাকেই বলেছিল, নিয়ে যাও। নর্থ বিহারগামী চারজনের দলটিকে আগলে নিয়ে আমিই বালুরঘাট থেকে কলকাতাগামী নৈশবাসে উঠি। ১৯৬৮ সালের বিজয়া দশমীর সন্ধেয়। অদূরে আত্রেয়ী তীরে অনেক ঢাক বাজছিল। লিলি এসেছিল বাসস্ট্যান্ডে। ওকে বলেছিলাম, চিন্তা করো না। খোঁজখবর দেওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক ফিরে আসব একদিন। মন বলেছিল, আর কি কখনো কবে, এমন সন্ধ্যা হবে!

ধর্মতলা পৌঁছে সময় খরচ করতে আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে ওই চত্বরের সিনেমা হলে ম্যাটেনি শো, ইভনিং শো-তে হিন্দি ছবি দেখি। কী ছবি মনে নেই। আসলে ঢুলছিলাম তো। রাতে হাওড়া থেকে নর্থবিহার এক্সপ্রেস ধরি। আমহার্স্ট স্ট্রিট মেসের বিজু আগেই টিকিট কেটে রেখেছিল। সে-ই জানিয়েছিল, আসানসোলে আরও দু-জন কমরেড যোগ দেবেন।

অনেক রাতে ট্রেন আসানসোল পৌঁছোতে, ও হরি! দু-জনের একজন তো মোরব্বা। 'আরে মোরব্বা' — উল্লাসে আমি চেঁচিয়ে উঠতেই, সে চোখে-মুখে নিষেধের ভঙ্গি করে। ট্রেনের সিটের নিচে ব্যাগ ঢুকিয়ে আমাকে বাথরুমের দিকে টেনে নিয়ে বলে, 'খবরদার এখন থেকে আমার আসল নাম কখনো বলবি না। আমি এখন 'সবুজ'। শুধু 'সবুজ'।

এরকম নাম বদলানো, ছদ্মনাম — এসব আমাদের পার্টিতে হরবকত। আমিও কি তখন জানতাম, সেই যে আমাদের পার্টির সেক্রেটারিয়েটে ছিলেন খোকন সমাজদার, তিনি আসলে আবদুল আজিজ, আসামের করিমগঞ্জ থেকে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। কিংবা চন্দননগরের ভট্টাচার্য বাড়ির জয়ন্তদা, সবাই তো তাঁকে জানত 'মৈনুদ্দিন' নামে।

মোরব্বা বলায়, মনে হল কী যেন ওর ভালোনাম, ভুলেই গিয়েছিলাম। 'মোরব্বা' নামটা আমিই দিয়েছিলাম। সিউড়ি থেকে ফি বছর আসত মায়ের সঙ্গে বালুরঘাটে মামারবাড়িতে। স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটিতে, পুজোর ছুটিতে। মিলন সংঘ ক্লাবের মাঠে আমরা দুই বালক একসঙ্গে সাইকেল চালানো শিখেছিলাম। ওর মা কৌটো ভরে নিয়ে আসতেন বিচিত্র সব মোরব্বা। কুমড়োর মোরব্বা, পেঁপের মোরব্বা, গাজরের মোরব্বা, শতমূলী মোরব্বা। শেকড়ের মোরব্বা খেয়ে বড়োই আশ্চর্য হয়েছিলাম। সেই সূত্রে ওকে আমরা 'মোরব্বা' বলে ডাকতাম। ক্লাস এইটে আত্রেয়ী এপার-ওপার করে আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল মোরব্বা।

সেই মোরব্বা আমাদের সঙ্গে ট্রেনে! আমার বিপুল আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু সে উল্লাস দেখানো চলবে না। দূরের ট্রেনে যাচ্ছিলাম, কেন যাচ্ছি, কী উদ্দেশ্যে তা নিয়ে যাতে কারো কোনো সন্দেহ না হয়। সে-জন্য কৌশলও তৈরি ছিল। আমাদের সঙ্গে ছিল বালুরঘাট পলিটেকনিকের যে হিন্দিভাষী ছাত্রটি, কমরেড রামাশ্রয়, আমরা তার বন্ধুরা যেন চলেছি তার বিয়েয়, তার দেশের বাড়িতে। বিবাহের একটি নিমন্ত্রণপত্র সঙ্গে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল হিন্দিতে কিষেণগঞ্জ থেকে ছাপিয়ে। ট্রেনে রামাশ্রয়কে বিয়ের ব্যাপারে মাঝে-মাঝেই ঠাট্টা ফক্কুড়ি করছিলাম — সহযাত্রীরা যাতে কোনো সন্দেহ না করেন। তা সত্ত্বেও একজনকে যেন কেমন-কেমন লাগছিল। মাঝবয়সি, হাওড়া থেকে ওঠা ভদ্রলোক হাসি-হাসি মুখে নানারকম তত্ত্বতালাশ করছিলেন আমাদের। কে কী পড়াশুনো করি, বালুরঘাটে কোথায় থাকি? বিশেষত আমাকে ঘিরেই তাঁর অধিক কৌতূহল। কেননা হংস মধ্যে বকের মতোই লাগছিল আমাকে। আঠেরো-কুড়িদের ভেতর চব্বিশ। অনেক রাতে ট্রেনে যখন আমাদের কয়েকজন ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে, তখন দেখলাম লোকটা ছোট্ট নোটবুকে কী যেন লিখছে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হল। লোকটা সত্যিই ডাবর কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ? মুঙ্গের যাচ্ছে?

যাক, শেষ পর্যন্ত কিছু ঘটেনি। বেগুসরাইয়ের আগে আমরা অবশ্য হাতিদা স্টেশনে নেমে পড়লাম। পার্টি বলেছিল, ওই স্টেশনেই নামতে। আমাদের নিতে এসেছিলেন কমরেড কেপি। কৃষ্ণপ্রসাদ মিশ্র। পরে মিশিরজি নামে জাহানাবাদ, ভোজপুর জেলায় বিখ্যাত হয়েছিলেন। হাতিদা স্টেশনেই কমরেড কেপি-কে বলেছিলাম ট্রেনের এই অতি কৌতূহলী সহযাত্রীটির কথা। শুনে কেপি বললেন, হতে পারে আপনাকে মার্ক করেছে। আপনাকে অন্য কোথাও শেলটার দিতে হবে। গোটা দলটার সঙ্গে, মোরব্বার সঙ্গে, আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল পরদিন। বাসে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল পাটনা।

তারপর পাটনায় আমি কোথায় ছিলাম, কতদিন ছিলাম, কতদিন পর

কলকাতায় ফিরলাম, কলকাতায় ছিলাম কোন শেলটারে — সেসব বিস্তারিত বলার দরকার নেই।

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর জেলায় ভূস্বামীদের হাভেলিতে কৃষকেরা অগ্নিসংযোগ করেন, লুঠ করেন শস্যভাণ্ডার ও অস্ত্রশস্ত্র। উভয়পক্ষে বেশ কয়েকজন হতাহত হন। পার্টি বলেছিল উত্তর প্রদেশের কৃষকদের অভ্যুত্থান-আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করে দিতে। এই উদ্দেশ্যে আমি রওনা হই।

ওই বছর ৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় বিহারের ভোজপুরে আরা শহরের পাকরি চকে এক সংঘর্ষে (আমাদের ভাষায় ফেক-এনকাউন্টার) আমাদের চার কমরেড শহিদ হন। ৭ এপ্রিল ট্রেনে মোকামা রেল স্টেশন থেকে কেনা পাটনার হিন্দি দৈনিক *জাগরণ*-এ নিহত চারজনের ছবিতে বিহারের তিনজনের নামের পর অজ্ঞাত পরিচয় চতুর্থ জনকে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলি, মোরব্বা! আমাদের মোরব্বা! ট্রেনেই আমি হাহাকার করে উঠতে পারতাম; কিন্তু পার্টি আমাদের দুঃখ, শোক, কষ্ট — এসব নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিয়েছিল। সে-সময় মোবাইল তো নয়ই, টেলিফোন করারও তেমন সুবিধা ছিল না। উত্তর প্রদেশের জালাউন শহরটি থেকে কীভাবে মাসাধিক কাল পরে মোরব্বার মৃত্যুসংবাদ তৎকালে ভ্রাম্যমাণ পার্টি নেতৃত্বকে জানিয়েছিলাম, তাও বিস্তারিতভাবে জানানোর দরকার নেই। পাটি বলেছিল, মোরব্বার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখতে।

মোরব্বা জীবিত, সে বেঁচে আছে। পার্টি চেয়েছিল। আমি পার্টির সেই চাওয়া হাসিল করে চলেছি।

২

Abhinandan.
Amake ki Mone Pare?
Bidisha.

এই তো গত বছর যেদিন ফোনে রামকুমার জানাল, আমার *শেষ চিঠি* ও *অন্যান্য চিঠিপত্র* উপন্যাসটি এবারের সাহিত্য অকাদেমি পেয়েছে, তার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ই-মেলে পেলাম এই অভিনন্দন বার্তা। আমি, চিরন্তন বসু যে ধরনের লেখালিখি করি, তাতে আমাকে ঠিক জনপ্রিয় লেখক বলা যায় না তবে একটা একটা পাঠক-পাঠিকা মহল আছে, যাঁরা জনপ্রিয় লেখকদের তেমন পাত্তা দেন না, তাঁরা আমাকে নিয়ে ঈষৎ নাচানাচিই করে থাকেন। তাঁরা সংখ্যায় দুশো-তিনশো হলেও, তর্কপ্রিয় বাঙালি দলের। এ দলের কয়েকজন প্রাবন্ধিকও আছেন যাঁরা গত কয়েক বছর আমার গল্প উপন্যাস নিয়ে প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ লিখছিলেন। সভা-সমিতিতে আমি খুব একটা যাই না। কলকাতায়ও খুব একটা নয়। বাইরে, এমনকী পাড়াতেও আমাকে লোকে মনে করে খুব গম্ভীর। শুধু লিলি আর আমাদের মেয়ে শিঞ্জিনী জানে এই বাষট্টি-তেষট্টি বছর বয়সেও আমি কতটা ফাজিল।

ই-মেল পেয়েই মেয়েকে ডাকলাম, দ্যাখ, দ্যাখ, তোর মা আমাকে কী মনে করে, অ্যাঁ! মেয়ে বলল, ইল্লি, তোমার ফ্যান! মেয়েটাকে ডাকো একদিন, কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে চলে আসুক। দেখে মা জ্বলুক। গজগজ করুক। সই করে বই দাও। বাপ-বেটির উল্লাসে লিলি ছুটে এসে ই-মেল দেখে বলল, ঢং! শিঞ্জিনী বলল, কলকাতা বইমেলায় সেই যে মেয়েটা অটোগ্রাফ নিল, তুমি নাম জিগ্যেস করলে, সেই মেয়েটাই নয় তো? সেই জন্যেই হয়তো লিখেছে, মনে আছে আমাকে? সেদিন আরও কয়েকটা ই-মেল এল। ফোন এল বেশ কয়েকটা। কিন্তু বিদিশার অভিনন্দন বার্তায় 'মনে আছে আমাকে?' এই সকাতর জিজ্ঞাসাই মন ছেয়ে রইল আমার। পুলিশের তাড়া খাওয়া কত রাত্রির কত আশ্রয় মনে পড়ল। বিদিশা কি সেসব পরিবারের কেউ? কোনো কমরেডের বোন?

ভুলেও গেলাম কয়েকদিনের মধ্যে ওই ই-মেলের কথা।

বিজু নিয়ে গিয়েছিল আমাকে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। বাগবাজারের গলির ভেতর *যুগান্তর* অফিস। এই অফিসে একসময় আমাদের মুখপত্র *দেশপ্রেমী*-র সম্পাদক মনোজ দত্ত কাজ করতেন। সর্বানন্দদা কাজ করতেন। শ্যামল তখন *অমৃত* সাপ্তাহিকটি দেখছেন। আমাকে পেয়েই বললেন, জেল ডায়েরি লিখুন না, আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন নিয়ে? শহিদ হয়েছেন যেসব নেতারা, মনোজদা... ওঁদের কথা? বিজু বলল, ও গল্প লিখত। শ্যামল বললেন, দারুণ। তাহলে আসুন না একদিন আমার বাড়িতে।

কাশীপুরে যেখানটায় আমার পুরোনো বন্ধু তুষার, ফাল্গুনীদের বাড়ি, তার কাছেই সরকারি আবাসন। ওঁর স্ত্রী লুচি-ফুলকপি খাওয়ালেন। তখনও যত্রতত্র ভোজনং, শয়নং অভ্যাসটা যায়নি। গোগ্রাসে খাওয়া দেখে কেন জানি না শ্যামল বললেন আপনি উপন্যাস লেখারই লোক। আমি কিন্তু দুটো গল্প দিলাম। শ্যামল বললেন লেখক হিসেবে আপনার নামটা চলবে না। মাইকেল ছাড়া মধুসূদনকে মানায় না। আপনি আবার মধুসূদন বড়াল! উঁহু, এ-নামে কোনো লেখক হতে পারে না। ছদ্মনাম নিন। আমি মেনে নিলাম। পার্টিজীবনে আমাদেরও তো কত ছদ্মনাম। খোকন সমাজদার, মৈনুদ্দিন, সবুজ সেন...। মোরব্বার ভালোনামটা মনে পড়ল আমার, সিউড়ির জেলা স্কুলে যে নাম ছিল তার।

চিরন্তন বসুর দুটি গল্প এই শিরোনামে ১৯৭৮ সালের *অমৃত* পত্রিকার একটি সংখ্যাতেই একসঙ্গে আমার দুটো গল্প ছেপে দিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। নতুন লেখকদের নিয়ে *অমৃত* পত্রিকায় এ-ধরনের অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন তখন তিনি। আমি সে পরীক্ষায় উতরে গেলাম। এক পাঠক চিঠি লিখলেন এই লেখকের একগুচ্ছ গল্প ছাপা হোক। সেবার *অমৃত* ও *যুগান্তর*-এ শারদ সংখ্যায় যথাক্রমে আমার উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত হল। নিজের লেখকজীবনের উত্থান বিষয়ে এর চেয়ে বেশি বলা সমীচীন নয়, বিশেষত এই ষাটোর্ধ্ব বয়সে। তবু বলা প্রয়োজন শ্রীমতী নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায় এক অধ্যাপিকা, আমেরিকায় পড়ান, আমার *ট্রেন আসছে না কেন?* উপন্যাসটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এ বিষয়ে *পেঙ্গুইন*-এর সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যেদিন প্রয়াত হন, সেদিন আমি ঢাকায়। কবি আল মাহমুদের বাসায় টিভিতে এ-সংবাদ শুনে আমরা দু-জনই শোকগ্রস্ত হই।

লিলির বিষয়ে কিছু বলতে হয়। সেই যে উত্তর বিহার যাওয়ার সময় বালুরঘাটের বাসস্ট্যান্ডে ও দেখা করতে এসেছিল, তারপর আমাদের দেখা হয় ১৯৭৩ সালে বহরমপুর জেলে। মাসে অন্তত দু-বার জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত বালুরঘাটের ওই সাহসিনী। বহরমপুরে ওর পিসিরবাড়ি। এটাই হল সুবিধা। জরুরি অবস্থার শেষ দিকটায় খুশি ভরা মুখে সে এসে জানায়, আলিপুরদুয়ারে গার্লস স্কুলে চাকরি পেয়ে গেছে সে। ইংরেজির টিচার। আমি ওকে বলি, তাহলে আমাকে আর কিছু করতে হবে না, বলো? ১৯৭৮-এর গোড়ায় জেল থেকে যেদিন বেরোলাম, লিলির সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওর দাদা আর পিসি-পিসেমশাই। তিনদিন পরে সন্ধ্যায় বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীতীরে লিলি আমার গালে কাদা লাগিয়ে দেয়, আমি ওকে জলে ভিজিয়ে দিই। এ বিবাহে শুকতারাটি সাক্ষী থাকে। আলিপুরদুয়ারে শামুকতলা রোডে লিলি বাসা ভাড়া নিয়েছিল। বালুরঘাটে দাদা আমাকে সমাদর করেই আমাদের পৈত্রিক বাড়ির আমার অংশটি ছেড়ে দিয়েছিল।

পার্টিতে তখন যতজন, তত টুকরো। মন বলেছিল, যেন পার্টি বলেছিল, তুমি লেখো। লিখতে শুরু করেছিলাম। আবার সেই কলকাতা যাতায়াত, কলেজ স্ট্রিট পাড়া, অমৃত অফিস, লিটল ম্যাগাজিন। চলছিল আমার টক্কর। বালুরঘাটের ওসি আমাকে বললেন, কেমন আছেন? কী করছেন? নেতা বনে-যাওয়া তেলকলের মালিক বঙ্কুবাবু, তিনিও ডেকে বললেন, ভালো আছেন তো, খবর-টবর কী? বাসে উঠেছি, অচেনা একজন বললেন, যাচ্ছেন কোথায়? শেষে আমি আলিপুরদুয়ারে লিলির কাছে গিয়ে থাকতে লাগলাম। লিলির দাদা, পিসি, পিসেমশাই ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ডেকে সই-সাবুদ করিয়ে বললেন ওই আত্রেয়ী-বিবাহ আমরা মানি না। বুঝলাম, সমাজবদল এক ইঞ্চিও ঘটেনি।

বছর চারেক হল হুগলির শ্রীরামপুর শহরের অদূরে হাওয়াখানা গ্রামে আমি ছোট্ট একটি বাড়ি করেছি। আমার মেয়ে শ্রীরামপুরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল, সেই সূত্রে শ্রীরামপুর। হাওয়াখানা গ্রামের অদূরে বেগমপুর, বড়া — তেভাগার কৃষক আন্দোলনের অন্যতম তীর্থস্থান। আমি ধানের গন্ধের ভেতর থাকব। বেগমপুরে শিল্পী গোবর্ধন আশ থাকতেন। মেয়েকে দেখতে, আমার আকর্ষণেও লিলি আলিপুরদুয়ারের স্কুলের ছুটি-ছাটা ছাড়াও আচমকা-আচমকা চলে আসত। হতেও পারে আমাকে পাহারা দিতে। শিক্ষিকার চাকরি থেকে অবসরের পর লিলি বরাবরের জন্য এখানে চলে এসেছে। আমাদের এদিকটায় দোয়েল, বুলবুল, খঞ্জনা, ফিঙে, মাছরাঙা ইত্যাদি পাখিরা রয়েছে। আমি সাতরকমের প্রজাপতি দেখেছি।

এই সেদিন লিলিই বলল, আলিপুরদুয়ারের অনুষ্ঠানটায় এবার তোমাকে যেতেই হবে। আমাদের রমলাদি খুব করে বলেছেন। মেয়েদের কলেজটা তো নতুন, তুমি দেখোইনি। যাও, যাও প্লিজ। কুরিয়ারে আসা কার্ড ও চিঠিটা দেখলাম, বিবেকানন্দ কলেজে বাংলা সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার। ফোনও করলেন দু-তিনজন। অনেকদিন পর একটু বালুরঘাটও ঘুরে আসা যাবে। দাদা-বউদি যথেষ্ট বুড়ো হয়েছে, দেখে আসব।

বিবেকানন্দ কলেজে আলোচনাচক্রে মঞ্চে বসতেই পাশে-বসা মহিলা বললেন, জানতাম তুমি আসবেই। আমি কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম। ঠিক শুনলাম তো? 'তুমি' সম্বোধন করলেন? ভদ্রমহিলার বয়স ষাট ছুঁই-ছুঁই হবে। এই বয়সে অপরিচিত সমবয়সিরা কেউ তুমি-তুমি বলে! অধ্যক্ষা ভাষণ দিচ্ছিলেন। তারই ভেতর পার্শ্ববর্তিনী ফের বললেন, অনেক বদলে গেছ, জঙ্গলে, জেলে একেবারে হতকুচ্ছিত হয়ে গেছ তুমি! বলে, মৃদু হাসলেন। নভেম্বর মাসে নর্থবেঙ্গলে আমি ঘামতে থাকলাম। এরপর তিনি বলতে ওঠায় আমি জানতে পারলাম, মহিলার নাম বিদিশা রায়চৌধুরী, বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ান। দেশে এলে শিলিগুড়িতে বোনের কাছে আসেন। সেই সুযোগে আলিপুরদুয়ারে টেনে এনেছে বিবেকানন্দ কলেজ।

বিদিশার পর বলতে গিয়ে বক্তব্য বড়োই এলোমেলো হয়ে গেল আমার। এরপর অন্যান্য বক্তারা বলছেন যখন, তখন আমি ভাবছিলাম এই বিদিশাই কি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আমাকে? কিন্তু এই মহিলাকে তো আদৌ চিনি না আমি!

বিবেকানন্দ কলেজের সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার বেলা একটায় শুরু হয়ে শেষ হল বিকেল চারটে নাগাদ। এরপর এই সেমিনারে আসা দুই তরুণ অধ্যাপক বালুরঘাট কলেজের অতীশ বিশ্বাস আর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশুমান ধর আমাকে ধরল। আলিপুরদুয়ার শহর একটু ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য। অতীশ শ্রীরামপুরের ছেলে, আমার লেখালিখি নিয়ে সে কয়েকটা তাত্ত্বিক প্রবন্ধ লিখেছিল। অংশুমান বর্ধমানেরই ছেলে, আমাকে নিয়মিত চিঠিপত্র দেয়। ওদের নিয়ে বক্সা ফিডার রোড ধরে রিকশায় বক্সা জঙ্গলের দিকে ঘুরে আসব, যাব কালজানি নদীর পাড়ে — এসব ভাবছি যখন, কী কাণ্ড! জুটে গেলেন ওই প্রগলভা বৃদ্ধা। রুমানিয়ায় থাকার জন্যই হয়তো লাল টুকটুকে গাল, এককালে রূপসীই ছিলেন বোঝা যায়। আবদার ধরলেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, চিরন্তন।

আমি একেবারে হেনস্থায় পড়ে গেলাম যখন অতীশ, অংশুমান একটা রিকশায় উঠে বসল। আর আরেকটায় উঠে বুড়ি আমাকে ডাকল, এসো চিরন্তন।

একটুও মনে নেই আমাকে? মনে নেই সিউড়ির সোনতোড় পাড়া? ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে সতীঘাটে তুমি যে আমাকে শুনিয়ে গাইতে 'এ যুগেতে লেনিন জানায় মাও-এর গলায় আহ্বান' — মনে নেই তোমার? মনে নেই? হাওয়ায় হু-হু করছিল কালজানি নদীর পাড়? বিদিশা বুড়ির এসব এলোমেলো প্রশ্নের মতো হাওয়া। আমি বুড়ো-চিরন্তন জবাব দেওয়ার বদলে মুখ দিয়ে এমন স্বর বের করছিলাম, যার অর্থ হ্যাঁ-ও হতে পারে, না-ও হয়।

রাতে বিবেকানন্দ কলেজ আমাদের থাকার জন্য যে ব্যবস্থা করেছিল, সেই গেস্ট হাউসে সবার আলাদা-আলাদা ঘর। টানা করিডোর। ঘুম আসছিল না। অনেক রাতে করিডোরের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে সিগারেট খাচ্ছি। যা ভেবেছিলাম, কোণের দিককার দরজা খুলে গেল। বিদিশা এলেন। লিলিকে ফিরে গিয়ে সব বলব। বলব যে তুমিই ঠেলেঠুলে আলিপুরদুয়ার পাঠিয়েছিলে। বিদিশা এসে পড়লেন একেবারে নিঃশ্বাসের আওতায়। মুখে সেই প্রশ্ন, ভুলে গেলে চিরন্তন? রেলিং-এ রাখা আমার হাতের ওপর তাঁর হাত কাঁপছে। সে কম্পন কতকাল আগের এক কিশোরীর। ওই থরো-থরো হাতের উষ্ণতা পাওয়ার কথা আমার নয়, আসল চিরন্তন বসুর, মোরব্বার।

পার্টি বলেছিল, মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখবে। সে জীবিত। আমি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

— *নতুন গল্পপত্র*, শারদ সংখ্যা, ২০০৯

বাংলার ছোটোখুকি

আমার মোবাইল নম্বরের দশটা সংখ্যার শেষ দুটো সংখ্যা ১৪। কী ভুল করে ফেললাম সুচরিতাকে সেদিন নম্বরটা দিতে গিয়ে, শেষ দুটো সংখ্যা উলটিয়ে বলে ফেললাম ৪১। ব্যাস, সেই থেকে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল আমার, এই বয়সেও।

আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে। তেমনই সন্ধ্যা ছিল সেদিন। আঠেরো বছর পর দেখা। আঠেরো বছর আমি এই শহর থেকে ঢের-ঢের দূরে থেকেছি, বছরে দু-একবার করে এসেছি। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর যাতায়াত কমে গিয়েছিল। তবে সুচরিতার সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি। কেন যে হয়নি, জানি না। আমাদের কোম্পানির গুজরাট, রাজস্থানের প্রজেক্টগুলোয় সুরাট, বিকানিরে কেটে গেল বছর বারো, এরপর থিতু হলাম কলকাতা অফিসে। কোম্পানির দেওয়া ফ্ল্যাটে থাকতে-থাকতেই কেষ্টপুর, তেঘরিয়া, পৈলান কি জোকায় নিজের একটি ফ্ল্যাট ফেঁদে ফেলতাম আমি, কিন্তু আমার মন করল নিজের জন্মস্থান, এই শহরটিতেই ছোট্ট একটি বাড়ি বানানোয়। জমি, নকশা, পুরসভা, পরচা, দলিল, সিমেন্ট, বালি, স্টোনচিপস, মিস্ত্রি, জোগাড়ে — এসবের দহরম-মহরমে সে বাড়ি খাড়া হতে বছর চারেক লাগল। দুটো ইএমআই-এ গৃহঋণ শোধ দিতে এখনও বছর চারেক লাগবে। বউ গজগজ করতে-করতে কলকাতা ছেড়ে লাগোয়া

জেলার এই মহকুমা শহরে এসেছে। অফিসের গাড়ির ড্রাইভারও হয়তো মনে-মনে গজগজ করতে-করতে সল্টলেকের অফিস থেকে আমাকে নিতে আসে, আবার ফিরিয়ে দেয়। বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েটি, ধন্যবাদ সরকার, দিব্যি হয়েছে। ও হ্যাঁ, ছেলে ইনফোসিসে, বেঙ্গালুরুতে।

হলো কী সেদিন, বিকেল-বিকেল অফিস থেকে ফিরেছি। ফের স্নান করলাম, চৈত্র মাস ফুরফুরে একটা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে বগলে বডি স্প্রে মেরে রাস্তায় বের হলাম। রেলস্টেশনের সামনে পোশাক-আশাকের মস্ত বাজার, এখন মল-টলও হয়েছে। চারদিকে আলো ঝলমল, চৈত্র সেল, নববর্ষের কেনাকাটা। হাতে দুটো প্যাকেট যে মহিলা বের হলেন 'আকাশ-বাতাস' নামের বিপনিটির কাচের দরজা ঠেলে, রাস্তায় জনতার ভিড়ে মিশে যেতে লাগলেন, মনে হল, সুচরিতা। ওর ডাকনাম ছোটোখুকি। আমি সে-ভিড়ে কিছুটা ধাক্কাধাক্কি করেই ওর কাছাকাছি একটু চেঁচিয়েই ডাকলাম, ছোটোখুকি...। এখন কত বয়স হয়েছে ওর পঞ্চাশ পেরিয়েছে কি, থামল ছোটোখুকি। রাস্তার ধারে চলে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। 'আকাশ-বাতাস'-এর আলোয় ঝলমল করছিল ওর মুখ।

এই বয়সে যেমন কথা হয়। ওর ছেলে চাকরি করছে দিল্লিতে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে, হেসে বলল, দিদিমাও হয়ে গেছি, নাতনি। আমিও জানালাম ছেলের কথা। আমি নই, যেন কেউ আমার ভেতর থেকে বলে বসল, আমাকে এখনও মনে পড়ে?

মাথা ঈষৎ নিচু করে, ফের মুখ তুলে ছোটোখুকি বলল, পড়ে। তখনই ওর হাতে মোবাইল দেখে আমি পকেট হাতড়ে নিজের মোবাইলটা বার করতে গিয়ে দেখলাম, আনিনি। বাড়িতে ফেলে এসেছি। সুচরিতা ওরফে ছোটোখুকি বলল, নম্বরটা দাও সেভ করে নিই। তখনই ঘটে গেল, ওই ভুল। শেষ দুটো সংখ্যা ১৪-র বদলে আমি বলে ফেললাম ৪১।

ভুল নম্বর নিয়ে সুচরিতা ঝলমল আলোর ভেতর রঙিন মানুষজনের মধ্যে মিশে গেল। সাদা ফ্যাটফ্যাটে পাঞ্জাবি-পাজামা-পরা আমার একটু পরেই মনে হতে থাকল — আরে, নম্বরটা তো ভুল বলেছি। কী ভুল! অত আলোর ভেতরও পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল আমার।

একেবারে পাতি বাংলা গল্প। পঞ্চাশ-ষাট দশকের বাংলা ছবিতে এমন গল্প থাকত। তবে ওই আমলে মোবাইল ফোন ছিল না। কিন্তু আমার এ গল্প সেইরকম নয়। সেদিন রাতে, একেবারে মাঝরাতে, ঘুম না আসায় ছাদে পায়চারি করছি, হাতে জ্বলছে সিগারেট, চৈত্র আকাশে ঝকঝক করছে তিনশো, পাঁচশো, হাজার তারা। আকাশে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আমার এই ৫১ বছর বয়সও উলটে গেল।

সেই ১৫ কি ১৬ বছর বয়সে ফুটবল খেলতে-খেলতে আমাদের বল আমবাগানের ভেতর ঝোপঝাড়ে ঢুকে গেল। বলটা নিতে গেছি, মাথার ওপর শুনতে পেলাম, কী নাম রে তোর? একটা মেয়ে! গাছে উঠেছে! গাছের ডালে বসে পা ঝুলিয়ে কষ্টি কাঁচা আম খাচ্ছে। আমের খোসা ছাড়াতে ফুটো করা ঝিনুকও তার হাতে। আমি থ। হতচকিত। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছিল সে সময়। ওই হাওয়ায় মেয়েটার ফ্রক উড়ে ইজের দেখা যাচ্ছে। আমাকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে দেখে গাছের ডালে সে চোখ-মুখে রাগি-রাগি ভাব করল। ফ্রকটা হাঁটু পর্যন্ত টেনে নিল। এরপর ঝপ করে লাফিয়ে আমার সামনে নেমে কাঁচা একটা আম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, খাবি?

ও-ই ছোটোখুকি, সুচরিতা। দিব্যি জড়িয়ে গেল আমার সঙ্গে, সেই বয়সে। কত তখন বয়স ওর, প্রায় আমার সমবয়সি, বছর এক-দেড় ছোটো। তখনকার দিনে এই বয়সি কিশোর-কিশোরীদের প্রকাশ্যে তেমন মেলামেশা ছিল না, কথাবার্তা হত না। এখনকার মতো এত কোচিং সেন্টার, কো-এডুকেশন স্কুল অন্তত মফস্সলে ছিল না। পাড়ায়-পাড়ায় ছেলেদের ঝাঁক আলাদা ঘুরত, মেয়েদের দল আলাদা। তারই ভেতর কারো-কারো আশনাই-টাশনাই চলত লুকিয়ে-চুরিয়ে, আড়ালে। তবে ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব বলে কোনো বস্তু ছিল না।

কিন্তু ছোটোখুকি সেসব ভেঙে দিল। ড্যাং-ড্যাং করে আমার সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ওইভাবে ঘুরতে আমারই গোড়ার দিকে লাজুক-লাজুক লাগত। পরে সয়ে গেল। গেছো মেয়ে — ওর পিসি চ্যাঁচাত সন্ধে নামলে। আমরা তখন খেলা শেষ করে মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জিরোচ্ছি, সাইকেলে সারামাঠ চক্কর দিত ছোটোখুকি। আর পিসি চ্যাঁচাত, বাড়ি আয়, গেছো মেয়ে, বাঁদর।

ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেব, হামানদিস্তায় কাচ গুঁড়িয়ে দিত ছোটোখুকি। তার জন্য কালীপুজোয় ওকে দিতে হত চার-পাঁচটা তুবড়ি। একবার বলল, কাচ গুঁড়োতে পারব না রে, শরীর খারাপ। জ্বর হয়েছে নাকি তোর? জিজ্ঞেস করতেই চোখে-মুখে একটা ধমকের ভান করে ছোটোখুকি বলল, এসব কথা ছেলেদের বলতে নেই। কাচ গুঁড়োতে পারব না, ব্যাস —। আমি বোঝা না বোঝার মনোভাবে চুপ মেরে গেলাম। প্রথম চুমু খেয়েছিলাম যেদিন, ওর মুখে ছিল পেয়ারার গন্ধ। আমাদের তুই-তোকারি চলল বছর কয়েক। হায়ার সেকেন্ডারির পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে হোস্টেল থেকে বাড়ি ফিরলাম যেদিন, সেদিন সন্ধেয় গঙ্গাতীরে তটিনী রেস্তোরাঁয় ও বলল, তুমি কেমন শুকিয়ে গেছ এই দশ-বারো দিনেই, হোস্টেলে খাচ্ছ না কিছু! ওই প্রথম 'তুমি'। আমিও ওই সন্ধেয় ওকে 'ছোটোখুকি' না বলে, 'সুচরিতা' বলে ডাকলাম। সম্পর্কটা কেমন যেন ঘন হয়ে এল আমাদের।

তখন তো নন্দন চত্বর, সিটি সেন্টার ছিল না। ছিল না মোবাইল, অরকুট, জিমেল, ইয়াহুমেল। ছিল গঙ্গাতীর, তটিনী রেস্তোরাঁ, হাওড়ার অলকা সিনেমা হল, শেওড়াফুলির উদয়ন, রিষড়ায় জয়ন্তী, শ্রীরামপুরের মানসী সিনেমা হল। সবিস্তারে বলার কিছু নেই। আমি আদৌ প্রেমের গল্প ফাঁদতে চাইছি না। আসলে দিতে চাইছি ঘটনার বিবরণ। কিন্তু তার আগে আরও কয়েকটা লাইন লিখতে হবে। হাওড়া ব্রিজের একেবারে মাঝখানটায় একদিন রেলিং-এ হাত দিয়ে ঝুঁকে সুচরিতা বলল তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা হবে না চন্দন, ইঞ্জিনিয়ার হতে তোমার এখনও কত্তো বাকি। চলো জলে ঝাঁপ দিই দু-জনে। যেন আত্মবিয়োগে শোকার্ত, দু-জনে হাওড়া এসে ফেরার ট্রেন ধরলাম। এরপর একদিন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস থেকে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে অলকা সিনেমা হলে বলল, বিয়ের পরও কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে ঘুরব, সিনেমা দেখব।

ও তখন বিএ পরীক্ষা দিয়েছে রিষড়ার বিধান কলেজ থেকে। বিয়ে হয়ে গেল। কাছে, এই শহর থেকে তিনটে রেলস্টেশন দূরের শহরে। বিয়ের পর দেখেছি বছরে দু-একবার। কুশল বিনিময় হয়েছে। দেখতে-দেখতে কেমন মহিলা হয়ে গিয়েছে ছোটোখুকি। আমি তখনও ছোকরা-ছোকরা। কয়েক বছর পর আমিই তো চলে গেলাম গুজরাট। আমার বিয়ে হল নাগপুরে, রীতিমতো বছর দুয়েক প্রেম করে। আমার স্ত্রী বাঙালি নন, মারাঠি।

২

বেয়ারা এসে বলল, পুলিস থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন। নীল বুশশার্ট স্মার্ট এক পুলিস অফিসার। আমার চেম্বারে ঢুকেই চারপাশ এক ঝলক দেখে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি কাঞ্জিলাল, সাইবার থানার। কী হয়েছিল বলুন তো?

কেন বার-বার ওই নাম্বারে ফোন করছি, মেসেজ পাঠাচ্ছি, আমি সংক্ষেপে কাঞ্জিলালকে বুঝিয়ে বললাম। বললাম, দেখুন। আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজনকে নিজের মোবাইল নাম্বারটা দিতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছি। লাস্ট দুটো ডিজিট এলোমেলো হয়ে গেছে। যাঁকে দিয়েছি, তিনি ওই ভুল নাম্বারে ফোন করবেন। তাই আমি ভুল নাম্বারে ফোন করে সাহায্য চাইছি, সহযোগিতা চাইছি। যদি আমার পরিচিত ওই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ফোন করেন, তাঁর নাম্বারটি যেন আমাকে জানান, এই অনুরোধ। সেই জন্যই ওই ভুল নাম্বারটিতে আমি বারবার কাতর আবেদন জানাচ্ছি, মেসেজ পাঠাচ্ছি।

কাঞ্জিলাল শুনলেন। বললেন, নাথিং রং। তবু প্লিজ, সন্ধের দিকে একবার আসুন না লালবাজারে, সাইবার থানায়। মেয়েটির বাবা আসবেন। কথা বলে নেবেন। আমি বললাম, যাব।

কাঞ্জিলাল আসার দিন তিনেক আগে অফিসে এসেছিল একটি ছেলে। আমি রঙ্গিত, আপনার অফিসের কাছেই সেক্টর ফাইভে চাকরি করি। পৃথাকে আপনি ডিসটার্ব করছেন কেন?

সে-কথা আমি আপনাকে বলব কেন? আমি একটু মজা করতে চেষ্টা করলাম।

রঙ্গিত হেসে ফেলল, বলল, আপনি শুভজিতের বড়োমামা, আমি সব খবর নিয়ে এসেছি। কিন্তু মামা, পৃথাকে বিরক্ত করছেন কেন? পৃথা কিন্তু হেভি টেরোটিস্ট টাইপের মেয়ে, যাদবপুরে উপাচার্যকে তিনদিন ঘেরাও করে রেখেছিল। প্লিজ আর ফোন করবেন না, মেসেজ পাঠাবেন না, মেল করবেন না। আমি রঙ্গিতকে কফি খাইয়ে ছেড়ে দিলাম।

হয়েছিল কি, সুচরিতাকে ভুল নাম্বার দিয়ে যে রাতে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল আমার, মাঝরাতে পাঁচশো, হাজার তারা দেখতে-দেখতে ঘোর অন্ধকারের ভেতর বিদ্যুৎচমকের মতো মাথায় এসেছিল একটি উপায়। পরদিন থেকেই আমি কাজে নেমে পড়লাম। ওই ভুল নাম্বারে ফোন করতে লাগলাম — প্রথমে আমার নাম্বারের আটটি ডিজিট, এরপর ১৪-কে উলটিয়ে ৪১। মনে হল, কত দয়ালু মানুষ আছেন, আমার সমস্যাটা বুঝবেন, সহায়তা করবেন। মনে হল, অনেকেরই ছোটোবেলার চিরবান্ধবী আছেন, বাংলায় কত যে ছোটোখুকি।

নারীকণ্ঠ ভেসে এল, রং নাম্বার। আমি ফের ফোন করলাম, লিস্‌ন মি, প্লিজ...। ফের নারীকণ্ঠ, আই টোল্ড য়ু রং নাম্বার। আবার ফোন করলাম, উত্তর এল, প্লিজ, ডোন্ট ডিসটার্ব মি। আমি এবার মেসেজ পাঠালাম, প্লিজ হেল্প মি, প্লিজ কো-অপারেট মি, আই ডান আ মিসটেক... মেসেজের সঙ্গে আমি অফিসের ঠিকানা, পেশা, আমার পদ, আমার ই-মেল অ্যাড্রেস এসব দিয়ে দিলাম। এবার pritha1000@gmail.com থেকে ই-মেল এল... don't disturb me...। তখনই জানতে পারলাম, ওর নাম পৃথা। আমি মোবাইলে মেসেজ পাঠাতে লাগলাম প্লিজ পৃথা, প্লিজ। মাসখানেক ধরে রোজই বারবার মেসেজ পাঠাতে লাগলাম, বারবার ই-মেল।

এরপরই রঙ্গিত। ভাগনের বন্ধু (?) রঙ্গিতকে আমি পাত্তাই দিলাম না। ওকে কফি খাইয়ে ছেড়ে দেওয়ার পরই ফের পৃথাকে মেসেজ। তিনদিনের মাথায় এলেন লালবাজারের সাইবার থানার কাঞ্জিলাল।

সেদিন সন্ধ্যায় লালবাজারের সাইবার থানায় ঢুকে মনে হল হলিউডের ছবিতে এরকম জিজ্ঞাসাবাদের কাচের দেওয়াল দেওয়া ঘর দেখেছি। পৃথার বাবা রায়চৌধুরী কাচের ওপারে রয়েছেন, আমার সমবয়সিই হবেন। শুনলাম রয়েছেন এক সাইকিয়াট্রিস্টও। দুপুরে অফিসে কাঞ্জিলালকে যেভাবে বলেছি, সাইবার থানার জেরা ঘরে তেমনিভাবে সমস্যাটা বললাম। সাইবার ওসি মল্লিক বললেন, মেয়েটা বাচ্চা, ওর সমস্যা হচ্ছে। প্লিজ ফোন করা, মেসেজ পাঠানো — এসব বন্ধ করুন। মনোবিদ ডা. বসু বললেন, না, না, আপনি কোনো প্রবলেম নন। আপনি একেবারে সাউন্ড। পৃথার বাবা রায়চৌধুরী হাত ধরে বললেন, মি. চক্রবর্তী, প্লিজ...। ওসি মল্লিক বললেন, বাড়ি যান। রেস্ট নিন। দু-পাঁচ দিন কোথাও বেড়িয়ে আসুন না। নিজের সমস্যাটা দেখবেন কেটে গেছে।

বাড়ি ফিরে হুইস্কি খেলাম তিনটে-চারটে। পরদিন আবার ফোন পৃথাকে, আবার মেসেজ। এরপর কেমন যেন কেতরে মতো গেলাম। আলসেমি ছেয়ে বসল মনে। সপ্তাখানেক এই অবস্থায়। এই সেদিন, গত মঙ্গলবার বিকেল-বিকেল বেয়ারা বলল, এক ভদ্রমহিলা এসেছেন। এল উনিশ-কুড়ির একটি মেয়ে, যেন ওই নামের পত্রিকাটির প্রচ্ছদ থেকে উঠে এসেছে।

আমি পৃথা, যাদবপুরে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি, সেকেন্ড ইয়ার। বলুন তো, আপনার সমস্যা কী?

একটু কফি খেতে-খেতে কথা হোক, আমি বলতেই, পৃথা বলল, ফাইন। আমি আমাদের ঝকঝকে কফিবারে নিয়ে গিয়ে বসালাম। শুরু করলাম সেই পনেরো-ষোলো বছর বয়সের ফুটবল মাঠ, আমবাগান, ঘুড়ির সুতোর মাঞ্জা, তটিনী রেস্তোরাঁ, গঙ্গাতীর, অলকা সিনেমা হল, হাওড়া ব্রিজ...। যে গল্প পাতি প্রেমের গল্প বলে সবিস্তারে এখানে লিখিনি, পৃথাকে সব বললাম ডিটেলে। শুনতে-শুনতে কখনো-কখনো আলো ঝলমল করছিল পৃথার চোখ-মুখে, কখনো-কখনো চোখ ছলছল। প্রথমবারের কফি ফুরিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর দ্বিতীয়বারের কফি অর্ডার করতে যাচ্ছি, পৃথা বলল, আপনাদের এখানে আইসক্রিম পার্লারও রয়েছে দেখছি। ওর জন্য একটা কর্নেটো আনালাম।

পৃথাকে বলা আমার গল্প শেষ হল। নটে গাছটি যেই মুড়োল, পৃথা বলল, ইল্লি, আমারও তো ডাকনাম ছোটোখুকি। আসানসোলের বাড়িতে জেঠু ডাকে, জেম্মা ডাকে। বজাইদাদা, পুপুনদিদি ডাকে।

আমার দুনিয়া আবার ঝলমল করে উঠল।

— *নতুন গল্পপত্র*, শারদ সংখ্যা, ২০১০

একটি তুলনামূলক সাক্ষাৎকার ২০১২ ও ২০০১

মাঝে এগারো বছর কেটে গিয়েছে। এটা ২০১২। আর, সেটা ছিল ২০০১। সেবারও মৃদুল দাশগুপ্তেরই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম আমরা। এই কাগজেই। আর, এবার একটু চাতুরি করে করেছি কী, সেই একই প্রশ্ন, আবার মৃদুলদার সামনে রেখেছি! অবশ্যই মৃদুলদাকে একেবারে না জানিয়ে। মৃদুলদাও উত্তর দিয়েছেন। আমরা প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে দু-টি করে উত্তরই ছাপালাম। ২০১২ ও ২০০১। এই তুলনামূলক সাক্ষাৎকারে এগারো বছরের কোনো পরিবর্তন কি ধরা পড়ছে?

বলে রাখি, সব প্রশ্ন অবশ্য তুলে আনিনি। বর্তমানে প্রাসঙ্গিক, বা আজও প্রাসঙ্গিক, এমন প্রশ্নগুলোই মূলত বেছে নিয়েছি আমরা। মূল ভাব এক রেখে, কিছু ক্ষেত্রে একটু-আধটু ভাষা বদলে নিতে হয়েছে। আর বদল বলতে, সেবার বসেছিলাম বরানগরের বাসায়, এবার শ্রীরামপুরের 'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ'-এ। সেবার ছিল ক্যাসেট রেকর্ডার, এবার ডিজিটাল। মিল বলতে, এবার মৃদুল দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বলেছেন সম্বিত পাল ও সুস্নাত চৌধুরী। সেবারও ছিলেন এই দু-জন। আর যেটা খানিক কাকতালীয়, খানিক ষড়যন্ত্র — দু-টি সাক্ষাৎকারই নেওয়া ৮ সেপ্টেম্বর! শনিবারের বারবেলায়! মাঝে শুধু এগারোটা বছর...

মৃদুলদা, খুব প্রথাগত প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছি — আপনার লেখালিখির শুরু কীভাবে এবং কী ভেবে?

২০১২ : এই শুরুটা একেবারেই যখন আমি স্কুলে, মানে, সিক্স-সেভেন-এ পড়ি। আমার এক মাসি ছিলেন, তিনি খুব কবিতা পড়তেন। তাঁর দেখাদেখি আমি কবিতা পড়া শুরু করি। *দেশ*, *অমৃত* এইসব পত্রিকার কবিতা। সেটা ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়। এইটার পাশাপাশি আমিও কবিতা লেখার চেষ্টা করতে থাকি। সেই সময়টায় বলা হত 'আধুনিক কবিতা'। আর, আমার এক বন্ধু গোরা, সে-ও কবিতা লিখত। আমরা দু-জনে মিলে এরকম লিখতে শুরু করি। আমি অনেক ছড়াও লিখতাম। তখনকার *যুগান্তর* পত্রিকায়, ছোটোদের বিভাগে। এইভাবে শুরু হল।

আর, এই যে কবিতা পড়তাম — সেই সময় আরেকটা কবিতার কাগজ ছিল, জগদীশ ভট্টাচার্যের *কবি ও কবিতা* — এই পত্রিকাটা আমি বাবাকে বলতাম কিনে আনতে। ওই সিক্স-সেভেন-এর সময়। কবিতা পড়তে-পড়তে-পড়তে-পড়তে... একদিন, একেবারে, আক্ষরিক অর্থেই, মনে হল, একটা দরজা খুলে গেল। আমি ওই কবিতাগুলোর মর্ম গ্রহণ করতে পারছি। পাঠক হিসেবে আমি কবিতার মর্ম গ্রহণ করতে পারছি। সেটা দরজা খোলার মতো একটা আনন্দ।

২০০১ : লেখালিখির শুরু যে সময়টায়, সেটা স্কুলে পড়ার বয়স। যখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠলাম, নাইন-টেনে, সেই সময়টাতেই আমাদের এই বাংলায় — চারপাশে নানারকম... মানে... পিছন দিকে তাকিয়ে এখন বুঝতে পারি, নানারকম সৃষ্টিশীলতার ঢেউ উঠল — উঠতে শুরু করল — সেটা সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন থেকেই। নতুন নাটক, নতুন ছবি আঁকার যে নতুন শিল্পীরা, গান, মানুষের একটা নতুন ভাবনার ধারা সেই ষাটের দশকের শেষ দিকটায় এসেছিল। আমরা যারা সেই সময়ের কিশোর, তারা নানাভাবেই এসব ঢেউ-এর ভেতর — কেউ নাটক করা, কেউ ছবি আঁকা, কেউ লেখালিখি, কেউ ছোটো পত্রিকা প্রকাশ — এসবের ভেতর নেমে পড়লাম। ছবি না-এঁকে, নাটক না-করে, আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করলাম — কারণ, হয়তো এই ধরনের লেখা লিখতে ওই বয়সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলাম। এইটা লিখতে পারব বা এটাই আমার লেখার চেষ্টা করা উচিত — এই ভেবে আমি কবিতার ফাঁদে পা বাড়ালাম।

একেবারে প্রথম দিকের লেখার থেকে *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর লেখা — কোনো পরিবর্তন এসেছিল বলে মনে হয়?

২০১২ : না, আমার তা মনে হয় না। ১৯৮০-তে *জলপাইকাঠের এসরাজ* প্রকাশিত হয়েছে। *জলপাইকাঠের এসরাজ* ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত দশ বছরের কবিতা থেকে বেছে নেওয়া। মানে, *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এ আটষট্টি সালে লেখা কবিতাও আছে। সূচনার যে জায়গাটা, শুরুর যে জায়গাটা — যেসব কবিতা আমার তখনকার পত্রিকায় — *শীর্ষবিন্দু*, *কণ্ঠস্বর*, *এবং* এসব কাগজে বেরিয়েছিল — সেগুলোই তো *জলপাইকাঠের এসরাজ*।

২০০১ : আসলে, একদম স্কুলে পড়ার সময়কার, উনসত্তরের একটা লেখাও ওই বই-এ আছে। *নিয়মতান্ত্রিক*। তবে ওই সময়ের লেখা আর সাতাত্তর-আটাত্তর সাল — মানে, হ্যাঁ, একটা বিবর্তন তো আছেই।

শুধু যদি *জলপাইকাঠের এসরাজ* নিয়ে কথা হয়, তবে তার ভেতর নানারকম কবিতা আছে। সত্তর থেকে উনআশি — এই যে কবিতা রচনার

স্প্যানটা — এটা তো বেশ অনেকটা সময়; এতগুলো বছরে নানারকম পরিবর্তন ঘটেছে — যে জন্যই কবিতাগুলো নানারকম। এটাই মনে হয়।

একেবারে শুরুর দিকে যখন আপনি কবিতা লেখার প্রয়াস চালাচ্ছেন, আজ কী মনে হয়, সে-সময় কোনো বিশেষ কবির ছায়া আপনার উপর পড়েছে?

২০১২ : *জলপাইকাঠের এসরাজ* দীর্ঘ সময় ধরে লেখা। দশ বছর, তাই তো? দশ বছরের যে কবিতা, তা নিশ্চয়ই *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এ যা কবিতা আছে সেটুকুই নয়। *জলপাইকাঠের এসরাজ* যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন একটা বাছাই হয়েছিল। সে বাছাই-এ আমাকে সাহায্য করেছিলেন জয় গোস্বামী এবং গৌতম চৌধুরী। সেই বাছাই-এ, মানে, ষাট-সত্তর শতাংশ কবিতা বাদ গিয়েছিল। কিন্তু কারো ছায়া পড়েছিল কিনা, তা আমি তো বলতে পারব না। পাঠকরা বলতে পারবেন।

জলপাইকাঠের এসরাজ-এ নানারকম কবিতা আছে। *জলপাইকাঠের এসরাজ* যখন বেরোল, সে বইটা আমি কয়েকজনকে দিয়েছিলাম। নির্মল হালদার আমাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কাছে। বইটা দেওয়ার পর আমাকে দু-একজন চিঠি দিয়েছিলেন, সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত কবিদের ভেতর। প্রণবেন্দু তাঁদের একজন। প্রণবেন্দু আমাকে চিঠিতে একথা বলেছিলেন, এবং আমাকে সতর্ক করেছিলেন — *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এ নানারকম কবিতা আছে। তিনি 'বিক্ষিপ্ত' শব্দটা লেখেননি; কিন্তু বুঝিয়েছিলেন, *জলপাইকাঠের এসরাজ* বিক্ষিপ্ত। এইটা আমার মনে বেশ ধরে যায়। যেহেতু *জলপাইকাঠের এসরাজ* দশ বছর ধরে লেখা, এবং ওই দশটি বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের নানা ভাঙচুর তাতে আছে। মানে, ব্যাপারটা হচ্ছে যে, আজকের যে দশ বছর, আজকে হচ্ছে ২০১২ সাল, গত যে দশবছর, মানে, ২০০২ থেকে ২০১২, এই যে দশ বছর — তাতেও ধীরে-ধীরে নানারকম চেঞ্জ হচ্ছে; ২০০২ আর ২০১২ সাল এক নয়, ধীরে-ধীরে চেঞ্জ হচ্ছে। কিন্তু, এটা একটাই সময়। সময়টা একটাই সময়। কিন্তু, উনসত্তর সাল আর সত্তর সাল এক নয়, সত্তর সাল আর একাত্তর সাল এক নয়, একাত্তর সাল আর বাহাত্তর সাল এক নয়! কিন্তু ২০১১ সাল যেরকম তোমার কেটেছিল, ২০১২-ও তা-ই কাটছে, ২০১০ সালও সেইরকম কেটেছিল। কিন্তু উনসত্তর সাল আর বাহাত্তর সাল এক নয়। বাহাত্তর সাল আর চুয়াত্তর সাল এক নয়। সময়ের র‍্যাপিড চেঞ্জ হয়েছে। এই দ্রুত চেঞ্জ হওয়ার যে ব্যাপারটা, সেটা যারা লেখালিখি করছে, তাদের ভেতরও ক্রিয়া করেছিল। ফলে *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এ সাতষট্টি সালের কবিতা আর *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এ বাহাত্তর সালের কবিতা এক নয়। তাই, সেখানে নানারকম লেখা আছে। প্রণবেন্দু এটা আমাকে বুঝিয়েছিলেন, মানে, সতর্ক করেছিলেন।

আর *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর আগের কবিতা বলে কিছু নেই। শুরু থেকে আটাত্তর সাল পর্যন্ত কবিতাই *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর কবিতা।

২০০১ : *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর গোড়ার দিকে সত্তর-একাত্তর-বাহাত্তরে বাংলা কবিতা ঝলমল করছে মনে হয়। সে-সময় আমাদের অগ্রজ কবিদের কবিতা, যা আমাদের পছন্দ হত, সেসব হই-হই করে পড়েছি। শুধু নামে নয়, কারো একটা ভালো কবিতা হয়তো পড়লাম, তাতেও আহ্লাদিত হয়েছি। সেইভাবে আমি নানা দিক দিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা চালিয়েছি। চালাই। চালাতে চেয়েছি। *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এ কার কীভাবে প্রভাব পড়েছে আমি নিজে বলতে পারব না। এটা মনে হয় পাঠকরাই বলতে পারেন। তবে আমি স্থায়ীভাবে কাউকে অনুসরণ করিনি। আমি নিজের রাস্তাটা খোঁজার চেষ্টাই করে গেছি। আমার মনে হয় না, সেভাবে আমাকে কারো অনুসারী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় বা যাবে।

কবি তো তাঁর কবিতায় নিজের স্বাক্ষর রেখে যান। আপনার লেখার যেমন নিজস্বতা রয়েছে; বা যদি একটু পিছিয়ে যাই বিনয়, শক্তি, উৎপল, ভাস্কর — এরকম অনেকের কথাই বলা যায়। একজনের লেখা আরেকজনের চেয়ে আলাদা। কিন্তু একদম এখনকার যে লেখালিখি, সেখানে এই নিজস্বতা কতটা রয়েছে বলে মনে হয়?

২০১২ : কবিতা তো চেঞ্জড হয়েছে। কবিতার পরিবর্তন হয়েছে। আজকের যে সাম্প্রতিক কবিতা, সেই কবিতা আর সত্তর সালের কবিতা আশি সালের কবিতা — চেঞ্জ হয়েছে। তার ভাষায়, তার ধারণায়, তার আঙ্গিকে, তার ভঙ্গিতে পরিবর্তন হয়েছে। সামগ্রিকভাবে হয়েছে। কিন্তু, তুমি যে ভাষার স্বকীয়তা বললে বা কবির স্বকীয়তা বললে, সেটা সাম্প্রতিক কালের কবিদের ভেতর তো সঙ্গে-সঙ্গে ধরা পড়বে না। এর জন্য সময় দিতে হবে — কাকে-কাকে চিহ্নিত করা যাবে...। কিন্তু এই মুহূর্তে যাঁরা-যাঁরা লেখালিখি করছেন, তাঁদের ভেতর দু-একজন উল্লেখ করার মতো জায়গায় এসেছেন বলে আমার বা আমাদের মনে হচ্ছে। পরে আমরা আলোচনা করে দেখেছি, বা পরে আমরা ভেবে দেখেছি, এঁরা কিছুটা সত্তরের মতো। মানে, তাঁরা অনুকরণ করছেন আমি বলছি না। কিন্তু তাঁরা আমাদের সম্পৃক্ত, এইজন্য ভালো লাগে। এটা এখনও বিবেচনাধীন।

যেমন শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়, যেমন সুমন ঘোষ। এঁদের লেখা আমার ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ হয়েছে। একেবারে হালফিল। মানে, আরও অনেকের হয়েছে, আমি ইমিডিয়েট দু-জনের নাম মনে করতে পারছি। ছন্দক শিকদারের কবিতাও আমার ভালো লেগেছে। আমার পরে এই ভাবনাটাও জাগছে, শ্যামসুন্দর যেন ঈষৎভাবে হলেও আমাদের সম্পৃক্ত। আমাদের থেকে আলাদা, কিন্তু কোথাও যেন ওই সম্পৃক্ত ভাব আছে বলে ভালো লাগছে না তো, এটা ভাবছি।

২০০১ : না। আসলে চটজলদি একজন কবি একটা রাস্তা দেখিয়ে দেবেন বা একটা স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেবেন — এটা হয় না। তার জন্য কুড়ি-তিরিশ বছর সময় লাগে। তখন দেখা যায়, একটা পথ ফুটে উঠছে যেন। এই ব্যাপারে আজকে কমবয়সি যাঁরা আছেন, তাঁদের দোষারোপ করা যায় না। তাঁরা এখন যাত্রা শুরুর আয়োজনে পরস্পর সংলগ্ন, কাছাকাছি। তো, সেই জায়গাটা থেকে তাঁরা কে কোনদিকে যাবেন, এটার জন্য আরেকটু সময় লাগবে। এত দ্রুত

আজকের লেখালিখিকে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়।

এছাড়াও আজকের সময়ের একটা ছাপ আজকের কবিতার ভেতরে রয়ে গেছে। মানুষের কাছে যেমন এই পৃথিবীটা ছোট্ট হয়ে গেছে, একটা বলের মতো তার হাতে। আবার মানুষও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। সে আর চারপাশের বিস্তারের জায়গাগুলিতে যাচ্ছে না। সে তার নিজের ঘেরাটোপে, নিজের প্রাপ্তি — এসব নিয়েই সে নিজের ছোট্ট পৃথিবীতে বাস করছে। এই যে সময়টা — এই সময়টার যে বিপদ-আপদ, যে থ্রেট, এই সময়টার যে ভীতি, ইভন এই সময়টার কোনো আশাও যদি থাকে আর কি, সেই জায়গাটা আজ থেকে তিরিশ বছর আগের সার্বিকতার ধারে-কাছেও নেই। ফলে আজকের কবিতার সঙ্গে আমরা যারা এত বছরের কবিতার পাঠক, তাদের মন মিলছে না। এটাও যেমন ঠিক, আবার উলটো দিক থেকে আমরাও হয়তো চিহ্নিত করতে পারছি না। তাই এত দ্রুত অভিযুক্ত করাটা ঠিক নয়। কবিতার সংকট যদি কিছু থাকে, তা-ও কবিতার পক্ষে যায়। মানে, সেই কবিতার সংকটে — সেই অবরোধ ভেঙে — যে কবিতা বেরিয়ে আসে, তা কালোত্তীর্ণ হয়। এইটা আমার মনে হয়। আজকের ভাষা নানারকম। কিন্তু আমি কবিতার মূলত দু-টি ধারা দেখতে পাই। একটা হচ্ছে — কবিতা একটা ফুরফুরে ব্যাপার। কবিতা আনন্দ দেয়, তৃপ্তি দেয় — এটা একধরনের কবিতার চর্চা। আরেকটা ধারা — সেটা ভাষাসন্ধানী এবং কিছুটা ছিন্নভিন্ন, দিশাহারা, এখনও জমাট বেঁধে ওঠেনি। এইটা এই সময়ের কবিতা-পড়ুয়া হিসেবে আমার মনে হয়।

আজকের কাব্যপ্রয়াসে কি তবে নতুন ভাষা সন্ধানের বা আবিষ্কারের প্রয়োজন রয়েছে?

২০১২ : নতুন ভাষা সন্ধান করতে পেরেছে, আমি বলছে না। কিন্তু একটা চেষ্টা, একটা মরিয়া চেষ্টা চলছে।

দু-নম্বর কথা, এখনকার ভাষা, এই সময়ের ভাষা, অনেকটা সাংকেতিক। মানে, আমার মেয়েদের বয়সি যারা, তারা যে কথাবার্তা বলে, তার অনেকটাই সাংকেতিক। এবং তার বারো আনা হয়তো মেসেজ। মানে, এই মোবাইল এবং ইন্টারনেট। এটার একটা এফেক্ট আছে। কাটা-কাটা ভাঙা-ভাঙা ভাষা। কবিতার ভেতরও সেই কাটা-কাটা ভাঙা-ভাঙা...

কিন্তু সেটা চেষ্টা। ভাষা ফুটে উঠেছে কয়েকজনের ভেতরে, এমনটা এখনও ঘটেনি। আবার, আমি যেটুকু বলছি, সেটা আমার পড়াশুনোর সীমার ভেতরে। এর মানে, আমি যে সবটা জানি, এমন তো নয়।

২০০১ : হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই। এইটা একদম সত্যি আমরা চোখের সামনে দেখতে পেলাম যে... মানে — সাত-আট বছর আগেও তুমি কল্পনা করতে পারোনি যে, চলন্ত গাড়িতে একটা লোক — তার হাতে একটা ফোন থাকবে, সে কথা বলতে-বলতে যাচ্ছে। অথচ তুমি ইলেকট্রনিক্স জেনে গেছ স্কুল লেভেলেই, কম্পিউটার জানছ, কিন্তু তুমি কল্পনা করোনি যে এটা ঘটে যাবে। আমি শুধু একটাই উদাহরণ দিলাম আজকে। এই যে পৃথিবী বদলে গেল — এবং আমাদের এখানেও যে বদলটা ঘটল, তাতে দশ বছরের আগের চেয়ে একটা আলাদা যুগ এসে পড়ল। তো, সেইখানটায় কবিতার এগোনোটাই তো সবচেয়ে দ্রুত — দ্রুতগামী। আজকের একজন তরুণ কবি যে কবিতা লিখবে সে তো আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় লিখবে না। যে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও সেভাবে পড়েনি, চারটে কবিতাও পড়েনি, সে-ও কিন্তু এমন একটা ভাষায় লিখবে যেটা রবীন্দ্রনাথের ভাষা নয়, সত্যেন দত্তর ভাষা নয়। আমি বলতে চাইছি যে রবীন্দ্রনাথ অত বড়ো কবি, কিন্তু আজকে একটা কিশোর কবি, সে কবিতা লিখলে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করবে না। এটা সে কোথা থেকে পাচ্ছে? এইটা সে এই বদলানোর হাওয়া-বাতাস থেকে পাচ্ছে। তাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি কিন্তু। তার চারপাশটা যে বদলে গেছে — এটা তো ফিল করছে। এটা ফিল করছে বলেই সে আর কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করছে না। এই যে এটা হল — এটা কবিতা নিজে করল। কবিতার এই যে এগিয়ে যাওয়া, এটা বাতাসের ভেতর মিশে থাকে। ফলে একজন যে কবিতা লিখবে — সে কবিতাটা খারাপ, আমি কিছুই বলছি না — কিন্তু ভাষার জায়গাটায় আজকের ল্যাঙ্গুয়েজটাতেই লেখার চেষ্টা করবে। তাই তো? কবিতাই সবচেয়ে অগ্রগামী। বিজ্ঞান যদি এগিয়ে যায় কবিতার তো আরও একটু এগিয়ে থাকাই উচিত। সেই যে ভাষাটা, সেই যে কবিতার উঠে আসাটা, আমার মনে হয়, তার সময়ের ধ্বনি চারিদিকে শুরু হয়ে গেছে। যে অনুসন্ধানী তরুণ কবিদের কথা আমি বললাম, আমি আশাবাদী, নিশ্চিত যে, সেই জায়গাটা থেকেই নতুন কবিতা উঠে আসবে। কিন্তু এখনও হয়তো পাঠক হিসেবে আমাদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

***জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর বেশ কিছু লেখায় নকশালপন্থী আন্দোলনের আবহাওয়া রয়ে গিয়েছে। 'তোপের গুমগুম শব্দ', 'কার্তুজ', 'দ্রোণাচার্য ঘোষ', 'বরানগরের তিনশো তরুণ'। আপনি কতটা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?**

২০১২ : এই আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সময় এবং তারুণ্য জড়িত ছিল। আমি ওই সময়ের একজন তরুণ, যেহেতু আমাদের গোটা সময় ও তারুণ্য জড়িত ছিল, আমিও তার ভেতরে ছিলাম। মানে, আমি তো তা থেকে আলাদা কিছু ছিলাম না।

২০০১ : মন-মানসিকতার দিক থেকে তো অবশ্যই আমরা, সেই সময়ের তরুণেরা, কোনো না কোনোভাবে সেই পন্থার স্বপ্নে সামিল ছিলাম। সেটা তো ছিলামই।

আজকের প্রেক্ষাপটে এ-ধরনের আন্দোলন কতটা প্রাসঙ্গিক?

২০১২ : এইভাবে না দেখে, আজ এটাকে এইভাবে দেখা উচিত যে, ভারতীয় সমাজ এবং ভারতীয় সমাজ-সংহতি হাজার-হাজার বছরের। বেদ-উপনিষদের সময় থেকে তার সূচনা। সেই যে সমাজ গঠন, সেই যে সূচনা, সেটা গণতান্ত্রিক সূত্রপাত। তাই তো? সেই গণতন্ত্র, আমাদের দেশে বয়ে-বয়ে কয়েক হাজার বছর ধরে আজকের জায়গায় পৌঁছেছে। এটা যেমন সত্য, এটা যেমন ঠিক, সেইটার পাশাপাশি রেবেল, সশস্ত্র উপায়ে সমাজ পরিবর্তন বা দেশ পরিবর্তনের যে প্রচেষ্টা, সেটাও হাজার-হাজার বছরের। বিদ্রোহ, সে-যুগে শাস্ত্রের উলটোদিকে দাঁড়ানো লোকজন — সে চার্বাক থেকে আমরা ধরতে পারি। তো, এই জায়গা থেকে আমাদের যে স্বাধীনতা আন্দোলন — গণতান্ত্রিক ধারায় যেভাবে আন্দোলন চলেছে, সশস্ত্র ধারাতেও সেই প্রচেষ্টা সেই যুগ থেকে শুরু হয়েছে। যেমন, সিপাহি বিদ্রোহ। তারপরে, বিভিন্ন রাজা-সমাজপতিদের ব্রিটিশবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তির লড়াই। এগুলো বয়ে-বয়ে এসছে। মানে, গণতান্ত্রিক ধারার বিভিন্ন আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধারায় সশস্ত্র মুক্তির যে প্রচেষ্টা, সেটা বয়ে-বয়ে এসছে। নকশালবাড়ির আন্দোলনও গণতান্ত্রিক ধারার আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র ধারায় মুক্তির প্রচেষ্টা। এ-বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজকেও চলছে। এই যে, ধরা যাক মাওইস্ট যাঁরা, তাঁরাও নকশালবাড়ি ধারার একটি বিস্তার। তাই তো? তো, সেটা ভুল-ঠিক, সেসব জায়গায় আমি যাচ্ছি না। কিন্তু, এটা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। এটা কোনো উটকো ব্যাপার না। যুগ-যুগ ধরে একটি সশস্ত্র ধারা, এত বিপুল গণতান্ত্রিক বিকাশ, তার পাশাপাশি রয়ে গেছে, সেটা ভারতের ইতিহাসে আছে।

কিন্তু, ষাটের দশকের যে মুভমেন্ট, সেটা মধ্যবিত্ত মানুষকে নাড়া দিয়েছিল। সেই সময়ের আমরা, আজকে বিচার করলে, আমরা নিম্নবিত্তদের থেকেও নীচে আছি। মধ্যবিত্ত আর সেই জায়গাটায় নেই। আমরা অবক্ষয়ী মধ্যবিত্ত হয়ে গেছি। ষাটের দশকে আমরা একটি কোণঠাসা জায়গায় পৌঁছেছিলাম। পৌঁছেছিলাম বলেই, আমাদের ভেতর থেকে বিদ্রোহ জেগেছিল। আজকে আমরা সেই জায়গাটায় নেই। কিন্তু, যাঁরা সেই জায়গাটায় আছেন — মুমূর্-

বাস্কে-হেমব্রমরা, তাঁরাই এই সশস্ত্র আন্দোলনের মূল শক্তি এখন। মানে, সেই যুগে এঁদের সাড়া পাওয়া যায়নি। মধ্যবিত্ত আলোকিত অংশ যে সশস্ত্র লড়াই কল্পনা করেছিলেন, তাতে এঁদের সেই যুগে জাগাতে চেয়েছিলেন, সেই যুগে এঁরা সাড়া দেননি। আজকে এই যুগে তাঁরা জেগেছেন। কিন্তু তাঁদের পিছনে আর কোনো মধ্যবিত্তের শুশ্রূষা নেই। তাঁদের পিছনে আর কোনো মধ্যবিত্তের তত্ত্ব নেই। তাঁদের পিছনে শিক্ষকের ভূমিকায় আর কেউ নেই। ফলে, সেই মুর্মু সেই বাস্কে সেই হেমব্রমরা লড়াই করছে, যা সেভাবে গণসমর্থনও পেয়ে যায়নি। মধ্যবিত্তের যে এরিনা, তার সমর্থন পেয়ে যায়নি।

আজকের যে মাওবাদী আন্দোলন, তা কোনো পথ খুলে দিচ্ছে কিনা, সেটা আরও পরে, আরও পরে বোঝা যাবে। কিন্তু এটা ঘটনাই — যে আদিবাসীরা, যে দলিত মানুষজন, যে অভুক্ত মানুষজন আজকের এই আন্দোলনে যুক্ত বা সমর্থক — তাঁরা সত্যিই নিগৃহীত, সত্যিই নিপীড়িত। তাঁদের কোন অধিকার, কোন অর্জন এই মুভমেন্টের ফলে সম্ভব হবে, সেটা পরে দেখার বিষয়। যদিও যেটা গোল বা এই আন্দোলনের যেটুকু তত্ত্বের অংশ — ভারতব্যাপী বিপ্লব সংগঠিত করা — সেটা একটি দুরাশা, একটি আকাশকুসুম। যেকোনো আন্দোলনেই একটা আলটিমেট থাকে, সে-আলটিমেট না পেলেও, সেই আন্দোলন কিছু-কিছু জিনিস অর্জন করে। কেউ না দিলেও। বস্তুগত জায়গা থেকে সরকার, প্রশাসন — এরা কেউ না দিলেও, সময় যেকোনো আন্দোলনকে অনেক কিছু দিয়ে থাকে। সময় দেয়। এইটা হয়তো অর্জিত হবে। একটা তো ঘটনা সত্যিই, সেটা এখনই ঘটতে শুরু করেছে — দশ-পনেরো-কুড়ি বছর আগে এইসব অঞ্চলে চড়ুইভাতিতে গিয়ে বাবুসম্প্রদায় এদের 'তুই-তুই' করে কথা বলত, এদের দিয়ে জল বওয়াত, এদের দিয়ে গাছ থেকে ফল পাড়িয়ে আনত — সেই বাবুসমাজ, আমার মনে হয়, আর এটা করতে পারবে না। এই যে অধিকার অর্জন, সেগুলো তো এই মুভমেন্টগুলোর ভেতর থেকে অর্জিত হচ্ছে ধীরে-ধীরে।

২০০১ : এটা তো একদম রাজনৈতিক বিষয়। আজকে পৃথিবীর যেভাবে যেদিকে গতি, তার যে ধরন, কখনো-কখনো নানাভাবেই মানুষের পক্ষে সংকটের। বা মানুষের বিরুদ্ধেও যে ব্যবস্থাপনাটা, তার থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছা। ফলে প্রতিরোধের যে বাসনা, সেটা মানুষের জাগবে কোনো না কোনোভাবে। কখনো একটা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা, ট্র্যাজেডি চলে আসে আর কি।

সত্তরে সার্বিক আন্দোলনের এক উপযুক্ত পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তা সফল হল না কেন?

২০১২ : আমি তো রাজনৈতিক জায়গা থেকে বলতে পারব না। কিন্তু, সেই সময়ের যে পার্টিসিপেশনটা, সেটা তখনকার তারুণ্যকে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু, তরুণরা হল সমাজের একটি অংশ, সমাজের সবটুকু না।

সেদিনের নকশালপন্থী আন্দোলন, একদিক দিয়ে ভাবলে, সে তো সফল নয়। তার যে গোল, সেটা অর্জন করতে পারেনি। ভেঙে-চুরে মার খেয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে সফল! সফল, আমি খুব সংক্ষেপে বলি, সে এই সমাজকে, এই বাঙালি সমাজকে, বাঙালি বুদ্ধিজৈবিক মনকে উত্তরআধুনিক করে দিয়েছে।

দু-নম্বর পয়েন্ট হল, নকশালপন্থী আন্দোলনের কারণে মেয়েরা হুড়হুড় করে এগিয়ে আসতে পেরেছে। এই যে নিঃশব্দে নীরবে নারীরা সমাজে একটি বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন, নকশালপন্থী আন্দোলনের থেকেই সেই অন্তর্নিহিত মৌলিক সাহসটা পেয়েছেন। আর কৃষির ক্ষেত্রে, চাষের ক্ষেত্রে, এই যে ভূমি সংস্কার এবং আরও যা-কিছু হয়েছে, তা নকশালপন্থী আন্দোলনের ধাক্কায় হয়েছে। নকশালপন্থী আন্দোলন বাঙালি সমাজ ও মনকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে।

২০০১ : সেটা সফল হল না। তার মানে ব্যর্থ হয়েছে আমি একথা বলব না। কিন্তু লক্ষ্য পূরণ হয়নি বা স্বপ্ন সফল হয়নি। তুমি দেখো যে, সাতষট্টি-আটষট্টি সালগুলোতে এটা হল, ওইরকম ঘটনা ঘটতে শুরু করল। আমাদের বাঙালি জনজাতিতে ওই বছরগুলো থেকেই, স্বাধীনতার পরে যে প্রজন্ম, সে কিশোর থেকে তরুণ হয়ে উঠল। তারা এই স্বপ্নটার ভেতর জড়াল। চাষির ছেলেরা কলেজে পড়তে এল, সেটা কিন্তু ওই সময়েই। সমগ্র ষাটের দশক ধরে, আমরা যারা তথাকথিতভাবে উচ্চবর্ণীয়, এখনও, তুমি পাও চারিদিকে চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, গুপ্ত, ঘোষ, বোস, দাশগুপ্ত — এই তো; এই ব্যবস্থাটায় ভাঙন ধরতে শুরু করল। ষাটের দশকেই তারকেশ্বর থেকে বহু ছেলে উত্তরপাড়া কলেজে পড়তে এল, যাদের সংযোগ কৃষি জীবনের সঙ্গে। এতে কী হল? তোমার সঙ্গেএকটি কৃষকসন্তানের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। যেটা কিন্তু আগে কোনোদিন ছিল না। তো, এই অবস্থা থেকে আলোকিত 'মাস' বলতে যাদের বোঝায়, ছাত্ররা, ছাত্রদের কোনো-কোনো মাস্টারমশাইরা, এই উপরিতলের মানুষজন, অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়া বলতে যা বোঝায় আর কি — তারা প্রলেতারিয়েত মাস-কে বোঝাল যে, আমাদের কী করা উচিত। আজকে প্রলেতারিয়েত মাস আছে। কিন্তু পেটি বুর্জোয়ারা সম্পর্ক স্থাপন করতে যাবে না তার সঙ্গে। সে তার নিরাপত্তার ঘেরাটোপটা বুঝে নিয়েছে।

কবিতায় ফিরে আসি। *জলপাইকাঠের এসরাজ* থেকে *এভাবে কাঁদে না*, বা পরবর্তী কবিতায় শব্দের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। কবিতায় সংকেতময়তা বাড়ছে। এই পরিবর্তন কীভাবে ঘটল?

২০১২ : আমি একদম অক্ষরে-অক্ষরে বিশ্বাস করি — সময় — সময় আমাকে অনেক কিছু দিয়ে গেছে। শুধু আমাকে নয়, আমাদের দিয়ে গেছে বলেও আমি মনে করতে পারি। কিন্তু আমার সঙ্গীদের এ-বিষয়ে কী মত, তা তো আমি জানি না। তাই আমি বলছি, সময় আমাকে অনেক কিছু দিয়ে গেছে। *জলপাইকাঠের এসরাজ* লেখার যে সময়, সেই সময়ের যে নাচানাচি, তার উচ্ছ্বাস *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এ আছে। কিন্তু এরপরে যে সময়টা এল, আমার মনে হয়েছে, একেবারেই ধাক্কা-খাওয়া মানুষের হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সময়। ওই সময়টায় আমি নানাভাবে পীড়িত বোধ করেছি, অনুশোচনাও হয়েছে আমার। সেই জায়গা থেকেই তো *এভাবে কাঁদে না*। আমার ভেতর একটা সংযম এল। আমার উচ্ছ্বাস স্তিমিত হল। ওইখান থেকেই আমি, মনে হল যেন, আরেকটা জগতে গিয়ে পৌঁছোলাম। এই মনে হওয়া থেকে *রান্নাঘর*, *আরও রান্নাঘর*-এর কবিতা।

বাকসংযম, অল্প কথা বলার স্বভাবও এসে গেল আমার। আমি যত হইচই করতাম, যত নাচানাচি করতাম, সেটা থেকে যেন সরে এলাম। পরবর্তীকালেও টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আমি অতরকম করে কিছু ভাবিনি, বা আদৌ আমি ভাবিনি। গোটাটাই সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। সময় আমাকে নিয়ে যা-কিছু করেছে, করছে।

২০০১ : দেখো, তুমি ওই রাজনীতির জায়গাগুলো ছেড়ে দাও। এবার, ওই যে সময়টা, মানে আমরা যে সময়ে কিশোর থেকে সদ্য তরুণ হয়েছি, তখন বাইরে যেমন অনেক টেনশন, হিংসা, অনেক বোমা পড়ছে, হইহই হচ্ছে, সেটার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের উচ্ছ্বাসও — মানে, সমাজ ভাঙছে তো! আমরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হইহই করছি। এই যে মানসিক মুক্তি এসে গেছে। আমরা যখন কলেজে পড়ি, একাত্তর-চুয়াত্তর সালে, আমরা ট্রেনে করে দল বেঁধে রানাঘাট চলে যাচ্ছি। আমরা ট্রেনে করে বাঁকুড়া চলে যাচ্ছি। আমরা, 'পিয়ালী' রেল স্টেশনটার নাম ভাল, আমরা সেই স্টেশনটায় নেমে দেখছি — চরের মাটিতে লাল পতাকা পোঁতা। এই যে উচ্ছ্বাস, এই উচ্ছ্বাসটা কিন্তু...। কলেজ-টলেজ পাশ করলাম, তারপর যে সময়টা শুরু হল — স্তব্ধতার সময়। আচ্ছন্ন করে রাখা,

থেমে থাকা এবং সমাজ তখন ধীরে-ধীরে কোটরে ঢুকে যাচ্ছে। সেইটা তো আর *আগামী* লেখার সময় নয়। ক্রমে আমার যেটা মনে হল, এটা আমার ব্যক্তিগত মত — সেটা যে ঠিক বা ভুল, সেটা যাই হোক — যে, বর্ণনা বা কাহিনি এইটা কবিতার কাজ নয়। মনে হল, কবিতা সংযমের শিল্প। আমার মনে হতে লাগল, আমাদের এই যে পূর্ব অঞ্চল, বনে-বাদাড়ে, মাঠে, নদী-নালায়, তার রং নীল-সবুজ এবং আশ্চর্য এখানকার প্রকৃতি। এই যে তুমি, ধরো, এই বাড়িটায় বসে আছ। দেখো, দেওয়ালে যে শ্যাওলা, সে চাইছে সব জায়গায় তার হাত বাড়িয়ে দিতে। আমার মনে হতে লাগল, এ দেশ হচ্ছে, আমার এই বাংলা, এ কুহকের দেশ। এখানকার যে লোকজন সে যখন মনের কথাটা বলে তীব্র কোনো কামনায়, আকাঙ্ক্ষায়, আশায়, রাস্তাঘাটে, পারিবারিক জায়গায় — সে যখন মনের কথাটা বলে সেটা হেঁয়ালিতে বলে। আমার মনে হল, কবিতা এই সংকেতের। আমি এই রাস্তাটা ধরার চেষ্টা করতে থাকলাম। হয়তো এই কারণেই আমার পরের বইগুলো এইধরনের হল। ঠিক যে বিশেষ কিছু হয়েছে, তা বলছি না। কিন্তু আমি সেখানে সংযম প্র্যাকটিস করেছি, সংকেত জাগাতে চেয়েছি এবং আমি কিছু না কিছুভাবে সেই কুহকের ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করে গেছি।

এতে কি আপনি তৃপ্ত?

২০১২ : কবিতা লেখা একটা অনিশ্চিতের সাধনা। এর কোনো সাফল্য থাকে না। এতে কোনো তৃপ্তি থাকে না। আনন্দ থাকে, কিন্তু তৃপ্ত হওয়া ব্যাপারটা থাকে না। কবিতার ভেতর থাকা জীবনব্যাপী এক আনন্দ সফর। এর কোনো তৃপ্তি নেই, সাফল্য নেই, প্রাপ্তি নেই। মানে, অনেক কিছুই আছে শিল্পের, যেটা করে শিল্পী সাফল্য বোধ করেন। যেমন, একজন কাঠের মিস্ত্রি খুব সুন্দরভাবে একটি পালঙ্ক গড়ে তৃপ্ত হতে পারেন। বা একজন ফুটবল-শিল্পী, যেমন রোনাল্ডিনহো কি বেকহ্যাম, এঁরা একটি গোল দিয়ে তৃপ্তি পেতে পারেন। কিন্তু কবিতায় এইরকম কোনো তৃপ্তি নেই। কবিতায় এইরকম কোনো সাফল্য নেই।

এই সূত্রে আমি মনে করি, কবিতা নির্মাণের বস্তুও নয়। কবিতা নির্মিত বস্তু নয়। ফলে, এটা নিখুঁতভাবে আমি তৈরি করলাম, এই বোধ কবিতায় কখনো জাগে না। এমন একটা কর্মে আমরা জড়িত, যেটার কোনো তল নেই। সেই অতলের কোনো তল নেই। সেই উর্ধ্বের উপরে আরও আকাশ আছে।

২০০১ : তৃপ্ত বলতে পারি না; কিন্তু এটা তো হয় না যে, আমি আর সবকিছুই করেছি, মাঝে-মাঝে আমি এই সংকেতের চেষ্টা করেছি, এই কুহকের চেষ্টা করেছি, তা তো না। মানে, আমার জীবনযাপনে এইটা জড়িয়ে পড়েছে কোনো না কোনোভাবে। তার ভেতরেই আমি কাজকর্ম করি। কিন্তু তৃপ্ত যে জায়গায়, সেটা হচ্ছে, আমি এই যে জীবনযাপন করি, এটা আমার মতো করে, আমার ধরনে — একধরনের কবিতা-জীবনযাপন। এটায় আমি সুখী। আমার লেখালিখির যে জায়গা, সে জায়গা থেকে আমার কোনো তৃপ্তি নেই।

আমি মনে করি, কবির কোনো সাফল্য নেই। সাফল্য হতে পারে না। সফলতা কাকে বলে? আমি যা লেখা লিখছি, তাই দিয়ে কি আমি তৃপ্ত? আমার মনে হয় না যে তৃপ্ত হওয়া যায়। এটা নিশ্চিত যে, একটা লোক কবিতা লেখে — সেটা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু সত্যি বলতে কী, এটা একটা অভিশাপ। আনন্দের অভিশাপগ্রস্থ একটা মানুষ। সে আর কিছুই করতে পারে না। পৃথিবীর যেকোনো কাজ — একজন ফুটবলার, তার সাফল্য আছে একটা গোল দেওয়া বা একটা গোল বাঁচানোয়। কিন্তু একশো বছর ধরে কবিতা লিখে গিয়েও কোনো সাফল্য হয় না। এই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহলভরে'। এটা ভয়ে-ভয়ে বলা, যে আজ থেকে একশো বছর বাদে তুমি কে আমার কবিতাটি পড়ছ? মানে, আদৌ কেউ পড়বে কি? তুমি পড়বে কি? এটা কাতরোক্তি। এটা কোনো বিরাট আত্মবিশ্বাস না।

সারাজীবন দিয়ে লেখালিখি করলে প্রাপ্তি হচ্ছে ওই কাতরতা। আশা-নিরাশার একটা প্রাপ্তি। আমি থাকব কি থাকব না? এই বইটা পড়া হবে কি হবে না? এই আলো-ছায়ার দ্বন্দ্ব, এই আশা-নিরাশার দোলাচল — এটাই সারাজীবনের প্রাপ্তি। এর কোনো ফলিত রূপ ইহজীবনে দেখা যায় না। এটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস।

কিন্তু আরেকজনের ক্ষেত্রে তো এটা হতেই পারে যে, একজন কবিতা পড়বে রাস্তায় — হাজার-হাজার লোক জমে যাবে। সেটাও তো সফলতা হতে পারে।

এই সাফল্য বা ব্যর্থতার হিসেব-নিকেশ যদি সরিয়ে রাখি, তবে আপনার কাছে আপনার লেখার 'আনন্দের মাপকাঠি' কী?

২০১২ : এই লিখতে পারাটাই। এবং কখনো-কখনো আমার মনে হয়, এই কবিতাগুলি এই কাব্যগ্রন্থগুলি... এরা আমার সন্তান। আমারই সব ছেলেমেয়ের দল। এটা মনে হয়। সেটা আনন্দের।

আর, একটা লেখা যখন শেষ করি, হয়তো রাত্তির দেড়টা কি দুটো, তখন খুব চমৎকার লাগে, খুব সুন্দর লাগে, খুব ভালো লাগে। আবার, সকালে উঠে কবিতাটা পড়ে মনে হয়, এটা বোধহয় তেমন কিছু হল না।

২০০১ : একটা লেখা লেখার পর যদি মনে হয় যে, এই লেখাটা ছাপানো যায় বা লেখাটা দিয়ে দেব এবং কিছুক্ষণ তার একটা আনন্দ হয়। কিন্তু এটা ক্ষণিকের আনন্দ। আবার অনেকগুলো ক্ষণিকের আনন্দ এক হলে অনেকক্ষণের আনন্দ। আবার ধরো, কখনো নির্জনে যেতে-যেতে আমার সঙ্গে হয়তো আমারই বইটা আছে — তার একটা-দুটো কবিতা পড়লাম — তার একটা পুলক — এই আনন্দ। আবার কখনো পরিবর্তনের ইচ্ছা থেকে একধরনের অসহায় বোধও জাগে। সবসময়ই এই দোলাচল, দ্বন্দ্ব...।

আপনার কবিতায় 'রান্নাঘর', 'পাচক', 'উনুন', 'পঙ্‌ক্তিভোজ'... এই শব্দগুলি ঘুরে-ফিরে এসেছে। এই সংকেতসমূহের ব্যবহার কী ভেবে?

২০১২ : এটা হয়েছিল কী, সাংবাদিকতার কাজে আমি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। হাবড়ার একটা গ্রামে। আমার ফিরতে-ফিরতে অনেক রাত্রি হল। রাতের ট্রেন ধরে শিয়ালদা পৌঁছলাম। শিয়ালদা থেকে হাওড়ায় যাওয়ার কোনো বাস-টাস পাচ্ছি না। সেই সময় শিয়ালদা চত্বরে আমি ঘোরাফেরা করছি, এমন সময় দেখলাম, ফুটপাথে তিনটি ইট পেতে একটি ফুটপাথ-পরিবার রান্নাবান্না করছে। সেই মাঝরাত্তিরে। তো, সেইটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল — এই যে তিনটি ইট, তাতে আগুন জ্বেলে একটি পরিবার রান্না করছে — ফুটপাথের এই জায়গাটা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম ইউনিট। ক্রমে আমার মনে হতে লাগল, গোটা পৃথিবীই আসলে একটি রান্নাঘর।

এইটা নিয়েই আমি হাওড়া স্টেশন পৌঁছে গেলাম। আমার এখন মনে নেই, লাস্টট্রেনে ফিরেছিলাম না ফার্স্টট্রেনে। কিন্তু আমি বাড়ি ফিরে, টেবিল-লাইট জ্বালিয়ে, ভোরবেলা, একটি কবিতা লিখলাম। সেটি *রান্নাঘর*-এর প্রথম কবিতা। এইটা দিয়ে *রান্নাঘর* শুরু হল। এবং *রান্নাঘর* শুরুর কিছুকাল আগে আমার বিয়ে হয়েছিল। এবং ধীরে-ধীরে আমার মনে হল, যৌনতাও আসলে একটি রান্নাঘর। আমি তখন সবকিছুতে রান্নার বিষয় ভাবতে লাগলাম। এই ভাবনাটিতে আমি অনেকগুলো বছর থেকে গেলাম।

তবে, এখন আমি এই ভাবনাটা থেকে সরে এসেছি। কবিতার এই ভাবনা তো কোনো আঁকড়ে-ধরে বসে থাকার ইজ্‌ম নয়। তার বদল ঘটেছে। আমি কিছুটা রূপে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। রূপ-অরূপে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো রয়েছে নানারকম রূপ। তার ভেতরেই অলৌকিকতা রয়েছে, তার ভেতরেই কুহক রয়েছে।

২০০১ : এইটা আমার কাছে একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়ে শুরু হয়। আমি খুব একটা যে ভেবেছিলাম, তা নয়। আসলে যেটা আমার মনে হয় আমার সেই কিশোর

বয়সে বা এখনও বড়ো হয়ে... আমাদের এই বাড়িটা আমাদের এই যে সংসারটা, এটার কেন্দ্র হচ্ছে, ঠিক যেখানে থেকে চা এল — ওই রান্নাঘরটা। আমি একবার এক শীতের রাতে হাবড়া গেছিলাম, সেখান থেকে ফিরতে-ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। শিয়ালদায় যখন নামলাম, তখন দেখলাম যে পথে যারা থাকে, তারা তিনটি ইটে উনোন তৈরি করে তাতে রান্নাবান্নার আয়োজন করছে। আমি দেখলাম, সেই আলোয় গোল হয়ে বসে আছে ফুটপাথবাসীরা। আমার মনে হল যে, আর কিছুর দরকার নেই, শুধু ওই উনোনটা এবং সেই ঘিরে বসা পরিবারের লোকজন — এটাই একটা ইউনিট। এইটা মহাপৃথিবীরই ইউনিট — মানে, গোটা পৃথিবীতে ধরো, একটাই রান্নাঘর আছে। সব মানুষ সেখানে গিয়ে সেখান থেকে আহার সংগ্রহ করে নিচ্ছে। মানে, পৃথিবীর একটা ছোট্ট ইউনিট হচ্ছে ওই শিয়ালদার ফুটপাথ। এইখান থেকেই আমার এই ব্যাপারটা শুরু হয়। এবং আমি সেই রাতেই একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করি। *রান্নাঘর* নাম দিই কবিতাটার। এরপর আমি ওই নামে আরও পনেরো বছর ধরে এই সিরিজে লেখবার চেষ্টা করে গেছি। ক্রমে এমন হয়েছে যে, এমনি একটা কবিতা — সেটারও আমি নাম দিয়ে দিয়েছি *রান্নাঘর* এবং আমি যেন সংযোগ খুঁজে পেয়েছি সেই কবিতার ভেতর।

কবিতাকে আরও সংকেতময় করা, আরও সংক্ষিপ্ত, আঁটোসাটো করার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে?

২০১২ : আমি তো আগেই বললাম, যা-কিছু আমি করেছি, আমার মনে হয়, সময় আমাকে দিয়ে এসব করিয়েছে। আমি নিজে-নিজে কিছু করিনি। ফলে, এ নিয়েও আমি কিছু বলতে পারব না।

> **২০০১ :** এগুলো তো একদম টেকনিক্যাল কথাবার্তা। সেইখানটায় আমার নানারকম ভাবনা — মানে, ভাবনা না বলে সেটাকে মতলব বলাই ঠিক হবে — সেটা আছে। আমার এরকম মনে হয় যে, কোনো বাক্য নয়, হয়তো কোনো ভাষাও নয়, ধ্বনি। এই যে আমরা কথা বলছি, আর ওই যে ওটা ঝোলানো রয়েছে (দেওয়ালে ঝোলানো একটি সুদৃশ্য বায়ু-ঘণ্টার দিকে নির্দেশ করে), টুং-টাং করে বাজছে, দেখো ওটা কোনো ভাষা নয়, তাই না? অথচ, ওইটার সঙ্গেও তোমার-আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। তাহলে ভাষা কোনটা? ভাষা হচ্ছে, তোমার-আমার সম্পর্ক স্থাপনের একটা মাধ্যম। ধরো শব্দ, ধ্বনি — এসব থেকেও তো এগুলো জাগে। আমি বলিনি যে, আমি কোনো রাস্তা পেয়ে গেছি বা এইধরনের কিছু। কিন্তু, আমি সেই কুহকের রাস্তায় যেতে চাইছি। যাতে আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেটা বললে, আরও ঘন, আরও সংযমী আমি হব কি না..., আমি তা জানি না। তার কারণ হচ্ছে, এই যে সময়, আমার মনে হচ্ছে মানুষ নিজেরটুকু নিয়ে আছে, একটু ঘেরাটোপের ভেতর, নিরাপত্তার ভেতর। আবার এটাও তো হতে পারে, এমন কিছু-কিছু সময়ের অভিঘাত ঘটে গেল, চারপাশের মানুষ হইহই করে প্রগলভ হয়ে গেল, অনেক কথা বলাবলি হতে লাগল, উল্লসিত সময় চলে এল একটা — কবিরাও তাঁদের নির্ঝরিণী বইয়ে দিচ্ছেন, আমি তাঁদের মাঝখানে পড়ে গেছি, তখন আমি কী করব — আমি কি জানি?

'আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি' কিংবা 'দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলনের এই ঠান্ডা দেশে / আমাকে বিস্ময়সূচক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হোক'। অদ্ভুত একটা কনফিডেন্স আপনার লেখায় পাওয়া যায় — পাঠকও পড়ে যেন ভেতরে-ভেতরে একটা আত্মশক্তি পায়। এই জোরটা এল কীভাবে?

২০১২ : এগুলো তো প্রায় আমার বাল্যকালের লেখা। ওই যে সময়, ওই যে সময়ের নাচানাচি, এসব আমাকে সাহস জুগিয়েছিল। ওইরকম সাহসের সময় আর আছে কিনা আমি জানি না। এখন যা আছে, তা অনেক সংশয়ের, অনেক বিবেচনার, অনেক ভাবনার। কিন্তু ওই তৎকালে আমার সেইসব বোধ ছিল না। আমি অনেকটাই খোলামেলা এবং সাহসী ছিলাম। সেই জায়গাটায়, পাঠক যদি আমার কবিতা থেকে নিজের প্রতি আস্থা বা আত্মশক্তি থাকার বোধ অর্জন করে থাকেন, আমি খুশি হব। ধন্য বোধ করব। কিন্তু এর বেশি কিছু বলাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

> **২০০১ :** সেই সময়টায় শুধু আমি পেলাম কীভাবে, ব্যাপারটা নয়। সেটা তো ওই সময়ের আরও যত কাব্যগ্রন্থ আছে, আমাদের সময়ের যে বন্ধুরা বা আমাদের অগ্রজ যাঁরা আছেন, তাঁদের ভেতর তো এটা প্রবলভাবেই আছে। কারণ, সময়ই সেই আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল।

আপনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন?

২০১২ : পৃথিবীর যে-সমস্ত বড়ো-বড়ো সমাজতন্ত্র, এসব তো ভেঙে পড়ল। এই যে এত বড়ো চিন, তার যে সমাজতন্ত্র, আমরা যারা সাংবাদিক, তারা অহরহ খবরের জায়গা থেকে দেখি, চিনে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই একটি করে খনি-দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। তাতে সাতজন-দশজন মারা যায়। প্রায় নিয়মিত। চিন কীরকম হাল্লারাজার দেশ, সেখানে যে-সমস্ত খনি অ্যাবানডানড, যে-সমস্ত খনি দুরূহ, যেখান থেকে উত্তোলন করা উচিত নয়, সেইসব খনিতেও ওরা সম্পদ আহরণের জন্য লোক নামিয়ে দেয়। ফলে এটাও খুব সংশয়ের বিষয় যে, পৃথিবীতে সত্যিকারের সমাজতন্ত্র সম্ভব কিনা। এটা কোনো বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, এটা বিবেচনার বিষয় — সমাজতন্ত্র যদি স্থাপিতও হয়, তাহলেও কি সেটা ভালো? ওই *সুচেতনা* কবিতাটির মতো — 'এই পথে আলো জ্বেলে — এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে; / সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'।

> **২০০১ :** আমি সর্বহারার একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাস করি।

সর্বহারার একনায়কতন্ত্র কি সম্ভব?

২০১২ : সেটা বিরাট অভিযানে কখনো হতে পারে। সে-বিরাট অভিযান এ-যুগে জাগবে কিনা, যেটা পঞ্চাশ-একশো বছর আগের পৃথিবীতে সম্ভব ছিল, সেটা ভবিষ্যতে সম্ভব হবে কিনা, সেটাও ভাবনা-কল্পনা-আশা এসবের বিষয়।

আর, যে স্বপ্নটা আমার ব্যক্তিগতভাবে কিশোর বয়সে ছিল, সেই স্বপ্নটা আমি কবিতায় ঘুরিয়ে দিয়েছি। আমার যা-কিছু স্বপ্ন, তা কবিতাকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। ফলে রাজনীতিতে যা সম্ভব হয়নি, কবিতায় যে তা সম্ভব — সেই আশাটা নিয়েই তো উজ্জীবিত হয়ে আছি। মানে, রাজনীতিতে সম্ভব হয়নি, কিন্তু কবিতায় তা সম্ভব।

২০০১ : তা আমি জানি না। আমি তো রাজনীতির পণ্ডিত নই।

একটু অন্যদিকে যাচ্ছি। আমরা দেখেছি যে আপনার গদ্যের হাতও চমৎকার; অথচ আপনি সচেতনভাবেই অল্প কিছু প্রয়াসের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কেন?

২০১২ : গদ্য মানে, আমি নানা সময় নানারকম লেখা লিখে ফেলেছি। বেশিরভাগই কবিতাকেন্দ্রিক এবং বেড়ানোর বিভিন্ন লেখা। সেগুলো যে খুব ধরে-বেঁধে লিখেছি বা প্রচুর ভেবে-চিন্তে লিখেছি, সেরকম নয়। সেই টুকরো-টাকরা লেখা দিয়ে আমার একটা বই *কবিতা সহায়* বেরিয়েছিল। তারপরেও আরও কিছু লেখা থেকে *সাত পাঁচ* বলে একটা বই বেরিয়েছে। এছাড়া আমি পাঁচ-সাতটা গল্প লিখেছি। এবার ঘটনাটা হচ্ছে, কবিতা লেখার চেষ্টায় আমি যে মনটা দিয়ে থাকি, বা যেভাবে আমি বসি, বা যেভাবে আমি ভাবি — এই লেখাগুলোর ক্ষেত্রে আমি সেই মন দিইনি। মানে, ব্যাপারটা কীরকম জান, কেউ আমার কাছে একটা কবিতা চাইল, তাকে আমি দিনের পর দিন ঘোরালাম। আমি নিজে জানি না, তাকে দিতে পারব কিনা। কিন্তু কেউ আমার কাছে গল্প চাইল, আমাকে একমাস সময় দিল, আমি গল্পটা জানি নিশ্চিত তাকে দিয়ে দিতে পারব। কিন্তু একমাসে আমি কবিতাটা দিতে পারব কিনা জানি না। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে যে মনটা আমি দিয়েছি, সেইটা আমি অন্য কিছুতে দিইনি। একটু ক্যাজুয়ালিই লিখেছি। তো, আমি ভেবেছি, যদি আমার আটটা গল্প হয়, তাহলে আমি একটা বই বার করব।

আর হল ছোটোদের জন্য লেখা। পূর্ণেন্দু পত্রী যখন *সকাল* কাগজটা করতেন *আজকাল* থেকে, উনি আমাকে বললেন — তুমি তো ছড়া লেখ, তুমি ছড়া দিয়ে দু-একটা গল্প লিখে দাও না আমাকে। আমি ছড়া দিয়ে-দিয়ে একটা গল্প লিখলাম। সেই লেখাটা পড়ে অনেক চিঠি-টিঠি এল। এবং পূর্ণেন্দু পত্রী আমাকে বললেন — তুমি এই গল্পটা চালিয়ে যাও। আমি তার দ্বিতীয় পর্বও *সকাল* কাগজের শারদ সংখ্যায় লিখলাম। তৃতীয়-চতুর্থ পর্বও লিখে গেলাম। এরকম করতে-করতে *সকাল* যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমি সরল দে-র *টগবগ* পত্রিকায় একেকটি পর্ব লিখতে লাগলাম। সেরকম সাত-আটটি পর্ব ছাপা হয়েছে। সেটা জুড়ে দিলে একটা উপন্যাস হয়ে যাবে, যদি আমি লাস্ট পার্টটা লিখে ফেলি।

গল্পটা একটা লোককে নিয়ে। অনেকগুলো ক্যারেক্টার, তাদের নামে-নামে ছড়া। আসলে, তখন আমি এই বাড়িটা তৈরি করছিলাম। এই বাড়িটা যেভাবে তৈরি হয়েছে, সেটা বড়ো অভিনব। আমার বিভিন্ন বন্ধুরা নানাভাবে উদ্যোগ নিয়ে এই বাড়িটা করে দিয়েছিলেন। মানে, আমি বস্তার পর বস্তা সিমেন্ট পেয়েছি, ইট পেয়েছি অল্প কিছু টাকা দিয়ে। পরে সেসব ধার মিটিয়েছি। আমি তো অফিস করতাম, কাজ-টাজ দেখতে পারতাম না, এই বন্ধুবান্ধবরা দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রিদের দিয়ে কাজ করাতেন। নানাভাবে উদ্যোগী হতেন। এইসব করতে-করতে প্রায় আঠেরো বছর ধরে বাড়িটা তৈরি হয়েছে, একটু-একটু করে।

টাকা আয় করার জন্য, আমি একেবারে গোড়ায় পরিকল্পনা নিয়েছিলাম — এই অঞ্চলে যত স্কুল আছে, সেইসব স্কুলে বাচ্চারা যখন টিফিনে বেরোবে বা ছুটির পর, তাদের নামে-নামে ছড়া লিখে দিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে একটাকা করে নেব। এরকম করে আমাকে একলাখ টাকা সংগ্রহ করতে হবে। সেই প্রয়াসে আমি যখন নেমে পড়ি, এবং আমার যখন তিন-চারশো টাকা হয়ে যায়, সেই সময় মানবাধিকার আন্দোলনের এক নেতা কিরীটি রায়, সে এসে দাঁড়ায়। সেটা বিরানব্বই-তিরানব্বই সাল হবে। সে আমায় বলে — তুমি এইভাবে নেমে পড়েছ! তুমি একটা কাজ করো না, আমরা তোমাকে দশ-বারোজন কিছু-করে টাকা দিই, তাহলে তোমার একলাখ টাকা হয়ে যাবে। তো, আমি তাকে বলতে গেলে, সে বলল — তুমি যেদিন পারবে শোধ দিও, যত বছর পরে পারো...। তখন ওরা এভাবে টাকা দিতে লাগল। আমি তাদের নামে-নামে ছড়া লিখে দিলাম। 'কিরীটি রায় / বিড়িটি খায় / পুজোর ছুটিতে / গিরিডি যায়'। এরকম সব ছড়া লিখে দিলাম, এবং সেটাই হচ্ছে, আমি যে টাকা নিয়েছি তার হ্যান্ডনোট। সে-টাকা সব আমি এই আঠেরো বছরে ফেরতও দিয়ে দিতে পেরেছি। এইভাবে আমার বাড়িটা তৈরি হল। সেই যে তৈরি হল, তার বিবরণ দিয়ে আমি ওই ছোটোদের ধারাবাহিকটা লিখে ফেলি। এখন লাস্টপর্বটা লিখলেই সেটা একটা ছোটোদের উপন্যাস হয়ে যাবে।

২০০১: না, আমি যেটা বলতে চাইছি তা হল, আমি কবিতা লেখারই চেষ্টা করে গেছি। গদ্য আমি লিখেছি, সেটা আমার কখনো-কখনো লিখতে ইচ্ছে হয়েছে বলে। কিন্তু কবিতা লেখার প্রয়াসের সঙ্গে তা তুলনীয় নয়। মানে, আমার গদ্য লেখার চেষ্টাটা অতদূর পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। মাঝে একবার ওই সাতাত্তর-আটাত্তর সালে আমার হঠাৎই দু-একটা গল্প লিখতে ইচ্ছে হয়। আমি লিখেছিলাম। আর এই হালে আমার আবার দু-একটা গল্প লিখতে ইচ্ছে হল, আমি লিখেছি। কিন্তু সেটা খুব বড়ো বা ধারাবাহিক প্রয়াস, এমন নয়।

বলা যায়, আপনি বড়ো পত্রিকা, বড়ো-সড়ো বাণিজ্যিক প্রকাশনায় কখনো লেখেননি। কেন?

২০১২ : 'কখনো লিখিনি' কথাটা ঠিক নয়। আমি যখন লেখালিখি শুরু করি, তার আগে হাংরি জেনারেশনের লেখক-কবিরা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। একেবারে কিশোর বয়সে, যখন আমি এইট-নাইনে পড়ি, তখন তুষার রায় শ্রীরামপুর শহরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে আসতেন। সেই সূত্রে আমাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সেই বয়সে সেই সময়, তুষার রায়ের কাছ থেকে আমরা হাংরি জেনারেশন এবং তৎকালের নকশালপন্থী আন্দোলন এসব বিষয়ে বহু বিচিত্র গল্প শুনি, বহু কাহিনি শুনতে পাই। ওই সময়ের কিছু পরে, হাংরি জেনারেশনের অত্যন্ত বড়োমাপের লেখক সুবিমল বসাকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, প্রতিষ্ঠানকে সার্ভ না-করার তত্ত্ব এবং তার যে কর্মসূচি লেখক-কবিদের — সেগুলোতে আমি আকৃষ্ট হই। ওই সময়, ওই একাত্তর-বাহাত্তর সালে, জয় গোস্বামীর সঙ্গে রানাঘাট শহরে আমার আলাপ হয়। আমি-জয় দু-জনেই সেইদিন দেবদাস আচার্যর কাছে যাই। কৃষ্ণনগরের দেবদাস আচার্য আমাদের অগ্রজ। তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় একসময় বলেন — আমরা আর প্রতিষ্ঠানে লেখক সরবরাহ করব না। আমি খুবই আকৃষ্ট হই। আমার তখন যে মনোভাব ছিল, আমার কাছে যে লেখা চাইবে, তাকে লেখা দেব। কিন্তু আমার কাছে লেখা চায়নি, আমি নিজে গিয়ে তাকে লেখা দেব — এটা আমি কখনো করিনি। কখনো করিনি। আশির দশকের গোড়ার দিকে *দেশ* পত্রিকা চিঠি দিয়ে, সাগরময় ঘোষ আমার কাছে কবিতা চান। আমি তাঁকে কবিতা দিয়েছিলাম। ওর কিছু পরে *প্রতিক্ষণ* কাগজটি, তারাও চিঠি দিয়ে লেখা চাইত। আমি সেইসব কাগজেও লেখা দিয়েছিলাম। আমি *যুগান্তর* পত্রিকায় কাজ করতাম, *যুগান্তর* শারদীয়ার জন্য প্রফুল্ল রায় আমাকে চিঠি দেন, সেখানেও লেখা দিয়েছিলাম। অমৃত পত্রিকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি আমাকে চিঠি দেন, আমি সেসব কাগজেও লেখা দিয়েছি। এরপর আশির দশকের মাঝামাঝি সময়, যখন আমরা 'শত জলঝর্নার ধ্বনি' আয়োজন করি কৃষ্ণনগর শহরে, সেখানে ঘোষিতভাবে আমিই বলি, আমি আর

প্রাতিষ্ঠানিক কাগজগুলিতে লিখব না। আমার দু-টি কবিতা এর আগে, ওই যে-সময় বললাম, *দেশ* পত্রিকায় বের হয়েছিল। এরপরে আমি লিখিনি। *দেশ* পত্রিকায় যখন জয় গোস্বামী কবিতা দেখত, তখন নয়ের দশকের শেষ দিকটায়, একটি সভায়, ওই সরলদা-র *টগবগ*-এর ছড়াপাঠের অনুষ্ঠানে, জয় আমার কাছে লেখা চাইল। আমি একটু বিস্মিত বোধ করলাম। আমার মনে হল — জয় তো আমাকে জানে, জয় কী করে আমার কাছে লেখা চাইল? আমি সেটা জয়কে বললাম — তুমি কী করে আমার কাছে লেখা চাইলে? জয় হেসে জবাব দিল — আচ্ছা মৃদুল, তুমি যদি আমার জায়গাটায় থাকতে, তুমি আমার কাছে লেখা চাইতে না? আমি জয়কে বললাম — জয়, আমি যদি তোমার জায়গাটায় থাকতাম, আমি তো তোমাকে জানি, আমি কোনোদিন তোমার কাছে লেখা চাইতাম না!

দেশ পত্রিকায় এখন যাঁরা, মানে কর্তৃপক্ষের জায়গায় আছেন, তাঁরা দু-এক বার আমার কাছে কবিতা চেয়েছেন, ফোনও করেছেন। আমি সবিনয়ে আমার অবস্থানের কথা জানিয়েছি। লেখা দিইনি। আমি একথাও বলি — আমি খুব কম লিখি, একটি লিটল ম্যাগাজিনেও কবিতা লিখতে পারলে আমার ব্যাপক আনন্দ হয়। আমি জানি, আমার যে আঙুলে-গোনা তিরিশ-চল্লিশজন পাঠক আছেন, তাঁরা ছোটো কাগজেই আমার লেখাটি পড়েন। আমি এটা লক্ষ করেছি।

আরেকটা জিনিস আমি মনে করি, আমি যেধরনের লেখা লিখি, আমি যেভাবে লিখি, তা লিটল ম্যাগাজিনেই মানায়। ইংরেজি যে 'স্ট্যান্ড' কথাটা, এর বাংলা ঠিক 'অবস্থান' না, এর সঙ্গে 'ভঙ্গি'-ও মিশে আছে। এই স্ট্যান্ড-ই আমাকে দিয়ে লেখায়। আমি অন্তত এটা ক্লেম করতে পারি, দাবি করতে পারি, আমার কবিতা প্রতিষ্ঠানকে সার্ভ করেনি। আমি কবিতালেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠানে আমার কবিতা সরবরাহ করিনি। আমাকে তৈরি করেছে, বা আমি আজ যেটুকু — সবটাই লিটল ম্যাগাজিনের জন্য। আমি এটাও মনে করি যে, বাংলা কবিতা বাহিত হচ্ছে লিটল ম্যাগাজিনে। বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি, কেউ যদি গবেষণা করে, তাকে যাবতীয় লিটল ম্যাগাজিন পড়তে হবে।

> ২০০১ : আমার কাছে বড়ো পত্রিকা বলে কিছু নেই। আমার কাছে ছোটো পত্রিকাগুলোই বড়ো পত্রিকা। তুমি যাদের বড়ো পত্রিকা বলছ, আমি সেগুলোকে বড়ো পত্রিকা মনে করি না। আমি ছোটো পত্রিকাগুলোকে বড়ো পত্রিকা মনে করি।
>
> এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আমাদের ভাষা, আমাদের জনজাতি এবং আমাদের এই দেশ সে এই নীল-সবুজ মায়া জড়ানো, সে হেঁয়ালিতে কথা বলে, সে কুহকের কথা বলে। সে একটু গোপনীয়তার কথা বলে। আমি মনে করি যে, আমার কবিতা যদি সেই রাস্তা ধরে, তবে তা প্রকাশ্যতার রাস্তা নয়। সে একটু চাপা, সে একটু লুকিয়ে থাকা, সে একটু গাছের আড়ালে যাওয়া। সেইটা আমি আমার নিজের কবিতায় ভেবেছি। আমার ভালো লাগবে যে, তুমি উত্তরপাড়ার একজন কবিতা-পড়ুয়া ছেলে, তুমি মেদিনীপুরের একটা কাগজে আমার একটা কবিতা খুঁজে পেলে। সেটা যেন একটা গাছের আড়ালে ছিল, তুমি হঠাৎ পেলে সেটাকে। সেইটা তুমি পড়লে। আর সেটা একটা ঝলমলে পত্রিকায় সবাই পড়ছে, আমার মনে হয় না — দুটো একরকম। আমি ওই জন্য ওই প্রকাশ্যতার পথ পরিহার করেছি। এটা বলতে পারি, যে পত্রিকাটায় কবিতাটা লিখলাম, আমার কবিতাটা যেন সেই পত্রিকার যোগ্য হয়। আমি মনে করি না যে, ওই কাগজগুলোতে লেখা বা ওই কাগজগুলোতে মুদ্রিত হওয়ার যোগ্যতা আমার রচনার আছে। এটা কিন্তু আমি ঠিক কথাই বললাম। আমার মনে হয় না যে, আমার কবিতাটা ওই কাগজের উপযুক্ত।

এবার একটু অন্য দিকে যাই। দু-একজনের বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনার কথা জানতে চাইব। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আপনার কাছে কীভাবে রয়েছেন?

২০১২ : আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে রয়েছেন, আমি সে বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছি সম্প্রতি। শ্রীশিক্ষায়তন কলেজে। 'রবীন্দ্রনাথ ও আজকের বাংলা কবিতা' — এ বিষয়ে আমি এলোমেলো কিছু কথা বলেছি। আমি বলব, রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে হস্তাবলেপন, সেটা পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত ছিল। আজকের বাংলা কবিতা, মূলত ষাটের দশকের কবিতা থেকে ধরলে, রবীন্দ্রনাথের কোনো চিহ্ন গত তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের বাংলা কবিতায় নেই। একেবারে গোড়ার দিকে পঞ্চাশের কবিদের কারো-কারো ভেতর, প্রায় সকলের ভেতর, সামান্যভাবে হলেও, টাচ অফ রবীন্দ্রনাথ ছিল। এর বড়ো উদাহরণ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দ ভৈরবী* কবিতাটি। ওই অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে আমাকে প্রশ্ন করে — রবীন্দ্রনাথের ভাব, রবীন্দ্রনাথের দর্শন, তা কি বাংলা কবিতায় নেই? আমার তন্মুহূর্তেই দু-তিনজন কবির কথা মনে হয়, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বা রবীন্দ্রনাথের ভাব এখনও যাঁদের ভেতর কাজ করে চলেছে। এইটা ঠিক। রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রাসঙ্গিক নয়, এইটা আমি বলতে পারব না। বহু কবিতাই আমরা এখন যদি পড়ি, নতুন মনে হয়, বা সেগুলো পড়ে শিহরণ জাগে। রবীন্দ্রনাথের একটা প্রাসঙ্গিকতা আছে। নিশ্চিতভাবেই তাঁর গান আমাদের বহু দমিত সময়ে, বহু অপমানিত সময়ে বহু ব্যথিত সময়ে আশ্রয় এবং অবলম্বন হয়ে ওঠে।

আমি আরেকটা জিনিসও মনে করি, সেটা হচ্ছে, সমাজ একজন বড়ো কবির কাছ থেকে কিছু পায়। ষাট-সত্তর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত সমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল। মানে, আমরা যেভাবে কথা বলছি, যেভাবে আচরণ করছি, সেটার পিছনেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। রবীন্দ্রযুগ বা রবীন্দ্র-আবহ সমাজদেহে ষাট-সত্তরের গোড়ার দিক পর্যন্ত ছিল বলে আমার মনে হয়। আমরা এরপর জীবনানন্দীয় সমাজে প্রবেশ করেছি। এখন যে সমাজের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, বাঙালি বুদ্ধিজৈবিক মানুষজন বাঙালি শিক্ষিত মানুষজন যে সমাজে কথা বলছি, সেটা জীবনানন্দীয় যুগ বলে আমার মনে হয়।

> ২০০১ : রবীন্দ্রনাথের যে দিকটায় তাঁকে আমার বিরাট মনে হয়, সেটা নাটকে। বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে কাজ করেছেন — মানে, আমাদের নাটক বস্তুত ছিলই না এবং রবীন্দ্রনাথের পরেও যে নাটক তা রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি যায়নি। এখন আমি তো নাটকের লোক নই — সেভাবে বলার কেউ নই — তবে, বাংলায় রবীন্দ্রনাথকেই আমার একমাত্র নাট্যকার মনে হয়।

মৃদুলদা, আরেকজন হচ্ছেন বিনয় মজুমদার। *ফিরে এসো, চাকা* এবং *অঘ্রাণের অনুভূতিমালা*, এই দু-টি কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি বিনয়দার পরবর্তী লেখাপত্র। কীভাবে তুলনা করবেন?

২০১২ : *ফিরে এসো, চাকা* এবং *অঘ্রাণের অনুভূতিমালা*-র পর বিনয় মজুমদার যে-ধরনের অসুখে অসুস্থ হয়েছিলেন, তাঁর লেখার ভেতর অনেক বিক্ষিপ্ত জায়গা জেগে ওঠে। তাঁর নিয়ন্ত্রণ নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তিনি এরপর অসংখ্য কবিতা লিখেছেন — তার ভেতরেও মোহ বিস্তারকারী, তার ভেতরেও বিদ্যুৎরেখাব মতো বহু পঙ্‌ক্তি রয়েছে। শেষদিকটায় তিনি যেসমস্ত লেখা লিখেছেন, তাতে আমার মনে হয়েছিল — তিনি এমন কিছু জায়গায় পৌঁছেছেন, যেখানে সবকিছুই শীতল, সবকিছুই সুন্দর। এবং তিনি কবিতার নতুন একটি পথ যেন খুঁজে পেয়েছেন। একেবারে শেষদিকে। যখন তিনি লিখেছেন — 'আমরা একত্রে আছি বইয়ের পাতায়' বা 'আমাদের গ্রামখানি সীমাহীন হয়ে যায়'। একটা নতুন কবিতার, নতুন ভাবনার নতুন ধাঁচের লেখার পথ তিনি পেয়েছিলেন। তিনি জীবনানন্দের পরবর্তীকালে বড়ো কবি। যেমন বড়ো কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আমাদের সৌভাগ্য যে এই কবিদের আমরা দেখেছি, এঁদের সঙ্গে কথা বলেছি।

২০০১ : বিনয় মজুমদার হচ্ছেন সেই কবি, যিনি শুরুতে একটা লাফ দিয়েছেন — টোটাল হাইটে — একটা রকেট, সে অনেক উঁচুতে উঠে ভস্মীভূত হয়ে গেল। মানে, সেই লাফ দিয়ে তিনি আলটিমেটকে ছুঁলেন। তারপর তাঁর বিশ্রাম। তবে তারপরের সব কবিতাগুলোতেও অসংখ্য ভালো কবিতা আছে। সে কবিতা হচ্ছে অবসন্ন, বিশ্রামে যাওয়া মানুষের রোমন্থন।

আচ্ছা, জয়দা, জয় গোস্বামী। ওঁর লেখা সম্পর্কে আপনার অ্যানালিসিস কী? ওঁর শুরুর লেখা আর পরবর্তী বা সাম্প্রতিক লেখাপত্র...

২০১২ : শুরুর দিকে জয়ের যে লেখাপত্র সেগুলো তো আমি পড়েছি। আমি শেষের এই দু-তিনটে বই-ও পড়লাম। কিন্তু মাঝের অনেক বই আমি পড়িনি। জয় আমাদের সময়ের খুবই বড়ো কবি একজন। আমাদের সময়ের গর্বের একজন কবি। জয় নানারকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গিয়েছে। জয় কবিতায় কোনোকিছুকেই বাদ দেয়নি। কোনোকিছুকেই লুকোয়নি। বরং জয়ের আত্মঘোষণা, নিজেকে সবটুকু দেখানো, নিজেকে সবিস্তারে মেলে দেওয়া — এটা একজন বড়ো কবির কাজ।

২০০১ : জয় সবথেকে বড়ো যেটা করেছে — কবিতাকে মুক্ত করে দিতে চেয়েছে। আমি এটা বলতে চাইলাম, আগে কবিতার যে গহীনতা, যে গোপনীয়তা, সেটার থেকে জয় কবিতাকে মুক্ত করে দিতে পেরেছে। এটা একটা বড়ো কাজ। অনেকের কাছে পৌঁছোনো যায়, এমন কবিতা লেখার চেষ্টা সে করেছে।

আজ, আপনার এই জীবনকে আপনি কীভাবে দেখেন? সেখানে কবিতা কতটা সম্পৃক্ত হয়ে আছে?

২০১২ : চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স থেকে এই সাতান্ন-আটান্ন বছর বয়স পর্যন্ত জীবনে এমন একটি দিন নেই, যেদিন আমি কবিতাকে ভাবিনি। প্রতিদিনই নানা কাজের ভেতর, নানাকিছু করতে-করতে কবিতার কথা ভেবেছি। এমন-এমন দিন আছে, এমন-এমন সময় আছে, যখন আমি ব্যাঙ্কের কথা ভাবিনি। এমন গোটা তিনদিন সময় আছে, দশদিন সময় আছে, হয়তো পনেরো-কুড়িদিনও সময় আছে — যে পনেরোদিন আমি ব্যাঙ্ক নিয়ে কিছু ভাবিনি। একটি-দুটি দিন আছে, যখন আমি অন্যত্র, সেদিন আমি বউকে নিয়ে কিছু ভাবিনি। এমনকী, মেয়েকে নিয়েও ভাবিনি। কিন্তু কবিতা নিয়ে আমি ভেবেছি। এটা ভাবলে আমার বেশ অবাক লাগে। একটা দিন বউকে ভাবিনি, মেয়েকে ভাবিনি — এটা প্রায় অপরাধতুল্য ঘটনা। তাই না? কিন্তু আমি কবিতা নিয়ে ভেবেছি। এতে আমি তৃপ্তি বোধ করি জীবন সম্পর্কে। মনে হয়, আমি আমাকে হ্যান্ডশেক করি।

২০০১ : এটা তো আমি নিজে সেভাবে বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয়, আমি যেভাবে জীবনযাপন করি, সেটা কবিতার জীবনযাপন। অনেকে ভাবেন, এ কবিতা লেখে, এ একটু অন্যরকম লোক — এই বিবেচনা, স্নেহ বা কখনো এটা ব্যঙ্গও হতে পারে। এটা আশেপাশের মানুষজনের, পাড়া-প্রতিবেশীর আছে। আবার এটার জন্যই আমার মনে হয়, আমি তাহলে একটা কবিতা-জীবনযাপন করি। আবার বাড়িতে আমার স্ত্রী, মেয়ে বা আমার ভাই-এরা যাঁরা আছেন, তাঁরাও অনেক ব্যাপারে — ও কবিতা লেখে — ফলে আস্থা রাখেন না। বা, স্ত্রী অত্যাচার সহ্য করেন। এই দিকগুলোও আমি পাই। ধরো, আমাকে একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল বা হল না; এটা কেন? এটা আমি কবিতা লিখি বলেই। তো, এই ক্ষেত্রে এমন একটা বোধ হয়ই। আর সেটা আমি উপভোগও করি।

কাহিনিকার্টুন



মদের গ্লাসে বৃষ্টিজল

কচু কিংবা পদ্মপাতায় টলটলানির চেয়ে বৃষ্টির জলকে মৃদুল ভালোবাসেন মদের মিশ্রণে। বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ পেলেই খোঁজেন শিশি আর ফানেল। পেতে দেন আকাশের নীচে। শিশি-ভরা বৃষ্টি-ফোঁটা মিশে হুইস্কির সোনালি গ্লাসে ওঠে সোনার বুদ্বুদ। চিয়ার্স!

কবিমানস, কবিমানুষ

পর্যটন

শামসুর রাহমান

'যাবেন তো ঠিক' বললে মৃদুল
কণ্ঠের তারে এস্রাজী ছড় টেনে।
কলকাতা থেকে মুখ ফেরালাম,
প্রাতরাশ সেরে চাপলাম দ্রুত ট্রেনে।

বলাবলি হয় বৃক্ষের কথা,
শ্যামা পাখি গায়, নাচে হৃদয়ের ক্ষতে,
কখন যে মৃদু দুপুরের রোদে
পৌঁছে গেলাম তোমার বাড়ির পথে।

বললেন হেসে দেয়ালে টাঙানো
সেই কবেকার তোমার মায়ের ছবি —
'কেমন অতিথি এনেছিস খোকা
এতকাল পরে? কবির উঠোনে কবি?'

মেহগনি কাঠে তৈরি খাটের
সুজ্‌নিতে বসি ঈষৎ পদ্মাসনে;
কিছু দূরে যেন মন্দিরা বাজে,
করি খণ্ডিত সঙ্গীত মনে মনে।

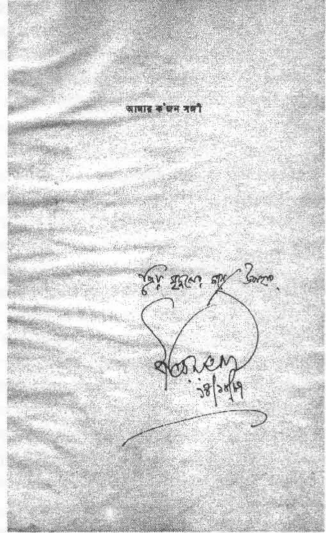
মৃদুল তোমার পিতার কথায়
পিছুটান আর অতীত বলার ঝোঁক।
এক লহমায় হয়ে যান তিনি
সেই কবেকার যোগী নগরের লোক।

দিনেমারদের গির্জা অথবা
গঙ্গার তীরে দেখিনি চন্দ্রলেখা।
আরেকটি দিন থেকে গেলে মানি
ইতিহাসময় কত কিছু যেতো দেখা।

আমার এমন পর্যটনেই
ফুল চন্দন পড়ে খুব অগোচরে।
আমি তো পঞ্চ ব্যঞ্জন পেয়ে
সোজা চলে গেছি তোমার রান্নাঘরে।

বিদায় জ্ঞাপনে অনিচ্ছা বাজে,
সিক্ত হৃদয় ভাসে বেহাগের সুরে;
পাখির বিলাপ ধূলায় গড়ায়
কেরী সাহেবের, তোমার শ্রীরামপুরে।

— *আমার ক'জন সঙ্গী* কাব্যগ্রন্থে সংকলিত



শামসুর রাহমানের দেওয়া *আমার ক'জন সঙ্গী* বই-এর সৌজন্য কপি

আন্তরিক মৃদুল

দেবদাস আচার্য

মৃদুলকে দেখতে, ওর সঙ্গে পরিচিত হতে, আমিই প্রথম ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ও আমার বাড়িতে এসেছে পরে এবং অসংখ্যবার। কেবল মৃদুলই উদ্দেশ্য ছিল প্রথমবার। তখন ও ওদের পৈতৃক বাড়ি ডাক্তারবাগানে থাকত। সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ তরুণ। কলেজ-ছাত্র। আমার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান অনেক। আমি যুবক। বিবাহিত। আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম যে, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ওর লেখা সংগ্রহ করা এবং ওর মতো শক্তিমান সদ্য তরুণ ছেলেটিকে চোখে দেখা। আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল ওর বন্ধু এবং কবি সুবোধ সরকার। সুবোধ তখন কৃষ্ণনগরে থাকত, কলেজে পড়ত। আমি *ভাইরাস* নামে একটা উড়োপাতা সদৃশ পত্রিকা করতাম। সেই উড়োপাতাটিকে স্বর্ণাক্ষরে সাজিয়ে তোলাই ছিল মূল কথা। আর প্রধানত টাটকা লিখতে আসা কবিদের সহযোগিতা কামনা করা। পত্রিকায় অন্য কোনো মানুষের কর্তৃত্ব না থাকায় সে-কাজ কিছুটা সহজ হয়েছিল। এবং মৃদুল দাশগুপ্তের মতো কিছু টাটকা প্রতিভার পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। এখানে একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। প্রথম যেদিন ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেদিন রাতে একটা ঘরে আমি সুবোধ ও মৃদুল পাশাপাশি শুয়েছিলাম। ভোরে ঘুম ভাঙার পর মৃদুল দু-হাত ছড়িয়ে 'জেগে ওঠো, উৎক্ষেপক' বলতে-বলতে উঠে বসল। ওটি আমার একটা কবিতার নাম। এমন আশ্চর্য প্রয়োগ, ভাবা যায় না।

বোঝাই যাচ্ছে যে প্রথমাবধি মৃদুলকে আমি কোন নজরে দেখি। পরে মৃদুল আমার পরিবারের আপনজন হয়ে ওঠে। আমার স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করত;

আমার ছেলেরাও হয়ে ওঠে ওর স্নেহধন্য। এখনও তা-ই। মৃদুলের কাব্যশক্তি অতুলনীয়। তুলনীয় কেবল ওর বন্ধু (আমারও প্রিয় সে) জয় গোস্বামীর সঙ্গে। শব্দ এবং ছন্দের অবিভাজ্য মিলনের গূঢ় রসায়ন ওরা সহজাত ধর্মে সঙ্গে এনেছে। এটা বাংলা ভাষায় বিরল। সে-কথা থাক। কাল ও ইতিহাস এদের সে স্বীকৃতি ইতিমধ্যেই দিয়েছে। আমার সঙ্গে মৃদুলের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিবিড়। আদর্শগত সম্পর্কও।

সেসব কথা খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তবে, মৃদুল এবং জয়কে তখন আমি অন্য নজরে দেখি। দু-জনই যেমন তেজি তেমন শক্তিমান। এ-শহরের বিদগ্ধজন এবং কবিতাপ্রেমী মানুষদের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার জন্যে একসঙ্গে কৃষ্ণনগরে এনেছিলাম। স্থানীয় অরবিন্দভবনে। পুরো ব্যাপারটায় ওদের বন্ধু এবং আমার স্নেহভাজন, সুবোধ ছিল বিশেষ তৎপর। আমরা মাঝে-মাঝে অনুষ্ঠান করে বিশিষ্ট কবিদের সঙ্গে কাব্যপ্রেমী মানুষদের মুখোমুখি করিয়ে দেব, অনেক কবিতা পড়বেন কবি, মানুষ শুনবেন, প্রশ্ন করবেন, প্রশ্নোত্তরে জমাট হয়ে উঠবে সে অনুষ্ঠান — এমন ছিল ইচ্ছে। — এবং শতকরা একশোভাগ সে-ইচ্ছে পূরণ হয়েছিল আমাদের। অর্থাৎ কৃষ্ণনগরবাসী মৃদুলকে তখনই বিশেষভাবে চিনে নিয়েছিল। জয় গোস্বামী তো নদিয়ারই ছেলে। অর্থাৎ, আমি একাই নই, কৃষ্ণনগরবাসীও মৃদুলের কাছের মানুষই ছিল সেদিন। আজও, আমার বন্ধু এবং অরবিন্দভবনের সম্পাদক গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-অনুষ্ঠানের কথা মনে রেখেছে। পরে একবার ওই ভবনে কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীকে এনেছিলাম।

মৃদুলকে আমি, আরও অনেক কবিবন্ধুর সঙ্গে একজন সহযোদ্ধা মনে করি। মৃদুল উভয়ক্ষেত্রেই যোদ্ধা। তার কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, তেমন কাব্য-সাহিত্য-ছোটো পত্রিকার প্রথাবিরোধী উচ্চারণের ক্ষেত্রেও দক্ষ যোদ্ধা। সৎ, নিরহংকার, নির্মল এবং নির্লোভ। কৃষ্ণনগর শহরের জজকোর্টের মাঠে, পথঘাটে সত্তর দশকের দিনগুলিতে মাঝে-মাঝেই মৃদুলকে পেয়েছি। যখন *পরিবর্তন* পত্রিকায় কাজ করত — তখন চম্বলের গহনে ঢুকে চম্বলের সে-সময়ের ত্রাস ডাকাতদের গুহায় মুখোমুখি বসে তাদের প্রাণ-মন-খোলা যে সাক্ষাৎকারটি মৃদুল সংগ্রহ করেছিল, সেটি ছিল যেমন দুঃসাহসিক কাজ, তেমন ওই ডাকাতদের মর্মের কথারও দলিল। আমার রাধানগরের বাড়িতে এসে আমাদের সে-গল্প শুনিয়েছিল মৃদুল। যার সব সে লিখতে পারেনি। কেন তারা 'বাগি' (ডাকাত নয়), সে-ব্যাখ্যা তারাই দিয়েছে মৃদুলকে। সে যে কেবল আর্থিক-সামাজিক ব্যাপার তা-ই নয়। আরও বেশি কিছু। এমনই সাহসী মৃদুল। মৃদুলের আরও এক দুঃসাহসের কথা ওর মুখ থেকেই শুনেছিলাম। সেটা সত্তর দশকের শেষদিক। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মৃদুল পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে গিয়েছিল। একরাত সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে মৃদুলও ছিল। কিন্তু মৃদুল ওর কর্মস্থলে সময়মতো ফেরার জরুরি প্রয়োজনে শেষরাতে অযোধ্যা পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল। একা। হাতে একটা মশাল। তা-ও সোজাপথে নয়, শুঁড়িপথে। শুঁড়িপথ — মানে, শ্বাপদসংকুল পথ। বলা যায়, শ্বাপদের চলাফেরার পথ। কেবল অযোধ্যা পাহাড়ের, অর্থাৎ স্বভূমির মানুষদেরই সাহস থাকে সে-পথ চলার। শেষরাত, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর সে-পথ। ভালুক আর বুনো শুয়োরের চলাফেরা, রাত-চরা অন্যান্য জন্তুদের চলাচলের সময়। মৃদুল একা অমন শ্বাপদসংকুল শুঁড়িপথে নেমে দ্রুত ফিরে ঠিক সময়মতো ট্রেন ধরে অফিসে পৌঁছে গেল। শুঁড়িপথে গেলে সময়ের সাশ্রয় হয়, তাই এই ঝুঁকি। দুঃসাহসটা একটু বেশি। প্রায় কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্ববোধ — এসব কথাও পাশাপাশি মনে পড়বে। শেষ করার আগে একটা মজার ঘটনা এখানে বলি। সেটা মৃদুলের পেশাগত প্রয়োজনে ঘটে গিয়েছিল। একবার শারদোৎসব উপলক্ষে ওর পত্রিকার একটি ক্রোড়পত্রের প্রয়োজনে ওকে মফস্সল ঘুরে রাজবাড়ি-জমিদারবাড়ির পুজো নিয়ে একটা লেখা তৈরির দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। এসব কাজে ও আনন্দই পায়। মৃদুল কৃষ্ণনগরে এল। প্রথমে আমার বাড়ি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে মৃদুল চলল রাজবাড়ি। তথ্য সংগ্রহের জন্যে। কৃষ্ণনগরের রাজা ও রানি সপরিবারে এ-সময় কৃষ্ণনগরেই থাকেন। রাজবাড়ির ফটকেই পড়ল বাধা। রাজাদের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী আছে। সুবিশাল সিংহদুয়ারের



মান সিং-এর পুত্র ঠাকুর তহশীলদার সিং-এর সাক্ষাৎকার; চম্বল, ডিসেম্বর ১৯৮০

ভিতরে তিনি দুয়ার বন্ধ করে আগলে বসে থাকেন। মাছি গলাও সম্ভব নয়। অথচ মৃদুলকে কাজ সেরে ফিরতে হবে। এখানেই মৃদুলের সাংবাদিক চরিত্রের পরিচয় পেলাম। মৃদুল নিজের পরিচয়পত্রটি একটা ছোট্টো চৌকো গর্ত দিয়ে ভিতরের দ্বাররক্ষীকে দিল। দিয়ে বলল — এটা নিয়ে যান, রাজামশাইকে দেখান, উনি যদি অনুমতি দেন, তবেই যাব। দ্বারপালটি কিছুতেই নেবে না। তখন দুপুর। এ-সময় রাজামশাই স্বাভাবিকভাবেই বিশ্রাম নেন। বিরক্ত করা নিষেধ। তবুও মৃদুল না-ছোড়। কথার প্যাঁচে এবং মধুর ব্যবহারে মৃদুল দ্বারপালকে ভজিয়ে ফেলল। দ্বারপালের সঙ্গে এত কথা চালাচালি হচ্ছিল স্রেফ অদৃশ্যভাবে। সেই বন্ধ সিংহদুয়ারের এপার-ওপার থেকে। আমি কেবল উপভোগ করছিলাম। প্রায় মিনিট দশেক চেষ্টা করে মৃদুল অসাধ্যসাধন করেছে। দ্বারপালকে রাজামশাই-এর কাছে পাঠাতে পেরেছে। প্রথম রাউন্ডে মৃদুল জয়ী। এবার মৃদুল টেনশন-মুক্তির জন্যে সিগারেট ধরাল। কী আশ্চর্য! সিগারেট ফুরোতে না-ফুরোতেই মৃদুলের জয়। সিংহদুয়ার খুলে গেল। আমরা দু-জন জয়ী সেনাপতির মতো রাজবাড়ির সামনের বিশাল লনটি পেরিয়ে যখন বাড়ির সিঁড়ির দিকে এগিয়েছি, তখন রাজামশাই নিজে এসেছেন আমাদের স্বাগত জানাতে। মৃদুল দূর থেকে ফিসফিস করে আমাকে বলল — আশাতীত, অকল্পনীয়, এমন উদার এবং সুভদ্র মানুষ ইনি! এরপর রাজামশাই আহ্বান করে রাজবাড়ির দোতলায় নিয়ে গেলেন। এবং কোনো বসার ঘরে নয়, একেবারে সুবিশাল খাবারঘরের চেয়ার-টেবিলে।

এ কি বিশ্বাস্য?

আরও বিস্ময় আছে। রানি মহোদয়া নিজে দাঁড়িয়ে লোক দিয়ে আমাদের জলখাবার পরিবেশন করলেন। মৃদুল তার প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে গেল। তার চেয়ে বেশি যা আমরা পেলাম, তা কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের অজানা অনেক কথা। সরাসরি রাজা সৌমীশচন্দ্র রায় ও রানি অমৃতা রায়ের মুখ থেকে।

মৃদুল এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটাল, সে একটা ফাঁকা দেশলাই খোল রানির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল — রানিজি, আপনি অনুমতি দিলে এই ফাঁকা খোলে একটু মাটি ভরে নেব, এই ঘর থেকে। স্মারক হিসেবে নিয়ে যাব। নইলে আমার মেয়ে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, যে সত্যিই আমি রাজা ও রানির মুখোমুখি বসে

গল্প করে এসেছি। রাজা সৌমীশচন্দ্র রায় এবং রানি অমৃতা দেবী হো-হো করে হাসলেন। বললেন — আমাদের আর রাজা-রানি বলেন কেন? সে-যুগ তো শেষ। মৃদুল বলল — তা হোক, আমার চোখে সে-যুগ শেষ হয়নি। একদা এ-পরিবার ছিল বাংলার হিন্দুসমাজের সমাজপতি, বঙ্গসংস্কৃতির ধারক-বাহক। আপনারা আমাদের চোখে রাজা-রানিই।

মৃদুল দেশলাই-এর খোল ভর্তি করে ওই ঘরের মাটি নিয়ে ফিরেছিল।

মৃদুলবন্ধু রে!

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যসব কথার আগে, প্রার্থনা করি যে, মৃদুল দাশগুপ্তের মতো সুজন সুহৃদ, একজন হলেও, যেন মানুষ পায়। এতই সুন্দর একটা লোক যার বিরাগ, বিরক্তি, গোঁয়ারতুমি, পাগলামি, গালাগালি পর্যন্ত বন্ধুপ্রীতির সমান সুন্দর।

মৃদুল ভালোবেসে যে পক্ষ নেয়, সেটার বিরুদ্ধে বিরাট বিশাল গ্লোবাল সব ষড়যন্ত্র চলেছে — এই তত্ত্ব খুব পছন্দ করে। সাইবেরিয়াতে স্বার্থান্বেষী এক আন্তর্জাতিক চক্র কীভাবে বুলগেরিয়ার একটা দলের মাধ্যমে উলুবেড়িয়ার এক তরুণ কবির লিটল ম্যাগাজিনে লেখা ছাপা বন্ধ করে দিতে সক্রিয় — মৃদুল ঠিক টের পায় — তাও ভারী সুন্দর। আমাদের প্রত্যেকেরই অজস্র নেগেটিভস রয়েছে। মৃদুলের নেগেটিভগুলোও সুন্দর।

যে দশকটির মাঝামাঝি আমার কবিতা ছাপা হতে শুরু করে, যে সময়পর্বে মৃদুল, জয় গোস্বামী, গৌতম চৌধুরীরও শুরু, সেই 'সত্তর'-এর দশকটির অনেকগুলি শীর্ষবিন্দু আছে বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু মৃদুল দাশগুপ্তই ওই দশকছাপ্পা-খাওয়া পুরো দলটির উজ্জ্বলতম কবি।

'উজ্জ্বল' বলতে আমি কী বোঝাতে চাইছি সে কথায় আসছি, তবে তার আগে প্রসঙ্গত রাখি যে, সময়ছাপ্পার এমনিতে কোনো মানেই নেই। ওই নিরিখে দলীয়তা কাউকে কবি করতে পারে না, বা ওই নিরিখে বিচার-নিঃসৃত সুপারলেটিভগুলিও কারো কবিযশকে স্থায়িত্ব দিতে পারে না। এই যেমন আমি বললাম 'উজ্জ্বলতম'। কিন্তু দশকশতকাদি সময়খোপের ব্যবহারিকতা স্বীকার্য এই কারণে যে, আমাদের মতো সাধারণ লোকজন বিশেষণের ডিগ্রি ছাড়া নিজেদের নিয়ে আলোচনা করতে পারে না। কালিদাস-রবীন্দ্রনাথদের কোনো কালোল্লেখ দরকার পড়ে না। আবার হয়তো এ-ও দেখা যাবে যে, ওই সময়ছাপ্পা-মারা দলটির বাইরে থেকে একই সময়ে লিখে যাওয়া কেউ আসলে ওই সময়ের মহত্তম কবি! সেরকম হলেও ভারী আনন্দের কথা। কিন্তু 'সত্তর' বলে ব্যবহারিক সময়খোপটিতে বেঁধে-ওঠা দঙ্গলটির সবচেয়ে উজ্জ্বল কবি মৃদুল দাশগুপ্ত।

উজ্জ্বল বলতে, সেই সময়কার অভীষ্ট রোমান্টিকতার প্রতি সবচেয়ে একনিষ্ঠ থেকে, একটি অত্যন্ত শক্তিশালী কাব্যনন্দনে বাক্‌সিদ্ধি অর্জন করা। পরে বই হবে যেগুলি নিয়ে *জলপাইকাঠের এসরাজ* নামে, সেসব কবিতা যখন লিখিত হয়ে চলেছে, তখন আমাদের প্রতিটা রাতই প্রায় উৎসবের রাত হয়ে উঠত একা মৃদুল দাশগুপ্তের কবিত্বের ঝলকানিতে। তখন কাছে-দূরে অনেক কবিসম্মেলন হত। আর আমরা অনেক সব মফস্‌সলের টিমটিমে ডুমবাতি-জ্বলা রাস্তা ধরে হাঁটতাম প্রচুর কেন কে জানে। আর বসে পড়তাম অনেক অন্ধকার মাঠে, যদিও কয়েকজন তরুণকে একসঙ্গে দেখলেই তখন ভয়ে পুলিশ-প্রশাসন টর্চ ফেলত, জেরা করত, তবু। আর মৃদুলের কবিতা 'আমরা কি বাজাবো না...', 'এবং নদী তুমুল তিস্তা', 'আরব গেরিলাদের সমর্থন করি', 'ভাবো সেদিনের উৎসব। বরানগরের গঙ্গার জল থেকে / আবার এসেছে উঠে / তিনশো তরুণ' — এর তীব্র রোমান্টিক উচ্চার আমাদের রাতগুলিকে 'কবিত্ব-উদ্‌যাপনের উৎসব' করে তুলত। লাস্ট ট্রেনে কোথা থেকে জানি না ফিরতে-ফিরতে গেয়ে উঠতাম নিজেদের মতো করে, 'There is something in the air tonight...'।

দশকের ঘূর্ণনেই আমাদের সময়টা অবশ্য পালটাতে শুরু করল। আমরা তখন চব্বিশ-পঁচিশ থেকে আঠাশ-তিরিশ। রাতগুলির বাতাসে আর তেমন কিছুই ছিল না যা ছিল মাত্র কয়েক বছর আগেও — তা নয়। আমি তো ওই রোমান্টিক উচ্ছ্বাস চালিয়ে গেছি অনেকদিন ধরে, পরপর দুটো বইমেলাতে *কৃষ্ণপক্ষ* পত্রিকার সংখ্যা বার করেছি লাল মিনিবুক আকারে, 'এই সময়ের রাজনৈতিক গদ্যপদ্য'। বন্ধুরা মিলে মাঠের ধুলোয় বসে বিক্রি করেছি পাঁচশো কপি। আমার কবিতাও তেমনই এই বাল-রোমান্টিকতায় ভেসে-ভেসেই এগিয়েছে। হয়তো বা আজও চলেছে ওইভাবেই। কেবল রোমান্টিকতার বিষয়ই বুঝি পালটেছে বারবার। কিন্তু আশির দশকে পড়তে না পড়তেই মৃদুল-গৌতমরা কাব্যিক পিউবার্টি পার হয়ে গেছে অনায়াসে, যদিও মূল বিষয়মুখ তারা নিজের-নিজের মতো করে একই রেখেছে শক্ত হাতে। আমার মতো দিগ্‌ভ্রান্ত হয়নি ক্ষণে-ক্ষণে। এই পরিণতমনস্কতা আমার চোখে খুবই শ্রদ্ধেয় ঠেকত। *এভাবে কাঁদে না*-র কবি কী সংহতবাক, কত অভিজাত, কত আবেগসহিষ্ণু ভেবে অবাক হতাম। চারটে করে মাত্র লাইন, ন্যূনতম বিবরণমূলক, গল্পের সংযোগচিহ্ন মুছে দেওয়া, রাস্তা থেকে যে-কেউ উঠে এসে কাব্যরস গিলে নিয়ে অফিস টু বাড়ি ফিরে যাবে — তার কোনো চান্স নেই। রণজিৎদা (কবি রণজিৎ দাশ) আর আমি, সত্তরের দুই নিরেট মনোরঞ্জনবাদী তখন খুব ঘনিষ্ঠ। ফেল্ট বিট্রেয়েড, আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম, 'এরা শুরু করল-টা কী'! কিন্তু সাধকেরা বিচলিত হয়নি। মৃদুল যে সিদ্ধিতে পৌঁছেছে *সোনার বুদ্বুদ*-এ, তা সাধনোচিত। (একটু উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারছি না।)

মুণ্ড ও মস্তিষ্ক, মন, তদুপরি ললাট লিখন
তায় চক্ষু, কর্ণদ্বয়..., শ্রবণের, বচনের, আহারের,
সুঘ্রাণে অধীর
বিবিধ বাসনা জড়ো, কেবল মস্তকে নিয়ে শত আয়োজন
চলেছে প্রেমিক, সাধু, কবি, ভণ্ড, ভোগী, ত্যাগী, চোর, যুধিষ্ঠির...

যায় শিরশ্ছেদে প্রাণ, আমি সে মহার্ঘ মাথা ধুলোয় লুটিয়ে
কাতর পথের মাঝে যদি তুমি ক্রোড়ে নাও, টানো বক্ষে
সজল নয়নে
সকল ধুসর কোষ এমত আকাঙ্ক্ষা করে, অতিস্বপ্ন বয়ে-যায়
স্নায়ু দিয়ে দিয়ে
সর্বদা জীবনব্যাপী, যখন যেখানে থাকি জনপদে, বনে

৫৬নং, পৃ. ৬৪

'তুমি'-র যে সাধারণ ধোঁয়াশা, বা অনেকান্ততা, তা যা থাকার থাকুক, তবু মৃদুলের এই 'তুমি'-কে শুদ্ধা কাব্যনন্দনের দেবী বলেই বোধ হয়।

ফলে আশির দশকের বেশিরভাগ সময়টাই কাব্যনান্দনিকভাবে আমি রণজিৎদার সঙ্গে কাটাতে বাধ্য ছিলাম, যারা অতটা ধুপধুনোর পক্ষে ছিলাম না। মৃদুল তখন *রান্নাঘর* লিখছে, 'গোপনে হিংসার কথা...' লিখছে..., এতই গোপনে যে তা ধরতে আমাদের নেটওয়ার্ক ফেল করে যাচ্ছিল।

আমি বরাবরই একটু ওপ্‌ন হিংসার পক্ষে ছিলাম। ফলে আবার নতুন করে মৃদুলের সঙ্গে একটা প্রাণের আঁতাত গড়ে ওঠে 'শত জলঝর্নার ধ্বনি' নামক 'প্রতিরোধ'-এর দিনগুলোতে। 'শত জলঝর্নার ধ্বনি' কর্মকাণ্ডের ঠিকঠাক সমাজতাত্ত্বিক স্ট্যাটাস কী আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় যে এটা মূলত ছিল, সাহিত্যের মার্কেট-ইকনমিগত আধিপত্যের বিরুদ্ধে সাহিত্যের সৃজনগত দিকটির একটি রোমান্টিক রেসিস্ট্যান্স। কপি বিক্রির সঙ্গে মিডিয়া-হাইপের সঙ্গে সৃজন এমনকী পশ্চারিটিরও কোনো সম্পক্কো নেই — এই জানা কথাটা আরেকবার স্মরণ করে নেওয়া, সবাই মিলে জড়ো হয়ে। ওই লগি দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরা তারাগুলি যে আসলে ভেতরে টুনি-জ্বালানো কাগজের, বাংলা

সাহিত্যাকাশের নয় বলেই কবি-লেখকরা মনে করছে — এটা জানিয়ে দেওয়া। তখন যে দিনের পর দিন মৃদুলের সঙ্গে দীর্ঘপথ কৃষ্ণনগরে দেবদাসদার বাড়ি যাতায়াত করেছি, আরও অনেক বন্ধুদের সঙ্গে, সম্মেলনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে, সেটা আমার জীবনের খুব তৃপ্তিকর কর্মকাল। 'শত জলঝর্নার ধ্বনি' যারা আমরা ভেবেছিলাম, গড়ে তুলেছিলাম, তারা সকলেই জানি এর সীমাবদ্ধতা, জানতামও, প্রথম থেকেই। জানতাম যে, এটা কোনো আদর্শগত রেজিমেন্টেশনের জায়গা হতে পারে না, বা হতে পারে না একটা ম্যান্ডেট দেওয়া ফোরাম, যে বলবে, অমুক কাগজে লেখা যাবে আর তমুক কাগজে যাবে না। কিন্তু যারা 'শত জলঝর্নার ধ্বনি'-কে উড়িয়ে দিতে চান 'কিস্যু না' বলে, সেদিনও বা আজ, বা তার চরিত্রহনন করতে সচেষ্ট, তাদেরকে সবিনয় বলি যে, পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো ভাষাসাহিত্যে এত বড়ো ঘটনা আর ঘটেনি। খবরকাগুজে শক্তিতে মাথা কিনে নিয়ে সাহিত্যবেচা বানিয়ারা কয়েকটা 'শান্তিগোপাল' বানিয়ে নিজেদেরকে কবি-লেখকদের বিধাতা বলে ভাবতে শুরু করেছিল, কবি-লেখকদের অপমান করতে আরম্ভ করেছিল, 'শত জলঝর্নার ধ্বনি' ছিল কবি-লেখকদের পক্ষ থেকে তার প্রতি একটা 'ফুঃ'। এমনই 'ফুঃ', যে পরের দু-দশকে বিধাতারা আর মাজা সোজা করে দাঁড়াতেই পারেনি। পৃথিবীর কোথাও কখনো মিডিয়াবলী সাহিত্যবানিয়া অপমানকারীরা কবি-লেখকদের কাছ থেকে এতবড়ো 'ফুঃ' খায়নি। আর যারা ভাবছে, পরে ব্যক্তি হিসেবে ওই কবি-লেখকদের কে কোথায় লিখেছে না-লিখেছে সেগুলোই খুব বড়ো ডিটেল, যারা ভাবছে যে, ওই প্রতিরোধের আদর্শ শেষ হয়ে গেছে, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। মিডিয়াবলী সাহিত্যবানিয়া বা রাষ্ট্রমাতব্বরি যখন যেখানেই সাহিত্যসৃজনের প্রশ্নে কবি-লেখকদের প্রাধান্যকে অপমান করবে সেখানেই শোনা যাবে 'শত জলঝর্নার ধ্বনি'। ১৯৮৯-এ কৃষ্ণনগরে সেই প্রথম জমায়েতের স্মারক-সংকলনটির সম্পাদনা করেছিলেন মৃদুল দাশগুপ্ত।

বাংলা ভাষাসত্তার অর্ধেক আকাশ বাংলাদেশের সঙ্গেও আমরা মেলবার চেষ্টা করেছিলাম খুবই। 'এইসব স্রোতের বিরুদ্ধে' নাম দিয়ে ঢাকাতেও একটা অধিবেশন, কৃষ্ণনগরের মতো বড়ো না হলেও, হয়েছিল। তখন মৃদুল ও গৌতমের সঙ্গে আমার কয়েকদিনের ঢাকা-বাস অসামান্য স্মৃতি হয়ে আছে। বস্তুত নব্বই-এর দশকে আমাদের আবেগের কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায় বাংলাভাষা ও বাঙালি আইডেন্টিটি কোয়েশ্চেন। প্রাক মোবাইল-ইন্টারনেটে যুগেও আমরা সাহস করে নিয়মিতভাবে 'দুই বাংলার একটা কাগজ' বের করার চেষ্টা করেছিলাম গৌচৌ-এর দেওয়া *যুক্তাক্ষর* নাম দিয়ে। মৃদুলই আমাদের পিওর আবেগ সাপ্লাই করত সব ব্যাপারে। কিন্তু কাগজটা চলা সম্ভব ছিল না। শুধু প্রচুর গাঁটগচ্ছা গেছিল। তো, আমরা আবার ফিরি সেই স্থানীয়-মার্কা লিটল ম্যাগাজিনে। তার নামও গৌচৌ দিয়েছিল — *কীর্তিনাশা*। তাতেও অবশ্যম্ভাবী, ছিলাম আমি আর মৃদুল। কিন্তু মৃদুল তখন সত্যি-সত্যি আর ততটা ছিল না। সাহিত্যের ভেতরদালানে চলা ক্ষমতার নানান সব লেঙ্গি-লাথির খেলা দ্যাখাটা মৃদুলকে মানসিক-শারীরিকভাবে খুব কাবু করে ফেলেছিল।

এই সহস্রাব্দের প্রথম বছর দু-তিনের মধ্যেই হবে বোধহয়, ঠিক কোন সাল কোন মাস ঝটিতি মনে পড়ছে না, সেটা জরুরিও নয়, নৈশাহার শেষে ধূমপান করছি, রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটা হবে, হঠাৎ আমার নাম ধরে মৃদুলের তুমুল ডাক। দৌড়ে নীচে গেলাম, 'কীরে!'

'অফিস থেকে বাড়ি ফিরছি, আমার গাড়িতে ওঠ। সারারাত তোর সঙ্গে কথা বলা দরকার, জামাপ্যান্টটা পরে আয়।' মাদকপদার্থ কিছু নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, অথচ প্রবল নেশাতুর।

আমরা পঞ্চাশী নই। নিপাট গেরস্তপনাতেও আমাদের ধরণিকে কখনো দ্বিধা হতে হয়নি। কবিত্বের মিথ বানাতে মাল খেতে হয়নি, রাত্রিশাসন করতে হয়নি, বা গেরস্ত বন্ধুর বাড়িতে রাতে হামলা চালিয়ে আশ্রয় পেয়ে ভোরে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বিছানায় হেগে রেখে আসতে হয়নি। তো, এককথায় মৃদুলের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো চিত্রনাট্যই আমার জন্য ছিল না। কিন্তু গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, মৃদুলকে সমর্থন করার জন্য যাওয়াটা একান্ত জরুরি। এবং ভাগ্যিস গিয়েছিলাম!

না, আমি আগেই বলেছি যে, মধ্যরাতের কোনো গপ্পো আমরা বাজারে খাওয়াতে চাই না। মধ্যরাত প্রত্যেক দল, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই থাকে। ও দিয়ে কিছু নির্ধারিত হবে না। বরং অনেক বড়ো কথা হল ওই অসুন্দর মধ্যরাত থেকে মৃদুল অনায়াসে ফিরে এসেছে আমাদের গভীর আন্তরিক উৎসবরাতিগুলিতে, যেগুলিতে সবসময়ই '...something in the air...'। আবার!

মৃদুলের পক্ষেই সম্ভব!

আমি মৃদুল দাশগুপ্তকে সমর্থন করি

সুবোধ সরকার

যা বলার আমি প্রথমেই বলে রাখি, মৃদুল দাশগুপ্ত আমার থেকে একশোগুণ ভালো লেখে। আমি তার একজন ভক্ত। আমি শুঁয়োপোকার মতো, পলাতক ও গোয়েন্দার মতো তার কবিতা অনুসরণ করে চলেছি। পঁয়ত্রিশ বছর।

আমি তখন কৃষ্ণনগরে। ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র।

সকাল এগারোটায় জয়ের গলা — সুবোধ, সুবোধ...

আমি বেরিয়ে এসে দেখলাম, প্যান্ট-শার্ট পরা ফর্সা মায়াবী জয়ের পাশে আর একজন, ছিপছিপে ধনুকের ছিলার মতো টানটান, সে এগিয়ে এসে বলল, বলো তো সুবোধ আমি কে? মৃদুলকে দেখেই মনে হল, গ্রাম দিয়ে যারা একদিন শহর ঘিরতে চেয়েছিল, ও তাদের স্বপ্ন এবং পাইপগান।

এই শুরু, এরপর আমরা কতবার শ্রীরামপুর, কতবার আমরা রানাঘাট, কতবার আমরা কৃষ্ণনগর। দেবদাসদার কবিতার বই *মৃৎশকট* ছাপা চলছে প্রেসে, আমি তার প্রিন্ট কপি চুরি করে নিয়ে এসে তিনজন মিলে রানাঘাটের রেললাইনে বসে একটার পর একটা কবিতা পড়ছি। এই সেই রানাঘাট স্টেশন, এই সেই কৃষ্ণনগর স্টেশন, যেখানে আমার আর জয়ের হিরণ্ময় ট্র্যানজিশন পড়ে আছে, আহা রে... তখন মোবাইল ছিল না, ছিল না যখন-তখন ক্যামেরা, ছবিগুলো তুলে রাখলে এখন অনেক দাম হত। আমাদের তিনজন রোগাকে বিটলস-এর মতো লাগত। জয় ছিল তখন আমার জীবনের এপিসেন্টার। মৃদুল আমার থেকে বছর তিনেকের বড়ো, এবং যখন আলাপ হল তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার হাত থেকে কবিতা কেড়ে নিয়ে *কৃত্তিবাস*-এ ছাপিয়েছেন, সেই কবিতার লাইন, 'ভারতবর্ষ থেকে ভারতবর্ষের দিকে পাখি উড়ে যায়' আমাদের মুখে-মুখে ঘুরছে, তখনও *জলপাইকাঠের এসরাজ* বেরোয়নি, ক-দিন বাদে যে-বই বেরিয়েই ইতিহাস হয়ে উঠবে।

মৃদুলের সঙ্গে আমার একটা মজার বৈপরীত্য আছে। মৃদুল প্রথমদিকের লেখালিখিতে একেবারে যেন শ্রীকাকুলাম থেকে ছুটে আসা আঠেরো বছর, আর আমি ছিলাম দুরূহ অবচেতনমুখী। কিন্তু গত কুড়ি বছর মৃদুল পালটে হয়ে গেল কুহকের সাধক, নৈঃশব্দ্যের রাজা, রান্নাঘর হয়ে উঠল তার নতুন ভুবন। আর আমি হয়ে উঠলাম রাগী, প্রতিবাদী, অর্থাৎ মৃদুলের ফেলে দেওয়া জামাটা পরে ঢুকে পড়লাম কলকাতায়।

আমি বলব, মৃদুল একটা কঠিন কাজ সেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে কাজটা হল, ঠান্ডা মাথায় কবিতাকে বাণিজ্য থেকে, হাততালি থেকে সরিয়ে নিজের মতো করে একটা রাস্তা তৈরি করে নিতে পেরেছে। এটা বলা সহজ, করে দেখানো অত সহজ নয়। মৃদুল করে দেখিয়েছে। সাহস লাগে, কলজের জোর লাগে। মৃদুল একজন বড়ো কবি, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, ঈর্ষা করি, এবং গোপনে ভালোবাসার কথা বলি। সোনা পাব বলে মৃদুলের লেখা পড়ি। সেই সোনার আভা আমার মুখেও এসে পড়ে। যাকে বলে রিফ্লেকটেড গ্লোরি।

কৃষ্ণনগর থেকে যে রেললাইন কালিনারায়ণপুর হয়ে কিছুটা বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ছে রানাঘাটে, যে রেললাইনে বসে আমরা একদিন কবিতা পড়েছিলাম পঁয়ত্রিশ বছর আগে, ও মৃদুল, একবারের জন্য, চলো গোধূলির আলোয় আমরা তিনজন একটা 'অ্যাকশান রিপ্লে' করে আসি।

মৃদুলতা

অমিতাভ গুপ্ত

মৃদুলতা, অর্থাৎ মৃদুল দাশগুপ্ত প্রবর্তিত 'ইজম্', অর্থাৎ 'মৃদুলিজম্' বলে কিছু সম্ভব হবে না কখনো। তার কারণ, মৃদুলই সেই অনন্য কবিব্যক্তিত্ব যে স্পষ্ট ঋজু নির্ভয় উচ্চারণে জানিয়েছে যে সে উত্তরআধুনিক। উত্তরআধুনিক চেতনা সম্পর্কে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞানগম্যি তার সাহায্যে বুঝেছি, উত্তরআধুনিক কবি কোনো 'ইজম্'-এর সংকীর্ণতায় আস্থা রাখেন না। তিনি অবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রকালের অনুরাগী। মনে পড়ছে, *বনানী* পত্রিকার দু-টি সংখ্যায় শতাধিক কবির সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল, মডার্নিজম-পোস্টমডার্নিজম-উত্তরআধুনিকতা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়েছিল। অনেকে অনেক পাণ্ডিত্যঝলমল মন্তব্য করেছিলেন, অনেকে সতর্ক এড়িয়ে গিয়েছিলেন প্রশ্নটিকে। মৃদুল, একমাত্র মৃদুল দাশগুপ্তই, একটি সরলবাক্যে শুধু ঘোষণা করেছিল — 'আমি উত্তরআধুনিক কবি'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রাগুক্ত শতাধিক কবিদের অনেকেরই কবিতা উত্তরআধুনিক বাংলা কবিতার দু-টি বাংলা ও দু-টি ইংরেজি সংস্করণে প্রকাশিত। চারটি সংকলনেই মৃদুলের কবিতা রয়েছে। একটির শুরুও মৃদুলের কবিতা দিয়েই। কিন্তু আরও অনেকের কবিতাই পড়েছি সংকলনচতুষ্টয়ে, ভূমিকায় ও নিবেদনাংশে অনেকের কবিতা বিস্তৃতভাবে আলোচিত। তবু মৃদুল, একমাত্র মৃদুল দাশগুপ্তই, জানাতে পারে যে সে উত্তরআধুনিক।

মৃদুলিজম্ প্রবর্তিত হওয়ার আরেকটি অসম্ভাব্যতা অবশ্যই মৃদুল দাশগুপ্তর অননুকরণীয় তুলনারহিত কাব্যশৈলী। সেকথা এখানে আলোচ্য নয়। সুস্নাত আমাকে ব্যক্তিস্মৃতি অবলম্বন করতেই বলেছেন। সুস্নাত সম্ভবত একটি ঐতিহাসিক কাজ করতে চলেছেন এই পত্রিকায়। মৃদুল সম্পর্কে অন্যান্য ব্যক্তিস্মৃতি পাঠ করার জন্য আমিও উন্মুখ। মৃদুল সম্পর্কে আমার ব্যক্তিস্মৃতি অবশ্য খুবই কম, যেহেতু তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত দেখাসাক্ষাতই খুব কম। আরও তবু, এইটুকু :

২। *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর প্রেস কপি আমাকে দিলেন গৌতম চৌধুরী, আদেশ করলেন একটি আলোচনা করে দিতে। উত্তেজিত, অভিভূত আমি যে গদ্যপ্রয়াসটি গৌতমকে দিলাম সেখানে মৃদুলের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে হয়তো অনেক উচ্ছ্বাস ছিল, কিন্তু সত্যও ছিল সম্পূর্ণ। গদ্যটি *অভিমান* পত্রিকায় প্রকাশ করলেন গৌতম।

৩। আমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনের ওই গৌরবটি, ওই গদ্যপ্রয়াসটি প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে, দু-একবছর পরেই হয়তো, মৃদুলকে প্রথম দেখি। কোনো-এক মধ্যদুপুরে, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে বেরিয়ে, হাঁটছি। উলটোদিক দিয়ে হেঁটে আসছিল রোগা লম্বা এক তরুণ। মুখোমুখি হতেই সে বলল, 'নিশীথ?' নিশীথ ভড় আমার পুরোনো বন্ধু, তার সঙ্গে চেহারার মিলও সে খুঁজে পেয়েছিল নিশ্চয়। অপ্রতিভ, জানাই, 'আমি নিশীথ নই। অমিতাভ।' সে জানায়, 'আমি মৃদুল।' প্ল্যানেটোরিয়াম ও অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের মাঝামাঝি জায়গায়, ঝকঝকে আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে, আমরা কিছুক্ষণ কথা বলেছিলাম।

৪। তারপর, কৃষ্ণনগরে। একটি বিদ্রোহী সভায়। আমি ও গৌতম বসু, অন্যান্য প্রিয়বন্ধুদের কোনো-কোনো সিদ্ধান্তে একমত হতে পারিনি বলে, মৃদুলের সঙ্গেও সেবার বুঝি একটু দূরত্ব ছিল।

৫। আবার অনেক বছর পরে ট্রেনে দেখা হল। অনেক গল্প হয়েছিল। স্বল্পভাষী মৃদুলও তার নিজের কথা একটু-আধটু বলল, যেমন, ওর স্ত্রী শিশুসন্তানটির জন্যে একদিন ওকে ২০০ থিন অ্যারোরুট বিস্কুট কিনতে পাঠিয়েছে। দোকানে গিয়ে মৃদুল গুনে-গুনে ২০০টি থিন অ্যারোরুট বিস্কুট নিয়ে এল। সে জানত না, '২০০' বিস্কুট মানে '২০০ গ্রাম' বিস্কুট।

৬। বইমেলায় দেখা হয় মৃদুলের সঙ্গে। অল্প কিছু কথা হয়। সাধারণত আর দেখা হয় না বিশেষ। এই দেখা ও না-দেখা মৃদুলকে ঘিরে-ঘিরে আমার অনেক শ্রদ্ধা অনেক ভালোবাসা অনেক শুভেচ্ছা। কয়েকবছর আগে মহিষাদলে সম্মান জানানো হল মৃদুলকে, একটি পুরস্কার দেওয়া হল। পুরস্কারটি ওর হাতে তুলে দিলাম আমি। মনে হল, আমি ধন্য হলাম।

৭। 'একেবারে একা হলে, কিনারায়, তারপর ভুলে গেলে তাকে... ভুলতে এখানে এলে, কিনারায়, চুপচাপ ঝাঁপ দাও তবে' (*নতুন কবিতা* / মৃদুল দাশগুপ্ত /২০০৮)।

দুই বাংলা ছুঁয়ে থাকা এক উড়ালসেতু

তুষার দাশ

১৯৮৬-৮৭। আমরা আড্ডা দেই শাহবাগ-এ। প্রতিদিন। প্রতিরাত। হঠাৎ একদিন জানা গেল কলকাতা থেকে এক কবি এসেছেন। তিনি আসবেন আমাদের আড্ডায়। সারা বাংলাদেশ থেকে কবিরা আসেন, আমাদের বয়েসিরা, এর চেয়ে তরুণরা — যোগাযোগের সহজ উপায় শাহবাগ। আজকের শাহবাগ দেখলে পঁয়ত্রিশ বছর আগের শাহবাগকে মেলানো যাবে না — বদলেরও সীমা-পরিসীমা থাকে। পরিচয় হল সাজ্জাদ শরিফের মাধ্যমে। মৃদুলের নাম তখনই শুনলাম। এর আগে জয় গোস্বামীর নাম শুনেছি — তাও সাজ্জাদের কারণে। তো, আমাদের খানিকটা আড্ডা হল। মৃদুলের স্বভাবে প্রথম যেটা আকর্ষণ করল, তা হল তার হাসি আর এরপর তার উড়ুক্কু স্বভাব।

কথার ফাঁকে-ফাঁকে মৃদুল মন্ত্রগুপ্তির মতো আমাদের কিছু নাম জানিয়ে দিল — কবিতার বই-এর আর কিছু স্বাপ্নিক পুরুষের, যাঁদের আমরা নতুন হিসেবে পেলাম আমাদের জীবনে। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, অরুণ মিত্র, ভাস্কর চক্রবর্তী, রণজিৎ দাশ, দেবদাস আচার্য, গৌতম চৌধুরী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্ত — সর্বোপরি বিনয় মজুমদার। আমরা পেয়ে গেলাম নতুন পথের দিশা। আমাদের কারো-কারো কবিতার বদল হয়ে গেল রাতারাতি। আন্ডার-গ্রাউন্ড রাজনীতি করার ফলে মিডিয়া-বিমুখ, প্রচারের বাইরে থেকে-যাওয়া অনেক লেখককে চোখের সামনে ধরিয়ে দিল মৃদুল, জাদুকরের মতো।

এরপর মৃদুলের হাত ধরে ঢাকায় এলেন কবি রণজিৎ দাশ, গৌতম চৌধুরী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা — এরা সবাই হয়ে উঠল আমাদের আত্মার অংশীদার। অরুণ মিত্রের মতো কবির সান্নিধ্যে, তাঁর স্ত্রী শান্তি মিত্রের স্পর্শে আমাদের আবেগ কবিতার জন্যে নতুনতর মাত্রা পেল।

মৃদুল এতেও ক্ষান্ত নয়। সুযোগ পেলেই কৃত্রিম সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করে সে চলে আসে বাংলাদেশে বৈধ পথে। উড়তে থাকে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস — আর তাঁদের পাশাপাশি বাংলাদেশে তার নিবিড় তরুণ পাঠক-কবিকুলকে নিয়ে। আমরা, ওর বন্ধুরা মাঝে-মধ্যে খেপে উঠি। কিন্তু ও হাসে — ওর মিশন তো আরও অনেক বড়ো! আমার বাংলা মটরের বাসায় সে নিয়ে আসে তার স্ত্রী মাধবী, বাবাকে আর রণজিৎদাকে। আড্ডা হয়। হইচই হয় — ঢাকার তরুণ কবিরা কেউ-কেউ আসে। ফরিদ কবির, সাজ্জাদ শরিফ সার্বক্ষণিক। আসে সিদ্ধার্থ হক, আফতাব আহমদ সহ আমার কবিবন্ধুরা। মৃদুল তার বাবাকে নিয়ে বরিশাল যায় তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে দেখাতে, নিজেও দেখে, রণজিৎ দাশকে তার বিক্রমপুরের মাটি দেখাতে নিয়ে যায় — আধুনিক রণজিৎদা চোখের জল নামিয়ে মাটি ভেজান।

নানাভাবে মৃদুলের পুণ্যার্জন চলতে থাকে। মৃদুল পশ্চিমবাংলার লেখকদের মজার-মজার সব ঘটনা বলে আর আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি। মৃদুলের হাতের তাসে নতুন-নতুন রং-বেরঙের ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু খেলা দেখার তখনও অনেক বাকি। জাদুকর মৃদুলের অনন্য সব দিশার নিশান।

মৃদুল এতদিন আমাদের নদী ও সাগর দেখিয়ে খুশি রেখেছে। আমরাও বিস্ময়ের ঘোরে থেকেছি। এরপর মৃদুল আমাদের ম্যাজিক দেখাল — ওর সর্বশেষ ম্যাজিক — *শত জলঝর্নার ধ্বনি*। পশ্চিমবাংলার সব তরুণ তুর্কিরা — প্রবীণও ছিলেন বেশ ক-জন — ওখানেই দেখলাম হাংরির, কিংবদন্তি শৈলেশ্বর ঘোষকে — সমস্ত প্রতিষ্ঠান-বিরোধী লেখককে — উত্তরবঙ্গ থেকেও তরুণ কবিরা এসেছিল — এসেছিল ছোটো কাগজের তীব্র সব সম্পাদকেরা — মহামিলনমেলা! সেই মেলা ভেলায় ভেসে আমরা পূত হলাম, হলাম পবিত্র। সেই 'শত জলঝর্নার ধ্বনি' শুনতে-শুনতে পরবর্তী দশকগুলো আমরা অনেকেই কাটিয়ে দিলাম। আমাদের একমাত্র গৌরব ওখানে আমরা ছিলাম — মহিষের পিঠে রাখাল বালক উঠে কবিতা সম্মেলনের উদ্বোধন — পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও হয়েছে কিনা আমি জানি না। জয় এসেছিল ওখানে কবিতা পড়তে। এ-নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা — সে একটি বিশেষ গ্রুপের পত্রিকাসমূহে লিখবেই — এ-কথা ঘোষণা দিয়ে জয় কবিতা পড়ল — আমি দেখলাম একদিকে একদল সৃষ্টিবান মানুষের লড়াই, অন্যদিকে তাদের মহামানবিক, মহাকাব্যিক সেই উদার্যের পরিচয়বাহী ঝান্ডা! বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক নতুন ইতিহাস বলে আমি মনে করি।

মৃদুলের সুবাদে, প্রসূনের হাত ধরে প্রেসিডেন্সির সিঁড়িতে আমি দেখি কিংবদন্তি উৎপলকুমার বসুকে, তার সঙ্গে আড্ডাও দিয়ে ফেলি খানিকটা, যাই কলকাতার এক হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা নতুন হতে থাকা প্রতিদিন আরেক মহামান্য কবিকে দেখতে — বিনয় মজুমদার যাঁর নাম। মৃদুল আমাকে নিয়ে যায় বহুবার আমাদের তরুণ বন্ধু অরুণ মিত্রকে দেখতে — তাঁর কুষ্টিয়া আবাসনের বাসায় — অরুণ মিত্রের সামনে গিয়ে নিজেকে বয়স্ক মনে হয় — তারুণ্য আর কাকে বলে?

এর সবই মৃদুলের কারণে। আমার জীবনের এইসব অর্থময় কারুকাজের পেছনে একজন কবির, একজন বন্ধুর এতটাই ভূমিকা। মৃদুল শুধু আমার বন্ধু হয়েই থাকেনি — একজন, অনন্য একজন হয়ে উঠেছে আমার পরিবারেও। আমার মা-বাবা-ভাইবোনদের সঙ্গেও তার চমৎকার এক যোগসূত্র অদ্যাবধি বহমান।

আমি নিজেকে বেশ অহংকারী ভাবি এ-কারণে যে মৃদুলের মতো কবি আমার ঢাকার বাংলা মটরের বাসায় বসে *রান্নাঘর* সিরিজের বেশ কয়েকটা কবিতা মুসাবিদা করেছে। মৃদুল আমাকে বন্ধু মনে করে — এ-ও এক গর্ব আমার। আর মৃদুলের সুবাদে আমি আমার ওখানকার আরও যেসব অগ্রজ-বন্ধুকে পেয়েছি, যাঁদের কবিতা আমাকে পথ চলতে শিখিয়েছে, যাঁদের কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে বারবার শিহরিত হয়েছি, আজও আমি যাঁদের কবিতা পড়ে আলোড়িত বোধ করি — তাঁদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার ক্ষেত্রে মৃদুল মহা-অনুঘটকের কাজ করেছে। আমাদের সেই বন্ধন আজও অটুট।

মাঝপথে কালীদাকে পেলাম। আমাদের প্রিয় কবি কালীকৃষ্ণ গুহ — সুবাদ মৃদুল ও গৌতম। কলকাতায় গেলে আমাদের সবার তুমুল আড্ডা হয় — বাংলাদেশে এলেও একই আড্ডা। মৃদুল কবিতার পাশাপাশি আমাকে গল্প শোনায়, ওর দেখা কবিতার রাজনীতির। আমাদের লেখালিখির রাজনীতির পাশাপাশি মৃদুল আমাকে জানায় পরবর্তী তরুণ কবিবন্ধুদের নামগুলো। তাদের বই পড়তে দেয়। শুরুতে যেমন উপহার দিয়েছিল অলোকরঞ্জনের *কাব্যসমগ্র* ১। এরপর রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর বই — বই তো শুধু নয় কবিতার বীজসমগ্র — *ব্রহ্মা ও পুঁতির মউরি*। মৃদুল আমাকে পরানসখার মতো নিয়ে চলে *ঘনকৃষ্ণ আলো*-র কবি একরাম আলিকে দেখাবে বলে। আমি ওর সাথে চলি আর দেখতে থাকি সেইসব আশ্চর্য মানুষগুলোকে — যাঁরা কিনা অসামান্য সব পঙ্‌ক্তি বিরচন করেছেন।

মৃদুল দাশগুপ্ত — আমার বন্ধু — যার আরেক অসামান্য গুণ হল — ক্রমাগত ছড়া আর চিঠি লিখে চলা। ফোনে একটাই বাক্য তার — 'ওরে ও তুষার, চিরতুষার! চলে আয় — চলে আয়!' মনে হয় সেই সুদূরের কোনো এক আহ্বান। নানা কারণে সেই আহ্বান গত ছ-মাস শুনেও রক্ষা করতে পারছি না। হয়তো হবে শিগগিরই — আবার আমাদের ধুম আড্ডা হবে — কালীদা রণজিৎদা গৌতম প্রসূন একরাম মৃদুল প্রবুদ্ধ — আমরা তখন আবারও বুঁদ হব আড্ডায় — আবারও নতুন করে কাউকে চিনিয়ে দেবে মৃদুল কিংবা গৌতম বা রণজিৎদা। *জলপাইকাঠের এসরাজ* বাজাতে-বাজাতে মৃদুল এসেছিল এই বাংলায় — বলেছিল এখানকার বরিশাল তার মূল আর পশ্চিমবাংলার কোণে-কোণে লুকিয়ে থাকা মূল-উপড়ানো কিছু বরিশালের মানুষের সঙ্গেও সে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল — সেই সুবাদে ড. প্রশান্ত দাশগুপ্ত ঢাকায় এলেন — এল সৌম্য — তাদের পরিবার — প্রশান্তবাবু তাঁর পৈত্রিক ভিটে দেখে কাঁদলেন বরিশাল গিয়ে — সৌম্যর সঙ্গে বরিশালের 'শঙ্খ ঘোষ' দেখা হল — এর সব, সবই মৃদুলের কারণে।

মৃদুলকে একবার বললাম — আমি জয় গোস্বামীকে দেখব। মৃদুল নির্বিকার চিত্তে আমাকে নিয়ে চলল কলকাতা থেকে ট্রেনে বহুদূরে। জয় তখন রানাঘাটের বাড়িতে। গিয়ে বিকেল শুরুর এক সময়ে দেখি — খালিগায়ে জয় একটা শাড়িকে লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে বসে আছে। নতুন আমাকে দেখেও ওর কোনো বিকার নেই। মৃদুল পরিচয় করিয়ে দিতেই বলল — 'ও, সেই *উন্মাদ*-এর তুষার! কবিতাটা আমার খুব ভালো লেগেছে।' আমি প্রায় বিদ্যুতের শক খাবার মতো চমকে গেলাম। জয় আমার কবিতাও পড়ে — মনেও রাখে! দারুণ ব্যাপার — এর সবই মৃদুলের কারণে। তারপর আমাদের কত আড্ডা সেদিন — কত কথা — জয় মুখস্থ শোনায় শঙ্খ ঘোষের গদ্য — পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা — আশ্চর্য সব কাণ্ড।

১৯৮৭-র শেষের দিকে, ডিসেম্বরে আমি আমাদের দেশ স্বাধীন হবার প্রায় ১৬ বছর পর দ্বিতীয়বার কলকাতা যাই। মৃদুল তখন আমার গাইড। বললাম, একটু পশ্চিমবাংলার গ্রাম দেখাবি না! মৃদুল আমাকে নিয়ে চলে তারাশঙ্করের চাঁপাডাঙা — এখন আর তারাশঙ্করের চাঁপাডাঙা বলি না — বলি, বিশ্বনাথ গরাই-এর চাঁপাডাঙা! আমার বন্ধু বিশ্বনাথ গরাই — তা-ও মৃদুলেরই কারণে। সারাটা দুপুর-বিকেল-সন্ধে কাটিয়ে বিশ্বনাথদের এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে — আড্ডার পর আড্ডা-শেষে কলকাতায় ফেরা।

কলকাতার এক বনেদি ব্রাহ্মণ-পরিবার দেখার ইচ্ছে হল — তাদের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা দেখব — মৃদুল সকাল-সকাল (মৃদুল কিন্তু খুব দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে!) আমাকে নিয়ে চলল তার একসময়ের সহকর্মী সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। আমার সঙ্গে রোববার সকালে পাত্র চড়ালে বউদি কিছু মনে করবেন না তো? এমন প্রশ্নে সতীনাথদা জানান — আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন, আপনার বউদি কিন্তু এখুনি ভাগ বসাতে আসবেন! দ্রুত শুরু করুন। বউদি এলেন — আমাদের আড্ডায় বসলেন — জমে গেলেন — দুপুরে পেট ভরে খাওয়ালেন — চা খাইয়ে তবেই বিদায় — এর সবই মৃদুলের জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

জলপাইকাঠের এসরাজ-এ মৃদুলের যে সারল্যের গান আমরা শুনেছি — সংহত *এভাবে কাঁদে না*-র পরিধিকে মৃদুল মহামানবিকতা ও আদিম সভ্যতার স্বপ্নলগ্ন করে *রান্নাঘর* সিরিজ থেকে *সোনার বুদ্বুদ* ও *ধানখেত থেকে* অবধি সেই সারল্যকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায় — আপাতসরল মৃদুলের সেইসব উচ্চারণ গভীর মন্ত্রগুপ্তির, আশ্চর্য যূথবদ্ধতার আবার পাশাপাশি একান্ত ও আপনার। মৃদুলের কবিতায় বেদনাও ফুর্তি পায় আবার আনন্দও হয়ে ওঠে যথেচ্ছাচারী — মাটি বা নভোমণ্ডল মৃদুলের নখের পিঠের মতোই যেন চেনা। আর তাই তার কবিতাও মাটি থেকে উড়ে চলে নভোমণ্ডলে আবার নেমে আসে মাটিতে — যেন এক বিশাল উড়ালসেতু!

স্বপ্নে পাওয়া বই

দেবারতি মিত্র

জলপাইকাঠের এসরাজ বইটি মৃদুল দাশগুপ্ত আমাকে 'শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়' উপহার দেন ১৯৮০ সালে, বই-এর প্রকাশকালও ওই একই সময়ে। আজ ২০১২-তে *জলপাইকাঠের এসরাজ* পড়তে গিয়ে দেখছি বইটির সজীবতা একতিলও কমেনি। একজন পঁচিশ বছরের তরুণ কবির কবিতার বই পড়ে সেদিন শুধু মুগ্ধ নয়, অবাকও হয়েছিলাম। প্রচলিত সাহিত্যিক প্রথা ভেঙে এখানে সূর্যোদয়ের একটি চমৎকার বর্ণনা —

> স্ফটিকের একটি গেলাস ভরা লাল মদ পাহাড় চুড়োয় রাখা
> আর, অন্য পতাকার মাংস উড়ছে আকাশে,
>
> *সূর্যোদয়*

সূর্য যেন গ্লাসভর্তি লাল মদ আর ইতস্তত মেঘ মাংস — আকাশ ও প্রকৃতি মানুষের চোখের জন্য এক অভূতপূর্ব ভোজের আয়োজন করে রেখেছে — মানুষ তার স্বাদ পেয়ে আনন্দিত হবে, তৃপ্ত হবে। এই চিত্রকল্পটি অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। ফুল প্রভৃতি কবিতার চিরাচরিত উপকরণ সম্বন্ধেও কবির দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে বিপরীত মেরুর —

> এই দেশে ক্যামেরা-লাঞ্ছিতা হতে ফুল ফোটে হর্টিকালচারে;
> ফুল অর্থে মূর্খতা মাখানো সেই কাব্য, গীতবিতানের উড়ু-উড়ু
> অক্ষর-মৌমাছি;
> শুধু এই নয়, আরো কিছু ফাঁদ পাতা ভুবনের এই অংশে, তিনদিকে
> সমুদ্র-কল্লোল;
> শুধু এইটুকু পেয়ে ছোকরা কবিটি কি পুরোপুরি নষ্ট হবে?
> ধ্যাৎ, তা কি হয়!
>
> *ফুলের বিরুদ্ধে*

মৃদুল চান, মফস্‌সলের যুবক কবি যেন বাংলা কবিতার চর্বিত-চর্বণের রাজ্য ছেড়ে তাঁর কবিত্বের একটি মজবুত, খাঁটি, রুক্ষ জমি খুঁজে পান — ফুলের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই — গতানুগতিকতার ফাঁদে পা দেওয়ার ব্যাপারেই নিজের প্রতি তাঁর এই সতর্কতা।

তাঁর আত্মকথামূলক কবিতা *সমুদ্রগুপ্ত এবং তার বীণা* অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের মহলে খুব প্রিয় হয়েছিল। তরুণ-তরুণীদের মুখে-মুখে ফিরত — 'কবে যে আপেল গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মরে যাব ভাবি'। সত্যিই এই লাইনটির সূক্ষ্ম, অভাবিত ব্যঞ্জনা পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে মুগ্ধ করে। না-বোঝা, কেমন এক বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই যখন মনে এই কবিতাটির আরম্ভের সেই অনিশ্চয়তা —

> ছড়িয়েছি, কিন্তু শিকড়হীন; মা বলেন শান্তি পাবি না;
> ছড়িয়েছি, মৃদুল এই মীনরাশি ভয়ংকর জলে; স্রোতে গাঢ়

এই পরিণতিহীন, সামনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন, এক অগাধ স্বেচ্ছাচারের পথ ধরে জীবনের চলে যাওয়া। এখানে কবির কোনো হাত নেই, শিল্প-উন্মাদনায় জর্জরিত কবির মনে হয়, নিজেকে আরও বিশদ খুলে ফেলি, বাতাসে ছড়াই, জলে ছড়াই এই পাপী শরীরের লোহা। নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বীণার মতো বাজাবার একমুখী আকাঙ্ক্ষা এই কবির।

২০৭০ এর তরুণ কবিকে-র কল্পনা-যাত্রা শুরু হয়েছে নিরুদ্দেশের দিকে। এই কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত রহস্যময় প্রবাহ চমৎকৃত করে —

> তুমি বললে 'যাবো না তোদের সঙ্গে, তারারা তো এতদিনে বুড়ি হয়েছেন'
> তৎক্ষণাৎ কাঁটাঝোপ টপকে যাচ্ছে একসঙ্গে তিন হাজার নীল জেব্রা —
> জেব্রাগুলি চলে যেতে চাঁদের আলোয় বালি, স্ফিংসশুদ্ধু উঁচু পিরামিড,
> মুহূর্তে তোমার পেল প্রস্রাব ও জলতৃষ্ণা একসঙ্গে,...

উদ্ধৃতি হয়তো দীর্ঘ হল, কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না।

জলপাইকাঠের এসরাজ একটি স্বপ্নে পাওয়া বই, যেমন ভূতে পাওয়া মানুষ আর কি! জলপাইকাঠের এসরাজ কি কোনো মেয়ের সঙ্গে অভিন্ন, তাই কবি একটি অপরূপ উপমায় প্রকাশ করেছেন তাঁর তন্ময়তা?

> ও কি ফুল? বুনো ফুল, গোলাপি পাপড়িময় চাবুকের দাগ
> আমরা কি চলে যাবো? কখনো দেবো না ওকে পুরুষ-পরাগ?

বিবাহ-প্রস্তাব কবিতার মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ ও উতরোল ছন্দের দোলা মনকে স্মিত হাসিতে ভরে দেয় —

> বাড়িটি থাকবে নদীর কিনারে, চৌকো,
> থাকবে শ্যাওলা রাঙানো একটি নৌকো,
> ফিরে এসে খুব আলতো ডাকবো, বউ কই...
> রাজি?

কিন্তু শুধু মধুর কবিতা নয়, সত্তর দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্যোগের ঝড়ঝাপটও ওলটপালট করে দিয়েছে এই কবিকে, তাঁর লেখায় সেসবের চিহ্ন সুস্পষ্ট —

> ধরো, সেদিনও এমনই রাত জালিয়ানওয়ালাবাগে
> ডায়ারের বন্দুক নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে
> দ্রোণাচার্য ঘোষ!
> ভাবো, ভাবো সেদিনের উৎসব! বরানগরের গঙ্গার জল থেকে
> আবার এসেছে উঠে
> তিনশো তরুণ

অতীতের অন্যায়ের প্রতিকার-স্রোত বর্তমান কালেও গড়িয়ে এসেছে, ভবিষ্যতেও এর শেষ হবে না। কবি মৃদুল দাশগুপ্ত অনায়াসে মিশিয়েছেন সূর্য সেন, সিধু-কানহু, চাঁদ ও ভৈরব, মঙ্গল পাঁড়ের সঙ্গে পরবর্তীকালের তরুণদের মরণান্তিক অভিযানকে। কবিতার নাম *আগামী*। দেশভাগের কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘুরে-ঘুরে আসে মৃদুলের কবিতায়। তাঁদের মাতৃভূমি পুববাংলার বরিশালের গৈলা গ্রাম থেকে এপারে আসবার সময় সীমান্তে তাঁর ঠাকুমাকে বুটের লাথি মেরে থালা-বাসন পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল — 'শুধু বেঁচে গিয়েছিলো পেতলের কেষ্ট ঠাকুর — তাঁর হাতে বাঁশি ছিলো, ছিলো না বন্দুক।' বেদনায়, ব্যঞ্জনায় অপূর্ব লাইন দু-টি।

প্রেমের কবিতা
মৃদুল
দাশগুপ্ত

জলপাইকাঠের এসরাজ-এর কবিতাগুলির কিছু-কিছু চিত্রকল্প ও অনুষঙ্গ আমাদের মাঝে-মাঝে বেশ অচেনা মনে হয় —

অস্ত্রনালীতে আজ লুকিয়ে এনেছি হীরা, তোমাদের দেশে,
আমাকে ফেরাবে
আমার সবুজ টুপি জঙ্গলে পড়ে আছে পাথরের নিচে
মেরো না আমাকে

ক্লাউন

অ্যান্তোটুকু শ্লেজগাড়ি যাবার মতন পথ, সরু কাঁপা কাঁপা
হাওয়াবাতাসের অনেক আঙুল, হাত, শীতে পাওয়া চাঁদ;
দূরে, পিছনে মাঠের মধ্যে নিচু হ'য়ে ওড়ে ঐ কবেকার লুসির লণ্ঠন;

যাই

কতক্ষণ আলো জ্বলতো হেনাদির ঘরে?
হায়, আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

তখন এ পৃথিবীতে নির্ঘাত জীবিত ছিলো দুটি একটি ব্রন্টোসোরাস
ভোরবেলা তাদের অদ্ভুত আঁশ পাওয়া যেত বাগানে বাগানে

হেনাদির জন্যে পদ্য

এসব কার কথা, কোথাকার কথা, কবেকার কথা ভাবতে-ভাবতে মন চলে যায় দূর থেকে দূরান্তরে। *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর একেবারে অন্যধরনের সুর আমাদের বিহ্বল করে।

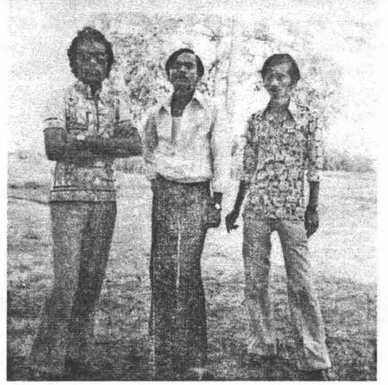
মৃদুলের কবিতায় মাতৃভূমির উপর, মানুষের উপর তাঁর একটা নাড়ির টান, একটা ভালোবাসা ফুটে ওঠে, এটা তাঁর কবিতার সম্পদ। এ আকর্ষণ তাঁর জন্মগত, যে তাঁর সংস্পর্শে আসে, তার মধ্যেই এই ভালোবাসা চারিয়ে যায়, অথচ মৃদুলের কবিতাগুলি প্রচারধর্মী নয়, মোটা দাগের নয়। রোদ্দুরে ত্রসরেণুর মতো, হাওয়ায় হালকা বৃষ্টিকণার মতো ভেসে বেড়ায় — তাঁর চারপাশের জীবনের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ।

গ্রাম চাঁপাডাঙা, মৃদুল ও আমি

বিশ্বনাথ গরাই

ঘটনাস্থল : শ্রীরামপুর স্টেশন, এক-দুই প্ল্যাটফর্মের নির্জন দক্ষিণপ্রান্ত। সময় : মধ্য-সত্তরের শীতসন্ধ্যা।' কুশীলব : সদ্যযুবক চাঁপাডাঙার কয়েকজন, অবশ্যই কবিতাপাগল। কবিতা নয়, আজ মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর গল্প পড়বেন। মৃদুল তখন যথারীতি তারকা, কবিতার জগতে তাঁর নিজ মনোভূম, অত কম সময়েই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন, আমাদের কাছে রীতিমতো আদৃত — তার খ্যাপামি নিয়ে, যথেচ্ছাচার নিয়ে, হঠাৎ-হঠাৎ উধাও হওয়া নিয়ে — এখানে-ওখানে, যত্রতত্র, খেয়ালখুশিমতো। তো, সেদিন সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ প্ল্যাটফর্মে বসে পড়েছি আমরা ক-জন — মৃদুল লাজুক হেসে শুরু করল তার গদ্য পড়া, গল্প পড়া, 'পিপি' নামক এক তরুণীকে নিয়ে তার শিকড়সমৃদ্ধ কল্পনায় ডানাবিস্তৃতির উপাখ্যান। আমরা শুনতে পেলাম, 'আমি' নামক চরিত্রটি হড়হড় করে উগরে দিচ্ছে বমি — বমির সঙ্গে বেরিয়ে এল এক তরুণী — বমির ওপর সাঁতার কাটছে পিপি — তারপর এক পরমাশ্চর্য রহস্যঘন কথোপকথন। আমরা তাতেই সুরাহীন নেশাতুর : অসামান্য মনে হয়েছিল সেই বিরচনা।

অনেকেই জানেন না, *জলপাইকাঠের এসরাজ* নয় — মৃদুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *আমি আর পিপি* — একটি কৃশতনু গল্পগ্রন্থ। আমাদের ভীষণ ভালোলাগার এক গ্রন্থ। তারপর মৃদুল (সম্প্রতি একটি / দু-টি গল্প হয়তো লিখেছে) আর ও-পথ সেভাবে মাড়ায়নি — কেন, জানি না। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, গল্প লিখলে মৃদুলের হাত দিয়ে বাংলা গদ্য অসামান্য কিছু অন্যধরনের কাহিনি ইতোমধ্যেই পেতে পারত। এরপর তো *জলপাইকাঠের এসরাজ* : ১৯৮০। কত না কাহিনি লুকিয়ে আছে সেখানেও — ছত্রে-ছত্রে, অক্ষরে-অক্ষরে!



দুই বন্ধু বাবলু সাহা ও বিশ্বনাথ গরাই-এর সঙ্গে; চাঁপাডাঙা, ১৯৭৪

মৃদুলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার শুরু সত্তরের প্রায় প্রথম দিকে। ইতোমধ্যে *কৃত্তিবাস*-এ ওর একগুচ্ছ কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধতায় টালমাটাল: *সূর্যবন্দনা*, *মুক্ত মানুষের পদ্য*, *ফুলের বিরুদ্ধে* ও *আগামী*। *সূর্যবন্দনা*, আমার বিশ্বাস, অত কম বয়সে লেখা এক ঈর্ষণীয় প্রেমের কবিতা ('তাপসী ওষ্ঠ ছোঁয়ালো কবির ঠোঁটে। মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ চুম্বনের জন্য' পড়ে আমাদের প্রেমিক মনও কি কাতর হয়ে উঠেনি?), *মুক্ত মানুষের পদ্য*, *ফুলের বিরুদ্ধে* ও *আগামী*-তে মৃদুল প্রচণ্ড সমসাময়িক, সামাজিক, বিদ্রোহী, অভিমানী ও রাগি এক যুবক। তখনই ঠিক করে নিই মৃদুলের সঙ্গে আলাপিত হতে হবে। সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল আমাদের চাঁপাডাঙা থেকে প্রকাশিতব্য *বনভূমি* কাগজটি। আমাদের কবিতাপাগল এক বন্ধু, সে তখন শ্রীরামপুর কলেজের থার্ড ইয়ার, ছুটল মৃদুলের বাড়ি — ফিরে এল মৃদুলের কবিতা ও *বাইসন*-সহ কয়েকটি লিটলম্যাগ নিয়ে (*বাইসন* মৃদুলেরই সম্পাদিত)।

এরপর এক বেহিসেবি, নিয়মবিরুদ্ধ পথ চলা আমাদের। প্রায়ই, মাসে দু-তিন বার অন্তত, মৃদুল চলে আসত চাঁপাডাঙায়। এখানকার তরুণদের সঙ্গে, মানুষজনের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশত সে। আমিও, কখনো একা অথবা *বনভূমি*-র দলবলসহ চলে যেতাম শ্রীরামপুর। সে-সময় *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর কবিতাগুলো লেখা হচ্ছে, আমরা পড়ছি, শুনছি ওর মুখ থেকে, আর পুলকিত হচ্ছি। আমি জানতাম, সে-সময় এবং পরবর্তীকালেও মৃদুলের অন্তর্লোকে বয়ে গেছে কী নিদারুণ চোরাস্রোত, একাকী তরঙ্গ। *জলপাইকাঠের এসরাজ* প্রকাশিত হল — বাংলা কবিতা পেল এক প্রকৃত কবিকে। মনে আছে, মৃদুলের চাঁপাডাঙা ছুটে আসা — লাজুক মুখে কাব্যগ্রন্থ নিয়ে দাঁড়ানো — চাঁপাডাঙায় বন্ধুদের হাতে বই তুলে দেওয়া। বাংলা কবিতা বুঝে নিয়েছিল তার 'জাত'।

এরপর তো মৃদুলের বাড়িতে কত রাত যে কাটিয়েছি। মাসিমা যে কত স্নেহশীলা ছিলেন! কত অত্যাচার যে তিনি সহ্য করেছেন, তা ভাবলে এখন এই পরিণত বয়সে লজ্জিত হই। যখন-তখন চলে যেতাম আমরা, চাঁপাডাঙার বন্ধুরা, দুপুরে বা রাত্রে — খেতাম, বসতাম, শুতাম। আড্ডার সময় ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসত। অথচ একটা দিনের জন্যেও তাঁর বিরক্তি চোখে পড়েনি। শ্রীরামপুর বেশ

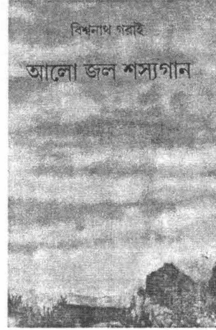
প্রাচীন ও সংস্কৃতিসম্পন্ন শহর। মৃদুলের পক্ষে, কলকাতা হাতের নাগালে যেহেতু, যা স্বাভাবিক ছিল, সম্পূর্ণ নাগরিক' হওয়া — তা কিন্তু সে হয়নি। এখনও। কর্মসূত্রে সে শহরগামী, কিন্তু সে গ্রামীণ, শ্রীরামপুর নামক গ্রামটির। আমার সঙ্গে সাইকেলে, পায়ে হেঁটে চাঁপাডাঙা নামক হুগলির এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সে ঘুরেছে, কৃষিকাজ দেখেছে, পুকুরে সাঁতার কেটেছে — তারপর দূরপাল্লার বাস ধরে আমরা গেছি বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া বা বীরভূম। একদিন নয়, দিনের পর দিন। আসলে, আমার মনে হয়, ও কোনোদিন শহুরে নয়। তাই যখন জীবন ওকে বাধ্য করেছিল, কিছুকাল আগে, বরা...রে বাসা নিতে, তখন ও হাঁপিয়ে উঠেছিল — অসুস্থতা গ্রাস করেছিল ওকে। প্রতি সপ্তাহে অফ ডে-তে সে চলে আসত শ্রীরামপুর। এখনও থিতু হয়েছে স্বভূমে — সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহে — বোধহয় প্রাণের স্ফূর্তিও ফিরে পেয়েছে।

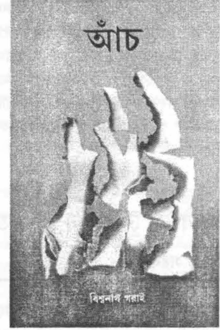
সাংবাদিক হিসেবে মৃদুলের আত্মপ্রকাশ সত্তরের শেষদিকে। *পরিবর্তন* নামক এক মাসিকপত্রে। তখন ওকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের অফিসে যেতে হত। আমি ওর অফিসের পাশেই বিএড কলেজে তখন পড়তাম। ফলে, সেখানেও দুপুরে প্রায়ই ওর কাছে চলে যেতাম। পরবর্তীকালে *যুগান্তর* হয়ে এখন সে *আজকাল*-এ। *পরিবর্তন* থেকেই ওর সংবাদ-পরিবেশনায় এক জিজ্ঞাসু মানসিকতার, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা যেত। বিশেষত সেই সময় ওর একটি প্রতিবেদন, তারকেশ্বর এস্টেট ও তার কর্মচারিদের নিয়ে, যেকোনো পরিসংখ্যানবিদকেও হার মানাতে পারে। এছাড়া দৈনিক সংবাদপত্রে যখনি সে লিখেছে, বাংলাদেশের ভোটপর্বই হোক বা অন্য কোনো বিষয়ে, সে যে একজন দুঁদে, ক্ষুরধারমস্তিষ্ক সাংবাদিক, তা অলক্ষ্যণীয় থাকত না। সে যে এক বড়ো মাপের কবি, তা বুঝতে পারা যায় না এসব প্রতিবেদন-পাঠে। এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য, শাখা থেকে শাখান্তরে অনায়াস বিচরণক্ষমতা।

মৃদুল আনখশির কবি, বলা নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বুঝেছি, কবিতা নিয়ে তার চিন্তাভাবনা, বিশ্লেষণ এবং বিচারক্ষমতা সংশয়াতীতভাবে ব্যতিক্রমী। গরিষ্ঠাংশ কবিকে দেখেছি নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় নিরত হতে — মৃদুলকে কিন্তু কখনোই নয়। অন্যের লেখা সম্বন্ধে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। উত্তরসূরিদের লেখা সে খুঁটিয়ে পড়ে, এবং নিজস্ব মতামত জানাতে সে দ্বিধাবোধ করে না। পরবর্তীকালে দেখেছি, তার মূল্যায়ন যথার্থই নির্ভুল। কবিতা এত ভালো বোঝে ও!

যে-কথা বলা হয়নি এখনও। তার অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আমার নিজস্ব অনুভূতির কথা। মৃদুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *এভাবে কাঁদে না* সম্পূর্ণ অন্যমাত্রিক। একদিন সে জানায়, এখন আমার সমস্ত কবিতাই চার লাইনের। আমাদের চাঁপাডাঙা ব্রিজের নিচে বসে পড়ে শোনায় কয়েকটি কবিতা, সম্পূর্ণ অন্যধরনের সেসব কবিতা। ওই বয়সে অত শব্দসংযত আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী না হলে অসম্ভব! ফলে আমরা পেয়েছি অসামান্য কিছু কবিতা — তাদের স্মরণযোগ্য লাইন। এখানে-ওখানে সেগুলির উদ্ধৃতি দেখলে ভীষণ খুশি হই আজ। আসলে, এই কবিতাগুলি রচনার সময় মৃদুলের যে যন্ত্রণা ও বিষাদ এবং তজ্জনিত রক্তক্ষরণ, তা ফুটে উঠেছিল ছত্রে-ছত্রে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেই তা অনুভব করবেন। সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, মৃদুল নিজেকে ভাঙছে, কবিতাকে ভাঙছে, ছন্দ-মাত্রায় চুরচুর হয়ে পাঠককে অন্য দিগন্তে ঠেলে দিতে চাইছে। এরপর তো আরও-আরও পর্বান্তর — ঐন্দ্রজালিকতা — *গোপনে হিংসার কথা বলি* থেকে সেদিনের *সোনার বুদ্বুদ*।

মৃদুলের কবিতায় প্রেম এক প্রধান চালিকাশক্তি। আসলে সে জন্ম-রোমান্টিক। তার প্রথম-জীবনের কবিতায় এই নিবেদন সরাসরি, প্রত্যক্ষ ও তীব্র জ্যোতির্ময়। আমরা যেন প্রত্যক্ষ করি এক মৃন্ময়ীকে যার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলছেন কবি — কত কাছে সেই নারী, অথচ কত না সুদূর! এই কবিই কালান্তরে কত না স্থিতধী! মৃদু উচ্চারণে স্থাপন করতে চাইছেন অধিকারবোধ — অধিকারী হয়েও তিনি অপূর্ণতায় অস্থির — তীব্র আলো-আঁধারির ভিতর তাঁর নির্জন কথনে আমরা





প্রচ্ছদশিল্পী মৃদুল দাশগুপ্ত

সম্পৃক্ত হই — এভাবে আমরাও কি খুলে দিতে চাই না প্রিয় নারীটির কাছে আমাদের অন্তর্লীন নির্ঝরিণীর মোহিনী স্রোতাপন্নতা! সেখানে কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি নেই, আছে এক নিরবচ্ছিন্ন স্নিগ্ধ প্রসন্নতা, মেধাবী যন্ত্রণাপ্রসূত নিঃসঙ্গতা ও অন্তরীক্ষ থেকে উড়ে আসা বাতাসের হাতছানি। মৃদুল এভাবে কতবার যে আমাদের ঠেলে দিয়েছেন আশ্চর্য কুহকে — আমরা কতবারই না রহস্যজারিত হয়ে পৌঁছে গেছি সুন্দরের কাছে!

কিছুদিন আগে (জুলাই ২০১২) দ্য *টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া*-এ একটি ইন্টারভিউ-এ মৃদুল জানিয়েছে — 'I am completely a product of little magazines'; আর সেজন্যই ওকে স্যালুট জানাতে ইচ্ছে হয়। যদ্দুর জানি, আমন্ত্রিত হলেও বাণিজ্যিক কাগজে, বহুকাল হল, সে আর লেখে না, লিখতে চায় না। এখন তো প্রচারসর্বস্ব যুগ। মৃদুল সেভাবে প্রচার পায়নি — তোয়াক্কাও করে না সে। তথাপি বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ, তাকে এবছর *রবীন্দ্র পুরস্কার* দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। তার এই পুরস্কারপ্রাপ্তিতে কবিতাপ্রেমিক মাত্রেই খুশি হয়েছেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

একদিন শ্রীরামপুরে গলিপথে হাঁটতে-হাঁটতে মৃদুল বলেছিল, কবিতার কাছে নিজেকে সৎ রাখতে হয়। নইলে কবিতার কাছ থেকে কখন যে সরে যাব, কখন যে কলম বন্ধ হয়ে যাবে, নিজেই জানতে পারব না। — একজন কবির এই আত্মিক উপলব্ধি আমাকে ভীষণ স্পর্শ করেছিল। কবিতার প্রতি তার এই সততা আমরা লক্ষ করি তার কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্রে বাছবিচারে, ক্রমাগত দিকপরিবর্তনে, নতুন ভাষা-অনুসন্ধানের প্রয়াসে ও প্রাত্যহিক দিনযাপনের খুঁটিনাটিকেও আয়ত্ত করার মাধ্যমে। তার কবিতায় সমাজচেতনা ও ইতিহাসচেতনাও বারবার ফুটে ওঠে। অতিপ্রজ এই কবির দেশে অঙ্গুলিমেয় তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও দু-টি গদ্যগ্রন্থ দেখলেই বোঝা যায়, সে কতখানি চেতন, জনপ্রিয়তা অর্জনে সে কতখানি ভ্রূক্ষেপহীন — সে অতিপ্রসূ নয়, অতিযত্নবান, নির্মম অথচ সংবেদী।

তাই তার প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতা দাবি করে। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই তার পর্বান্তর — নিঃশব্দ পালাবদল। *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর কবিকে *এভাবে কাঁদে না*-তে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একইভাবে *গোপনে হিংসার কথা বলি*-র কবিকে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে খুঁজতে চাওয়া এক দুস্তর নিষ্ফল পরিক্রমা। আমার বিশ্বাস, বাংলা কবিতায় প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে এত ভিন্ন নবীনতা, তারুণ্য ও সবুজতা এর আগে দেখা যায়নি। এক মহান রহস্যের দিকে তার যাত্রাপথ। সবচেয়ে বড়ো কথা, মৃদুলকে এখন মনে হয় এই বিশাল ভাববিশ্বে এক অনন্ত সৌন্দর্যসন্ধানী অভিযাত্রী। নদীর বাঁক আছে বলেই নদী এত সুন্দর, দৃষ্টিনন্দন এবং রসিক দ্রষ্টার কাছে পাঠ্যও বটে! মৃদুলের কবিজীবনও এক অনুপম বহতা নদী — তার প্রতিটি

কাব্যগ্রন্থে এত অদৃষ্টপূর্ব বাঁক যে শিক্ষিত পাঠক আবিষ্ট না হয়ে পারেন না। মৃদুল কবিতা লেখে শব্দ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। তাই তার কবিতার পর্বান্তরকে বুঝতে গেলে মননের অনুশাসন, গভীর বোধ ও শব্দকে আত্মস্থ করার মতো শিক্ষা প্রয়োজন। প্রকৃত পাঠক নিজেকে ক্রমান্বয়ে দীক্ষিত করে তোলেন, তাই মৃদুল বাংলা কবিতার নতুন ধানশীষ — প্রতিটি বছর তার নবীন উদ্‌গম, শিশিরস্নান — পাঠকের আঙিনায় ধান হয়ে জেগে-থাকা। তার অনিঃশেষ লাবণ্য ছুঁয়ে থাকে সারা বাংলা কবিতা সমগ্র।

ট্রিবিউট টু ওয়ান, হু ইজ ইন ফার্স্ট বেঞ্চ

সুব্রত সরকার

আমি যতদিনে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে এসে পৌঁছোতে পেরেছিলাম, মৃদুলের কবিতার সৌরভ ততদিনে সারা বাংলায়। এই সেই কফিহাউস, যেখানে এসে শুনলাম — সত্তর দশকের কবি বলে এক বিশেষ শ্রেণি আছে। আর মৃদুল সেই ক্লাসের প্রথম বেঞ্চের ছাত্র। ঈর্ষা কি হয়নি? হয়েছিল তো। এখন লিখতে বসে এই প্রৌঢ় বয়সে একটু সুখের-শীত করে ওঠে শরীরে। যেন ইলিশমাছ খাবার সময় জিভে সূক্ষ্ম কাঁটা বিঁধে যাবার যন্ত্রণা, যা আবার আনন্দকেও নির্বাসন দিতে পারছে না। কারণ ওই মাছের স্বাদ, তার কি তুলনা হয়? মৃদুলের লেখা পড়ে তখন আমার ওইরকম অনুভূতি হত, স্পষ্ট মনে আছে।

সৌমিত্র মিত্র, একবার বিদ্রূপ করে বলেছিল — তুমি আর বড়ো হলে না। বামনই থেকে গেলে। তোমার বন্ধুরা। তোমার থেকে পরে লিখতে আসা ছোটোরা, সকলেই বাংলা কবিতার এক-একটা জায়ান্ট। সত্যিই তো। না পারলে তো লোকে বলবেই। আমি পারিনি। তাই ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন কয়েকটি শুকিয়ে-আসা নক্ষত্র দেখতে পাই, তাদের সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া তারাটির মধ্যে নিজের অন্তরকে খুঁজে পাই। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ-ও কি মনে হয় না, বাংলা কবিতার ইতিহাসের একজন প্রকৃত কবি আমার সহযাত্রী ছিলেন। এ সৌভাগ্যও কিছু কম নয়। তার সান্নিধ্য, অন্তরঙ্গতা কিছু হলেও আমি উপভোগ করতে পেরেছি শুধুমাত্র আমার অক্ষম লেখালিখিরও চেষ্টার কারণেই।

মিথ্যে বলা হবে, তাই পাঠকদের কাছে নিজেকে মৃদুলের বন্ধু বলে পরিচয় দিতে পারছি না। কারণ বন্ধুত্ব বলতে আমি যা বুঝি, ততখানি ঘনিষ্ঠতা ওর সঙ্গে কখনো হয়নি। যদিও পরস্পরকে আমরা 'তুই' সম্বোধন করেই কথা বলি। আরও এটা-সেটা, যা বাইরে থেকে দেখলে লোকেরা বন্ধু বলেই মেনে নেবে। আসলে আমার দিক থেকে ছিল ওর প্রতি অপার মুগ্ধতা। যেভাবে ফার্স্টবয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে ক্লাসের ফেলু ছাত্র। স্কুল কেটে, নাক ফাটিয়ে, ব্ল্যাকে সিনেমার টিকিট কিনে সিটে বসবার সময় যেমন চকিতে মনে পড়ে তার কথা, মৃদুলকে কখনো-কখনো ওভাবেও আমি ভেবেছি। আর মৃদুল, তার অন্তঃকরণ যে কত বৃহৎ — গজ, ফুটরুল দিয়ে সে হিসেব করতে পারব না। বলেইছি তো আমি ফেলু ছাত্র।

কোথাও একটা সামান্য লেখা ছাপা হয়েছে। দু-একজন দেখেছে কি দেখেনি, কিন্তু মৃদুল তাতেই উত্তেজিত। ওর উৎসাহ দেখে কতবার যে লজ্জিত হয়ে পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই। এই মানবিক মৃদুলকে হয়তো অনেকেই চেনে না। আসলে সত্তরের দশকের বেশিরভাগ কবিরাই এরকম। আমি যে কিছু না-লিখেও পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে দোকান খুলে রাখতে পারলাম, তা তো এই মৃদুল দাশগুপ্তদের জন্যেই। সময় যে মানুষকে কত বিবেচনাপ্রসূ করে তোলে, মৃদুলকে নিয়ে লিখতে বসে সে অনুভূতি ভিতরে টের পাচ্ছি। কিন্তু তা লিখে জানানোর ভাষা আমার আয়ত্ত হয়নি। পাঠক, বিটুইন দ্য লাইন — নিজে পড়ে নিন।

তবু মৃদুলের সঙ্গে আমার পরিচয় সম্ভবত কফিহাউসে হয়নি। পরে বহুদিন কফিহাউসে আড্ডা দিয়েছি, ও একটা ক্যাপ পরে আসত। চুল কোঁকড়া। ঈষৎ লম্বা। অনেকটা রবি শাস্ত্রীর মতো লাগত। স্মৃতি কি প্রতারণা করছে? যদি না করে থাকে, তবে মনে হয় দাশনগরে চপলাবালা বালিকা বিদ্যালয়ে মানসকুমার দত্ত যে কবি সম্মেলন করেছিল, সেখানেই ওকে প্রথম দেখি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মতান্তর হয়েছে অনেকবার, মনান্তর কখনোই হয়নি। যার কৃতিত্বও মৃদুলেরই প্রাপ্য। কারণ 'শত জলঝর্নার ধ্বনি' সম্মেলনের পর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে একটা দূরত্ব আমার তৈরি হয়ে যায়। আর ওই উদ্যোগে মৃদুল ছিল এক প্রধান পুরুষ। এ বিষয়ে বিশদে আর যাচ্ছি না, তবু অন্তরাল থেকে খুঁজে এনে হৃদয়ের ধবধবে রুমালটি পেতে বন্ধুদের সঙ্গে ফের আমার বসবার আয়োজনটি মৃদুলই করেছিল। যা ছিল এক কথায় স্বার্থ-গন্ধহীন। কেবল আমার একলা-পথ-চলাটা ওর মনে কোথাও ধাক্কা দিয়েছিল বলে।

ব্যক্তি মৃদুলকে নিয়ে এইভাবে আমি হাজার পৃষ্ঠা লিখে যেতে পারি। সে কিছু কাজের কথা নয়, আর আমার চোখের অবস্থাও খুব খারাপ। বস্তুত এক আলো-আঁধারির মধ্যেই লিখে যাচ্ছি। এবার বাক্যজাল গুটিয়ে নিতেই হবে, কারণ চোখের আলো কমে আসছে। শেষ করবার আগে বরং মৃদুলের কবিতা নিয়ে দু-এক কথা বলবার চেষ্টা করি। পাঠক নিজের পাঠ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার ধারণা মিলিয়ে দেখে নিতে পারবেন, ভেবে।

মৃদুলের লেখা তৈরি হয় ছন্দবদ্ধভাবে, এটা প্রথম থেকেই দেখে আসছি। ওর চিন্তাটাই যেন ছন্দে রচিত, ফলে কৃত্রিম বা কঠিন ছন্দে তা প্রকাশিত হয় না। বরং সহজাত বা বলা ভালো নিজস্ব বাক-পরিধির এক বৃত্ত রচনা করে। যেন সমুদ্রের ঢেউ। এটা খুব সহজ কথা নয়। আর-একটি কথা, কল্পনা, যেখান থেকে ওর কবিতার শুরু। সেই কল্পনার জগতটিও খুব সুদূরের নয়। যখন সে স্লেজগাড়ির কথা লিখছে, লিখছে চার্চের কথা, পাতাঝরা বার্চ, তখনও নয়। এক অসামান্য দক্ষতা। একটা রূপকথাকে জীবন্ত করে তোলা, সমসাময়িক করে তোলার নৈপুণ্য, তার লেখায় আমরা চিরকালই লক্ষ করে এসেছি। আসলে মৃদুল তার নিজস্ব সময়, তার প্রতিটি শ্বাসধ্বনিকে শুনতে পায় ও চেনে এবং জাদু দক্ষতায় পাঠককে সেটাই উপহার দেয়। যেন এটাই স্বাভাবিক। 'আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি' — তার সময়ের আর কারো পক্ষে এ উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না, তা বলাই বাহুল্য।

আমার হাতে এখন রয়েছে পোকায় কাটা, বহু পঠিত মৃদুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *জলপাইকাঠের এসরাজ*। 'সুব্রত, প্রিয় সুব্রত' বলে লিখে যা সে আমাকে উপহার দিয়েছিল '১২/৬/৮০' তারিখে। প্রকাশক বিজেশ সাহা। প্রচ্ছদ পুণ্যব্রত পত্রী। মূল্য চার টাকা। সময়ের চাবুকের দাগ সে বই-এর শরীরে, আমাদেরও শরীরে বার্ধক্য নামছে। কিন্তু কবিতাগুলি যেন সদ্য লেখা — এখনও তাদের ভালোভাবে পড়া হয়ে ওঠেনি আমার। অথচ কতবার যে পড়েছি, নিজেও গুনে বলতে পারব না। বস্তুত বড়ো বিস্ময়কর এই কবি, যখনই তার নতুন বই বেরিয়েছে আর আমাকে উপহার দিয়েছে, বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখেছি কিছুতেই পুরোনো হচ্ছে না। ঘর বদল করেছি, আলমারি বদলও করেছি। পঁচিশ-তিরিশ বছর কিছু কম সময় নয়। লেখাগুলি নতুন রয়ে গেল কীভাবে? এ রহস্যের খোঁজ জানা নেই আমার। কারো জানা থাকলে, পত্র দেবেন।

আমার সহোদর

সাজ্জাদ শরিফ

কী আশ্চর্য! বয়স কি কখনোই ছোঁবে না মৃদুলদাকে? সেই যে ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি পরিচয় হল তার সঙ্গে, এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে সেই দিনটির ছবি। কবিতা পড়ে এর আগেই রচয়িতার যে ছবিটি তৈরি হয়ে উঠেছিল মনে, তার সঙ্গে রেখায়-রেখায় মিলিয়ে আঁকা। অস্তিত্বের প্রান্ত ছাপিয়ে উপচে পড়ছে শিশুর উচ্ছ্বাস। কথা যে বলছেন, মনে হচ্ছে শব্দগুলো শিখে উঠলেন এইমাত্র। সেগুলোর

ব্যবহারে আশ্চর্য নবীনতা। শুধু ব্যবহারেই তো নয়। যা বলছেন, তার মধ্যেও ঠিকরে বেরুচ্ছে অভিজ্ঞতার এক সজীব নতুনত্ব। তাঁর সব কথাই যে পুরোপুরি মেনে নেওয়ার মতো হচ্ছে, তা হয়তো সবসময় নয়। কিন্তু এমন সরল আবেগ আর গভীর বিশ্বাসে সেসব বলছেন যে, তাঁর কথা থেকে মন সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এখনও অবাক হয়ে দেখি, সময় আমাদের মন আড়ষ্ট করে দিচ্ছে ক্রমাগত, অথচ মৃদুলদার শিশুবয়স কিছুতেই কাটছে না।

আমার ও ভাইয়ার — মানে, আমার বড়ো ভাই ফরিদ কবিরের — বন্ধুদের মধ্যে মৃদুলদার ব্যাপারে অন্তত একটা কৃতিত্ব আমি সবসময় দাবি করি। মৃদুলদার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের বহু আগে — আমাদের চারপাশের সবার বেশ খানিকটা আগেই — তাঁর কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ কোনো বই-এ খুব বড়ো পরিসরে নয়, নানা ছোটোকাগজে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায়। একটি বই-এর কথা এখনও খুব স্পষ্ট মনে আছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরোনো কবিতার কোনো সংকলন। তাতে মৃদুলদার একজোড়া কবিতা *২০৭০-এর তরুণ কবিকে* আর *চতুর্দশপদী-৮*। বাচনের ভঙ্গিমার কারণে আলাদাভাবে নজর কেড়েছিল কবিতা দু-টি।

প্রথম কবিতাটি শুরু হয়েছে এমনভাবে যেন কবি কথা বলছেন অন্য কারো সঙ্গে। কথা বলে-বলে সাহায্য করছেন তাকে, তার কল্পনা ভবিষ্যতে কিছুটা প্রসারিত করে নেওয়ার ব্যাপারে। কবিতাটি কিছুটা এগিয়ে যেতেই মনে হতে থাকে, কবি নিজেই যেন ভাগ হয়ে আছেন সেই চরিত্র দুটোয়, যুগপৎ বক্তা আর শ্রোতা হয়ে। একজন ফুটিয়ে তুলছেন এক ভবিষ্যৎ-ছবি। তিনি প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয় চরিত্রটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না খুব কবিতায়। তার উপস্থিতি রচিত হচ্ছে অপ্রত্যক্ষে, প্রথমজনের উদ্দিষ্ট কথার ভেতর দিয়ে। তাকে মনে হয় কবির অপর। এই দ্বিতীয়জনের উদ্দেশে বলা প্রথমজনের সংলাপে গড়ে উঠছে অলীকনাট্যের মতো সেই কবিতা। রহস্যভরা এক রাত্রির ছবি দিয়ে শুরু হয়েছে কবিতাটি। তারপর যা কিছু ঘটছে, তাকে বলতে পারি উৎকল্পনায় ভরা অনেক ছিন্ন ছবির অবিশ্রাম স্রোতের এক মুক্ত অনুষঙ্গ। কবিতার শেষে ভবিষ্যতের — সম্ভবত শতবর্ষ পরের — এক কবি এসে মুখোমুখি হচ্ছে প্রতিভাসিত সেই দ্বিতীয় চরিত্রটির। ভবিষ্যতের সেই কবি ডাকনাম ধরে ডেকে উঠছে অতীতের এই কবিকে।

এমনিতে শুনলে মনে হবে, বেশ তো কবির আত্মাভিমানের একটি ছবি। কিন্তু এই কবিতায় কবির স্বর এতই মৃদু, ছবিগুলো এতই কেন্দ্রচ্যুত, আবহ এত আত্মরহিত যে কবির কোনো বাসনা যদি কবিতাটির অন্তরালে লুকিয়েও থাকে, সেটি জেগে ওঠার কোনো অবকাশ পায় না। বরং মনে হয়, এই কবিতায় জেগে উঠছে নিরন্তর এক যোগের কথা — নিজের সঙ্গে অপরের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের — কবিতার পর কবিতায় যা গড়ে তুলতে চান কবিরা।

এই অনুমান পায়ের নীচে কিছুটা মাটি পায়, যখন কিছুদিনের মধ্যেই *আগামী* নামে তাঁর আরেকটি কবিতা পড়ার সুযোগ হয়। সেখানে আবারও ভবিষ্যতের কোনো এক রাতের ছবি। অতীতের স্বপ্নভরা কোনো-কোনো রাতের দুঃসাহসকে কবি জাগিয়ে তুলতে চাইছেন ভবিষ্যতের সেই স্ফুলিঙ্গময় রাতে।

যা হোক, মুখোমুখি না হলেও কবিতার হাত ধরে মৃদুলদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েই গেছে ততদিনে। তবু বাংলাদেশে তাঁর প্রথম ভ্রমণপর্বটি বিশেষভাবে আলাদা হয়ে আছে আমাদের অনেকেরই কাছে। এর এক প্রান্তে আছে অচেনা বাংলাদেশে এসে কবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে একা-একা মৃদুলদার প্রথম দিনটি পার করার কৌতুকময় কাণ্ড : তিনি ঢাকায় পৌঁছেছেন সপ্তাহান্তের ঠিক আগের বিকেলে, ডলার ভাঙানোর জন্য কোনো ব্যাংক তখন খোলা নেই, এখানে তাঁর একমাত্র চেনা মানুষ ফরিদ কবিরের অফিসও বন্ধ (তাঁর সঙ্গেও মৃদুলদার পরিচয় সে-সময় নামেমাত্র, একবার অল্প সময়ের জন্য তাঁদের নিতান্ত সৌজন্যভরা বাক্যবিনিময় হয়েছে কলকাতার এক সাহিত্য আসরে); ফলে বাংলাদেশে তাঁর প্রথম দেড় দিন কাটে প্রায় অভুক্ত থেকে আর অস্থানে ঘুমিয়ে। সে কাহিনি লেখার স্থান অন্যত্র।

মৃদুলদার সেই বাংলাদেশপর্বের আরেক প্রান্তে আছে সব সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে কবিদের গভীরতর আত্মীয়তার যোগের উজ্জ্বলতম কিছু মুহূর্ত। ভাষা আর কবিতার মায়াবী টানে কী করে যে মাত্র কিছুক্ষণ আগেও অচেনা এক ঝাঁক মানুষ একত্র হয়ে গেল। সময় পেরিয়ে যেতে লাগল নেশাগ্রস্থের মতো টলতে-টলতে। প্রথম সন্ধ্যায় সেই যে কথা শুরু হয়েছে, আর থামছেই না। বদলে যাচ্ছে শুধু আড্ডার স্থান — ফার্মগেটের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আমতলা থেকে সাকুরার পানশালা, সেখান থেকে শাহবাগের হতশ্রী পাপ্পু রেস্টুরেন্ট হয়ে কোনো কবির সরকারি ব্যাচেলর কোয়ার্টার্স।

মৃদুলদার এখানে আসার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বঙ্গ নামে এক উপসাগরে সিক্ত ও নোনা বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে তাঁর বাপপিতামহের ভিটায় বেড়াতে যাওয়া। সেই যে তিনি লিখেছিলেন একবার *মুক্ত মানুষের পদ্য* কবিতায় :

> আমি বাখরগঞ্জ, গৈলাগ্রামের, আমার পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে
> লিখেছিলেন মনসামঙ্গল,
> গরল আমি ডরাই না হে
> বিষে আমি ভয় পাই না
> আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি

কবিতাটির তাপ ও দার্ঢ্য যে কাজ করছে মৃদুলদার আবেগের মর্মমূলে, সেটি উপলব্ধি করার মতো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। ঢাকা আসার দু-দিন পরেই তিনি যাত্রা করলেন বাখরগঞ্জে, আজকের বরিশালে। সে যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হলাম আমি। তখনও জানতাম না, সেই যাত্রা ব্যক্তিগতভাবে কী অসম্ভব মূল্যবান হয়ে উঠবে আমার জন্য। কারণ সেদিন আমি আমার আরও এক সহোদরকে খুঁজে পাব।

আমরা যাচ্ছিলাম রাতের বাসে। বাসে চড়ে বরিশাল যেতে হলে মুহুর্মুহু ফেরি পেরোতে হয়। আর প্রতিটি ফেরিতে তখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেই চলমান দীর্ঘ নির্ঘুম রাত ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গে। নানাদিক থেকে ভেসে আসা আবেগের তীব্র টানে ভেসে যাচ্ছেন মৃদুলদা। ঠাকুরদার হাত ধরে তাঁর বাবা যে জায়গাটি চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন আজ থেকে বহু বছর আগে, তিনি আজ ফিরে যাচ্ছেন সেখানে। মানুষ স্থানিক অর্থে স্থান ছেড়ে যায়, কিন্তু সময় সবকিছু লুট করে নিলেও শৈশবকে তো আর ম্লান করে দিতে পারে না। মৃদুলদার মনে তাঁর বাবা বরিশালের বাস্তবোধ গভীরভাবে রোপণ করে দিয়েছিলেন। সেটি তাই মৃদুলদার জন্য হয়ে উঠেছিল এক তীর্থযাত্রার মতো। বরিশালের গৈলায় তাঁর কোনো পরিজন নেই, কোনো বাড়িও আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, থাকার মতো কোনো ঠাঁইও সেখানে নেই। কিন্তু সেই যাত্রার উদ্দেশ্য যেন অবিচ্ছিন্ন এক প্রবাহের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করার ব্রত; যেন এমন এক উৎসের অবলোকন, যা তাঁর এত দিনের যাত্রাকে প্রকৃত যাথার্থ দিতে পারে।

সেই বাংলাদেশ ভ্রমণের কিছুদিন আগে এক তরুণী মৃদুলদার মন চূর্ণ করে দিয়েছিল। সেই বেদনার আঘাতে তাঁর মন তখনও অরক্ষিত। তাঁর মানিব্যাগে সেই তরুণীর একটি ভাঁজ করে রাখা চিরকুট। ভাঁজে-ভাঁজে ছিন্ন ও জীর্ণ। সেটি মেলে ধরলে দেখতে পাই, কোনো অক্ষরই তাতে অক্ষুণ্ণ নেই। ঘামে লেপটে, ক্রমাগত ঘষায় ক্ষয়ে গিয়ে সব একাকার। কিন্তু কী বিস্ময়! সেই প্রায় আবছা চিরকুটটি মৃদুলদা দিব্যি ঝরঝর করে পড়ে ফেলতে পারলেন।

আর কবিতা আর কবিতা আর কবিতা। নানা কথার স্রোতের মধ্যে বলে চলেছেন একটার পর একটা কবিতা। নিজের এবং অন্য আরও বহু কবির। ততদিনে *এভাবে কাঁদে না*-র কবিতাগুলো তাঁর লেখা হয়ে গেছে। এ বই-এর কবিতাগুলোর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নতুনতর এক ভাষার প্রায় উপকূলে এসে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি ততদিনে। কিছুদিন পরই শুরু হবে তাঁর *রান্নাঘর* সিরিজের কবিতা। ভাষা তখন এতটাই সান্দ্র হয়ে উঠবে যে শুধু পাশাপাশি নয়, একই শব্দবন্ধে তাতে অবলীলায় ব্যক্ত হতে পারবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা। কিংবা তা-ও নয়, একটিই

বাক্যবন্ধকে সেখানে একই সঙ্গে পড়ে নেওয়া যাবে নিতান্ত মনোজাগতিক ও রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের প্রকাশ বলে। শব্দ সেখানে, ইতালির হেরমেতিক কবিতার মতো, নির্জলা সাঁটলিপি। একই ইশারার সেখানে বিচিত্র মানে এবং প্রত্যেকেই সংগত; কিংবা হয়তো সবগুলো ভাষ্য একটি তোড়ায় বাঁধার পরেই কবিতাগুলো হয়ে উঠতে পারছে অধিকতর সংগতিপূর্ণ। ভবিষ্যৎ সেইসব কবিতার টান মৃদুলদাকে সেদিন ভেতর থেকে টালমাটাল করে দিচ্ছিল।

সংগত কারণেই মৃদুলদা বক্তা আর আমি শ্রোতা। তাঁর কথার টানে আর আবেগের ঝাপটায় আমি স্রোতের কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিলাম।

বরিশালে আমরা গিয়ে পৌঁছোই ভোরবেলায়। মৃদুলদা বাস থেকে নামবেন। রীতিমতো কাঁপছেন তিনি। দুই চোখ বেয়ে ঝরছে পানি। বাস থেকে নেমেই এক খাবলা কাঁচা মাটি তুলে নিলেন। ঘষতে লাগলেন কপালে। তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে মুহূর্তের মধ্যে চারপাশে লোকের জটলা। বিব্রত আমি তাঁকে ঠেলে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। একটি রিকশা ঠিক করে তার ওপরে টেনেও তুললাম তাঁকে। কিন্তু মৃদুলদা কি সেই সময়ে রিকশায় চুপচাপ বসে পড়ার লোক! রিকশার ওপর দাঁড়িয়ে আশেপাশের লোকেদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেওয়ার মতো করে তিনি বললেন, 'শোনেন, আমি কিন্তু বরিশালের পোলা। কইলকাত্তা হইয়া আবার বরিশালে ফেরত আসছি।' রিকশার ওপর দাঁড়ানো মাটিচর্চিত ললাটের অশ্রুসিক্ত মৃদুলদার সেই মূর্তি তাঁর *মুক্ত মানুষের পদ্য* কবিতাটির মর্ম আমার কাছে এক লহমায় স্পষ্ট করে তুলল। সত্য বলতে কী, ব্যক্তি ও কবি মৃদুল দাশগুপ্তের মর্মতলটিকে ওই মূর্তির মধ্য দিয়ে এখনও আমি অনেক দূর অবধি দেখে নিতে পারি।

এরপর, ওই অতিমাত্রায় আবেগঘন পরিপ্রেক্ষিতের ভেতর, সস্তা সিনেমার পরিচিত দৃশ্যের মতো অঝোরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। নানা বাহন পালটে, কখনো-কখনো পায়ে হেঁটে কাকভেজা হয়ে আমরা গৈলায় গিয়ে পৌঁছোলাম। *মুক্ত মানুষের পদ্য* কবিতার চক্রটি পূর্ণ করার জন্যই যেন বা গৈলায় ঢোকার মুখে আমরা একটি প্রাচীন মনসামন্দিরও পেয়ে যাই। কবি বিজয়গুপ্তের সঙ্গে কি এই মনসামন্দিরের কোনো সম্পর্ক আছে? আমার জানা নেই।

উজ্জ্বল সেই দিনটির পর কতগুলো বছর পার হয়ে গেছে। এই পৃথিবী আরও কত বদলের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে এসেছে আমাদের। মৃদুলদার জীবন ও কবিতার মধ্যেও কত বিপরীত টানে ভরা স্রোত বয়ে গেছে। তাঁর কবিতা হাতেগোনা বটে, কিন্তু সেগুলোও গেছে বিচিত্র পালাবদলের মধ্য দিয়ে। সেসব নিয়ে কথা বলার মতো পারঙ্গমতা আমার নেই। কিন্তু সবকিছুর পরও মৃদুলদার মধ্যে জেগে আছে সেই শিশুটি। তিনি প্রথমবার বাংলাদেশে আসার কিছুদিন পরেই মাধবী বউদি মৃদুলদার জীবনে জেগে উঠতে শুরু করেছেন একটি স্থির কেন্দ্রের মতো। ঘ্যাংঘুং-এর জন্মের পর কী আনন্দিত স্বরেই না সে খবর আমাদের দিয়েছিলেন মৃদুলদা। তাঁর উদ্ভাসিত কণ্ঠস্বরের সেই গাঢ় মধু এখনও কানে লেগে আছে।

আজ যখন ভাবি, মৃদুলদার কাছ থেকে কী পেয়েছি, ধরা যাক, আমরা যারা বাংলাদেশে বসে কবিতা লিখি; তখন অনেকগুলো কথা মনে না এসেই পারে না। প্রথমবার বাংলাদেশ ঘুরে ফেরত গিয়ে প্রতিবারই কাউকে না কাউকে এখানে নিয়ে এসেছেন তিনি। মনে পড়ে, একেবারে শুরুর দিকেই তার সঙ্গে এসেছিলেন রণজিৎ দাশ, গৌতম চৌধুরী বা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃদুলদার হাত ধরে ওখানকার কত ভাইবন্ধুকে যে নিজের করে পেলাম। আমাদের মন অনেক সময় চঞ্চল হয়ে ওঠে এ কারণে যে পশ্চিমবঙ্গের কবিরা বাংলাদেশের কবিতাকে চিনতে শিখেছেন একটা অতিচেনা ছকে। সেটি পেরিয়ে এখানকার কবিতার পূর্ণতর কোনো চেহারার কাছে তারা আর পৌঁছোতে পারেন না। সেই ছকটি যে কোনো-কোনো স্তরে একটু-একটু করে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, বাংলাদেশের ছবিটা যে ওখানে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে একটু-একটু করে, এই যোগাযোগের একটি প্রগাঢ় ভূমিকা তো তাতে আছে।

আবার মুখচেনা কিছু প্রবল প্রকাশনাকে পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভিন্নতর কবি ও কবিতার তথ্য পৌঁছোতে পারেনি আমাদের কাছেও। যোগাযোগের সেই সেতু স্থাপনের কাজে প্রথম তো হাত লাগিয়েছিলেন মৃদুলদাই। তিনিই গোপনে আমাদের খবর দেন, আরও দু-জন কবি পশ্চিমবঙ্গে আছেন বটে। তাঁদের নাম শ্রীবিনয় মজুমদার ও শ্রীউৎপলকুমার বসু। এই প্রসারমাণ যোগের প্রভাব দুই দিকেই এখন নানাভাবে পড়ছে। তবে সেটি হিসেবের জায়গা তো বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ। যোগ্যতর কোনো গবেষক এসে নিশ্চয় অঙ্ক কষে দেখাবেন এ অঞ্চলে এই যোগের পরিণাম কত দূর গিয়ে পৌঁছোল।

আমার দিক থেকে কিন্তু লাভটা একেবারে নিরেট, ব্যক্তিগত এবং স্বার্থপরের মতো। আমি পেয়েছি মৃদুলদা ও তাঁর মতো এমন আরও দুয়েকজনকে, যাঁরা হয়ে গেলেন আমার পরিবারের নিকটতম সদস্য। এবং আমিও তাঁদের।

তাঁরা তো আসলেই আমার মায়ের পেটের ভাই। নইলে মৃদুলদা যে রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন, আমার কেন মনে হল পুরস্কারটা আমিই পেয়েছি?

মৃদুল, আমার বন্ধু

শ্যামলকান্তি দাশ

মৃদুল আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোটো। ওর জন্ম ১৯৫৫-এ, আমার ১৯৫১। সেদিক থেকে দাশগুপ্তমশাই আমার অনুজ, অর্থাৎ ছোটোভাই, আর আমি ওর অগ্রজ মানে বড়োদাদা। কিন্তু মৃদুলবাবু মানলে তবে তো দাদাগিরি! জীবনের উষাকাল থেকে সেই যে আমাকে তুইতোকারি শুরু করেছে, তার এখনও পরিসমাপ্তি ঘটেনি। অবলীলায় ও আমাকে নাম ধরে ডাকে, 'তুই' বলে সম্বোধন করে, প্রয়োজনে ধমক-ধামকও দেয়, বাধা দেব সাধ্য কী। সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর ধরে এরকমই চলছে।

বয়সে ছোটো হলে কী হবে, মৃদুল কবিতা রচনায় আমাকে টেক্কা দিয়েছে তরুণ বয়সেই; আমার থেকে চার বছর নয়, কবিতায় সে চোদ্দো বা চব্বিশ বছর এগিয়ে আছে। এই বুড়ো বয়সে তাকে আর কোনোভাবে ছুঁতে পারব মনে হয় না।

গ্রামে থাকতাম বলে আমার সময়ের অনেক কবিকে তখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু পত্র-পত্রিকায় তাদের অস্তিত্ব প্রবলভাবে টের পেতাম। দিনরাত চিঠি লিখতাম। আবেগ আর উষ্ণতা খুঁজে বেড়াতাম। এইভাবেই মৃদুলকে চেনা। তার কবিতা আবিষ্কার। হুগলি জেলার নানা ছোটো কাগজে মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা ছড়িয়ে থাকত, আমি নিঃশব্দে অবলোকন করতাম। তার কবিতার ঝাঁঝ, দাপট আর সুগন্ধে টের পেতাম বাংলা কবিতার পালে নতুন হাওয়া লেগেছে। মৃদুল সেই হাওয়ার সঙ্গী, কিন্তু সে বলতে এসেছে অন্যরকম কথা। ওই বয়সেই তার অনেক গনগনে কবিতা আমাদের ঝাঁকি দিচ্ছিল।

সত্তর দশক মুক্তির দশক। কবিতারও। এই দশকের কবিরা শত-শত বর্ণময় কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছেন। বিপুল, বিচিত্র কবিতাসম্ভার। সেই ঝোড়ো, ধ্বস্ত, করাল সময়ে কবিতা লিখেছেন অনেকে, কাঁড়ি-কাঁড়ি কবিতা, কিন্তু মৃদুলের মতো ক-জন সেই সময়কে আত্মস্থ করেছেন! হাতে গুনে বলা যায় তাঁদের নাম। আমরা যা পারিনি মৃদুল তা পেরেছে। উলটো স্রোতে গা ভাসায়নি সে। এখানেই মৃদুল বিশিষ্ট। এখানেই তার অনন্যতা। সময়কে সে ধারণ করেছে। তার কবিতা রক্তাক্ত সময়ের অভিজ্ঞান। মৃদুলই, আমার বিবেচনায়, তারুণ্যের স্পর্ধা যে কত জোরদার হতে পারে দেখিয়ে দিয়েছে। এত বছর পরে, এখনও মৃদুলের কবিতা পড়তে-পড়তে, শুনতে পাই হৃৎপিণ্ডে দারুণ দামামা।

সত্তর দশকের উজ্জ্বল কবিপ্রতিভা মৃদুল দাশগুপ্তকে আমি প্রথম দেখি তমলুক

শহরে, ১৯৭৪ সালে। রোগা-সোগা চেহারা, কিন্তু দীপ্তিময় দু-টি চোখ, মুখে সকৌতুক দাপট। কবিতায় ভরপুর। তমলুক রাজ ময়দানে সারা বাংলা তরুণ লেখক সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। আমি ছিলাম সেই সম্মেলনের অন্যতম পাণ্ডা। আমন্ত্রিত হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে এসেছিলেন বহু কবি-লেখক। অনুষ্ঠানের দিন সকালবেলা জামশেদপুর থেকে চলে এসেছিলেন সত্তর দশকের এক বলবান কবি-সম্পাদক কমল চক্রবর্তী। তাঁর কবিতাও তখন আমাদের খুব টানছে। কমলদা ছাড়াও আরও যে কতজন — জামশেদপুর বেহালা কৃষ্ণনগর নৈহাটি বালি উত্তরপাড়া কাকদ্বীপ রানাঘাট — সব মিলেমিশে একাকার। মৃদুল এসেছিল সবান্ধব, উৎসবের আগের দিন রাত্রে, থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্তে নানা ঝকমারি, কিন্তু মৃদুলের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বোঝাল আড্ডাটাই আসল, থাকা-খাওয়া কোনো বিষয় নয়। সেই রাত্রে আমাদের তুমুল হইহল্লা এখনও কান পাতলে পরিষ্কার।

মৃদুল যেখানে, সেখানে আবহাওয়া অন্যরকম হতে বাধ্য। আমাদের, বন্ধুদের তরজায় মেতে উঠতে সময় লাগে না। আমি কবিতার কোনো আসরে গেলে বেরোতে পারি না, আটকা পড়ে যাই। কিন্তু মৃদুলের স্বভাবে পর্যটন, সে ব্যূহ ভেদ করে ঠিক বেরিয়ে পড়বেই। মৃদুলের যুক্তি, যে-জায়গাটায় এলাম কবিতা পড়তে, সেখানকার মানুষজনকে দেখব না, গাছপালা নদীনালা চিনব না? ধ্বংসের মধ্যেও তো কত জীবন ছড়িয়ে আছে, সত্যিকারের দেখার চোখ নিয়ে সেগুলো দেখব না? প্রথমবার মৃদুল যখন বাংলাদেশে যায়, একটি গদ্যরচনায় সে জানিয়েছে, তার হাতে সম্বল মাত্র একশোটি ভারতীয় টাকা। এই সামান্য টাকায় সে প্রায় দিগ্বিজয় করেছিল। চষে বেড়িয়েছিল বাংলাদেশের নানা অঞ্চল। সেখানকার নানা মণিমাণিক্যে মৃদুলের কবিমনটি এখনও ভরপুর। সুযোগ আর পরিসর পেলে সে উজাড় করে দেয় তার অভিজ্ঞতা। তার বলার ভঙ্গিও এত স্বচ্ছন্দ, এত সাবলীল, আমরা শুনতে-শুনতে ভরে উঠি। আমাদের সঙ্গে কবিতা উৎসবে বাংলাদেশ গিয়ে এক সকালে মৃদুল বগুড়া যাবে, কারণ সেখানেও অনেক দেখবার আছে। সেইসব কীর্তিগাথা সে প্রত্যক্ষ করতে চায়। আমি বাধা দিলাম, যাস না, সময়মতো ফিরতে পারবি না। মৃদুল জেদি, একরোখা, দুর্জয় সাহস তার। তাকে নিরস্ত করা গেল না। সে বগুড়া গেল এবং ঠিক সন্ধের মধ্যে ফিরে এল টাঙ্গাইল। কবিতায় মৃদুল যেমন তুলনাহীন, গল্প বলাতেও তার জুড়ি মেলা ভার। গাড়িতে যেতে-যেতে সে শুনিয়েছে চম্বলের রোমহর্ষক কাহিনি। খবরের কাগজের রিপোর্টার হিসেবে সে কীভাবে পৌঁছেছিল চম্বলের অরণ্যপ্রদেশে, কীভাবেই বা সে ডাকাতদের মুখোমুখি হয়েছিল, রক্ত ঠান্ডা হয়ে যাওয়া সেই বিবরণ শুনতে-শুনতে কখন যে আমরা সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম, হুঁশ নেই।

আমি মৃদুলের কবিতার মুগ্ধ পাঠক। তার প্রতিটি কবিতাই আমাকে উদ্দীপ্ত করে। বুঝতে পারি কবিতার জন্য তার অভিনিবেশ ও ধ্যানে কোনো ফাঁকি নেই। সে একটি বড়ো পুরস্কার পেয়েছে সত্য, কিন্তু আরও অনেক বড়ো পুরস্কার তার প্রাপ্য। মৃদুল দাশগুপ্ত এমন একজন কবি, যে কখনো কারো দাসত্ব করেনি, খ্যাতির জন্য পরমার্থের জন্য সে কখনো কোনো শিবিরের ভুল-খাতায় নাম লেখায়নি, নিজের বোধ-বিশ্বাসে অটল। এটা খুব কঠিন কাজ, সকলে পারে না। মৃদুল দাশগুপ্ত পেরেছে। সামান্য প্রাপ্তির আশায় সে হাত ধুয়ে বসে থাকে না। ছোটো কাগজগুলি তার ভরসা, তার আশ্রয়।

মৃদুলের সাহসের কথা, সংগ্রামের কথা, তার প্রতিবাদী চরিত্রের কথা শতমুখে বলবার মতো। মৃদুল যেমন বড়ো কবি, তেমনি বড়ো মানুষও। তার মনুষ্যত্বের নানা দিক আমাকে প্রেরণা দেয়।

অজস্র বিখ্যাত কবিতার স্রষ্টা মৃদুল দাশগুপ্ত তার নিজস্ব রন্ধনশালা থেকে অজস্র সুখাদ্য আমাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছে। আমাদের রসনা কানায়-কানায় পূর্ণ। আমরা সার্থক। আমরা চরিতার্থ।

মৃদুল, মৃদুলের কবিতা

সুশান্ত বসু

সালটা ঠিক মনে নেই। সম্ভবত ১৯৭৪-৭৫ হবে। আমার এক অত্যন্ত নিকটজন, বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ও কবিতাপ্রেমীদের মহলে সুপরিচিত কবি বিশ্বনাথ গরাই-এর কাছে খুব শুনতাম ওর বন্ধু কবি মৃদুল দাশগুপ্তের কথা। বিশ্বনাথের সূত্রেই মৃদুলের সঙ্গে আমার পরিচয়। সেদিনের সেই ঝকঝকে তরুণ মৃদুলের মূর্তিটি আজও গাঁথা হয়ে আছে আমার স্মৃতিতে। তারপর ওর সঙ্গে তেমন নিয়মিত দেখা হয়নি, কিন্তু আমার কাছে মৃদুলের লেখা, ওর সঙ্গে চকিতে একটু-আধটু দেখা বা ওর কথা ইতস্তত শুনতে পাওয়া — সেটাই আমাদের প্রায় চার দশকের ভালোবাসার সংযোগসূত্র।

মৃদুল কবিতা লিখতে শুরু করেছে গত শতকের সত্তর দশকের গোড়ায়। তখনই স্বভাব-স্বতন্ত্র এক কবি হিসেবে ওর আলাদা একটি আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছে। তার ঠিক আগের দশকের কবিদের মতো নয়, মৃদুল তৈরি করেছে আলাদা করে কথা বলার নিজস্ব একটি ধরন ও গড়ন, যা সুনিশ্চিতভাবে চিনিয়ে দেয় ওই দশকের ভিন্নপথের যাত্রী এক কবিকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *জলপাইকাঠের এসরাজ*। এই বই-এর নাম কবিতাটি এবং আরও কিছু স্মরণীয় কবিতা যে তার পাঠকদের কত প্রিয় তার প্রমাণ বইটির পরবর্তী মুদ্রণ। ঠিক যেমন প্রিয় তার *নির্বাচিত কবিতা*-র *কবিতা সংগ্রহ* নামক পরবর্তী মুদ্রণের প্রকাশ।

মৃদুলের চারটি ছোটোদের ছড়ার বই এবং দু-টি গদ্যগ্রন্থ *কবিতা সহায়* ও *সাত পাঁচ* — এর কোনোটিই আমি সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। পারলে হয়তো ছোটোদের লেখায় মৃদুলের কৃতি-নৈপুণ্য সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে পারতাম, কিংবা তার নিজস্ব কবিতাভাবনার সূত্র ধরে দেখানো যেত মৃদুলের কবিতার আত্মভুবনটিকে। আপাতত তার *জলপাইকাঠের এসরাজ*, *এভাবে কাঁদে না*, *গোপনে হিংসার কথা বলি*, *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*, *ধানখেত থেকে* এবং *সোনার বুদ্বুদ* — এই ক-টি বই-এর, আমার হিসেব মতো দুশো ছেষট্টিটি কবিতাকে ঘিরে আমার প্রতিক্রিয়ার সামান্য দু-চার কথা বলি।

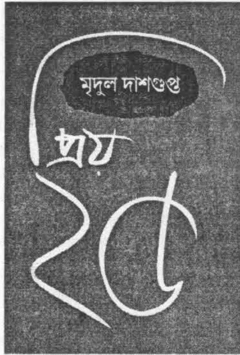
চল্লিশ বছরে লেখা আড়াইশোর কিছু বেশি কবিতার মধ্য থেকে যে মৃদুলকে আমি চিনেছি সে আদৌ কোনো স্বয়ংক্রিয় লিখন পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নয়। 'হৃদয় এবং মস্তিষ্কের প্ররোচনা হেতু' তার যে 'কবিতা প্রয়াস' তার নির্মাণ ও সৃষ্টির যে জগৎ, সেখানে আমার চোখে ধরা পড়েছে দু-টি স্তরের উচ্চারণ। তার একদিকে বিশ্বচেতন এবং স্বকাল ও স্বদেশের শিকড়ে লগ্ন এক সংবেদী সামাজিকের তিক্ত ক্ষোভ, বেদনাবিদ্ধ ক্রোধ এবং প্রত্যয় ও প্রত্যাশার নানা স্পষ্টভাষ উচ্চারণ আমরা শুনতে পাই। *মুক্ত মানুষের পদ্য* নামক কবিতায় উচ্চারিত হতে শুনি মৃদুলের কবিতাপ্রেমী পাঠকদের সর্বজন-স্মৃতিধার্য এই পঙ্‌ক্তিগুলি —

আমি বাখরগঞ্জ, গৈলাগ্রামের, আমার পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে
লিখেছিলেন মনসামঙ্গল,
গরল আমি ডরাই না হে
বিষে আমি ভয় পাই না
আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি

রাজনৈতিক বিশ্বাসের এই দৃঢ়তাই তাঁকে দিয়ে লেখায় কল্পভাবনার ওমে লেখা এমনতরো পঙ্‌ক্তি —

ধরো, সেদিনও এমনই রাত, জালিয়ানওয়ালাবাগে
ডায়ারের বন্দুক নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে
দ্রোণাচার্য ঘোষ!

ভাবো, ভাবো সেদিনের উৎসব! বরানগরের গঙ্গার জল থেকে
আবার এসেছে উঠে
তিনশো তরুণ



দেশভাগের অনিবার্য পরিণামে সাত পুরুষের ভিটে ছাড়তে বাধ্য হওয়া পিতৃপুরুষের ছিন্নমূল অস্তিত্বের কাহিনি মৃদুলের ভাবনায় হয়ে দাঁড়ায় *একজন ভারতীয় নিগ্রোর কবিতা। এল্ পার্টিডো কমিউনিস্তা, কলকাতা, একটি প্রবাল দ্বীপের জন্য, ১৯৭৪* — এমনি সব কবিতায় মৃদুলের কল্পভাবনার বহুমাত্রিক আয়তন গভীরভাবে ছুঁয়ে যায় আমাদের অনুভূতির জগৎকে। দেশি-বিদেশি নানা লোকায়ত, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক অনুষঙ্গ ছুঁয়ে যায় মৃদুলের কবিতার ভিতরমহলটিকে এবং তার তির্যক ইঙ্গিতময়তা বারবার চিনিয়ে দেয় এক কবিকে যিনি তাঁর স্পষ্টভাবের গণ্ডি ছাড়িয়ে চলে যান নিজস্ব উচ্চারণের এক স্বায়ত্ত শাসিত ভুবনে। কবি যখন দেখেন 'বন্ধুরা গিয়েছে চলে সংঘ থেকে উপসংঘে' আর 'পেয়েছে অপর্ণা আলো কেউ কেউ নিজস্ব নিয়মে / প্রত্যেকেই পৃথক বিজয়ী তারা প্রতিভাবানেরা'। সাময়িক যে বিচ্ছিন্নতার বেদনা থেকে মৃদুল লেখে, 'আমার আলাদা কোন যুদ্ধ নেই, ধমহীন, চ্যুত', এবং যে 'ফুল্লরা' যুগপৎ কবির কাব্যবিবেকের আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব — তার চলে যাওয়ার ফলে তার 'দুচোখে জাগে মরুদেশ, উটের কঙ্কাল'; এই মরুভাবনাই কিন্তু তার শেষ কথা নয়, প্রথম বই-এর কিছু মিতায়ত কবিতা এবং পরবর্তী বইগুলির ছোটো-ছোটো কবিতার মধ্যে কবির জীবনকে গভীর ভালোবাসা এবং তাকে নানাভাবে খোঁজা ও আবিষ্কার করার এত অবগাঢ় সংহত উচ্চারণ আমরা শুনতে পাই।

মৃদুলের কবিতার এই যে দ্বিতীয় স্তর সেখানে নানাভাবে শব্দ ছেনে-ছেনে এক গভীর আত্মমগ্নতায় গড়া নানা সংকেতবাহী এক জগৎ, তা মোটেই সহজ নয়, যা মৃদুলের 'নিজের মুদ্রাগুণে' তার পূর্বসূরি বা সমকালীন সহযাত্রী কবিদের থেকে একেবারে আলাদা। এইসব কবিতাগুলি অনেক গভীর অভিনিবেশ দাবি করে তার পাঠকদের। বাস্তবিকই 'হৃদয় এবং মস্তিষ্কের প্ররোচনা' তাকে দিয়ে লেখায় সেই অনিবার্য শব্দগুলি, বারবার পড়তে-পড়তে পাঠকের কাছে খোলে তার নানা পরতগুলি। মৃদুলের অনেক কবিতাই বারবার বারবার বলেছে রান্নার কথা — এ রান্না তো কোনো লৌকিক 'রান্নাঘর'-এর কথা নয়, তার অস্তিত্বের প্রতীকী রন্ধনশালায় আবহমান জীবনের রহস্যময় বহুকৌণিক অনুভবের বিচিত্র এক কল্পভুবনের মুখোমুখি হই আমরা। মৃদুলের শেষতম সংখ্যাচিহ্নিত চুয়ান্নটি কবিতার সংকলন *সোনার বুদ্বুদ*-এ এক আশ্চর্য ঘোর-লাগা অনুভবের জগতের স্বরলিপির সঙ্গে পরিচয় ঘটে আমাদের। প্রেম ও প্রকৃতির এক আলাদা ধরনের আবহ রচনা করেছে মৃদুল। মাঝে পরাবাস্তবের সংকেত যেন আভাসে-ইঙ্গিতে কবির অস্তিত্বের ভিতরমহলের দিকে আর্কষণ করে তার পাঠকদের। 'হীরকের স্রোতে আমি তোমার নিঃশ্বাস পেয়ে ধরেছি আধারে / দেখো তো উড়ন্ত কিনা আমাদের ঘর?' — এরকম উচ্চারণের পাশাপাশি শুনি কাল থেকে কালান্তর বহে যাওয়া প্রেমের এই চিত্তপ্রতিমার কথা, 'নাকানি চোবানি খায় মহাদেশ বিবিধ সন্ত্রাসে / চকিতে চুম্বনরত গাছের আড়ালে জুটি তবু চিরস্থায়ী'। অত্যন্ত পরিশ্রমী প্রযত্নে অনিবার্য শব্দগুলির বিন্যাসে *সোনার বুদ্বুদ* মৃদুলের কবিভাষার এক ভিন্নতর শিল্পিত প্রতিমা।

যে মৃদুলের কাছে জীবন 'লুকোনো তথ্যের চেয়েও সে তো / আরও স্বাভাবিক সত্যি / বন্ধুদের কাছে ভাঙি নানাভাবে তাকে'। যে মৃদুল লেখে 'আমি কবি দিগন্ত-প্রহরী', সেই 'কবিতা-কৃষক' মৃদুল একাগ্র নিষ্ঠায় যে আত্মভুবনের শস্যক্ষেত্রটি রচনা করেছে, তার ফসলগুলি যে একুশ শতকের বাংলা কবিতারও এক মহার্ঘ উত্তরাধিকার — এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

দুদিকে কামড় লাগা যে ফল, কখনও তা গড়িয়ে যাবে না

রাণা রায়চৌধুরী

জ্যোতিপ্রকাশের মৃত্যু মনে রাখো, তুমি?

মুঠোর বোতাম আজ অন্য শার্টে সেলাই করেছো

রহস্যের কিছু নেই আজ আর, তবু

তোমাকে বনের মধ্যে ছুটে যাওয়া পথ মনে হয়

এই *বিবাহ* নামক কবিতাটি দিয়ে আমার মৃদুল দাশগুপ্তের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। চারলাইনের কবিতা, কিন্তু প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনের যে জাম্প, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়তে, তৃতীয় থেকে চতুর্থ লাইনে — 'তোমাকে বনের মধ্যে ছুটে যাওয়া পথ মনে হয়' — এ জিনিস পড়ে, আমি মৃদুল দাশগুপ্তের প্রেমে পড়ে যাই। *এভাবে কাঁদে না* আমার পঠিত সবচেয়ে সেরা বই। কবিতাগুলির গঠন, বলার ভঙ্গি, এবং তাদের রহস্যময়তা সেই তরুণ বয়স থেকে আজও আমাকে মুগ্ধ করে রাখে। বইটির নামও ভারী সুন্দর। *এভাবে কাঁদে না*। কী আবেগ! কী মায়া যে ছিল এবং এখনও আছে ওই নামটার মধ্যে।

আমি তরুণ বয়সে যখন প্রথম কবিতা লিখতে আসি, তখন আবেগকে নিয়ে অনেক পাগলামোই করেছি। যেমন শক্তির গাছে-গাছে কবিতা টাঙানো নিয়ে এতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি যে আমি ছোটো-ছোটো পোস্টারে রং-তুলি দিয়ে অন্যের কবিতা লিখে ছোটো-ছোটো ফুলগাছে টাঙিয়ে দিতাম। সে-রকম 'এভাবে কাঁদে না' কথাটা বড়ো পোস্টার করে ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম অনেকদিন। আসলে আমি ভিতরে-ভিতরে অনেক কেঁদেছি বলেছি বলেই হয়তো এই বাণীকে গ্রহণ করেছিলাম শয়নে-স্বপনে। ঘুমোতে যাবার আগে, ঘুম থেকে চোখ খুলে, একা ঘরে দুঃস্বপ্নের হস্তমৈথুন করতে-করতে ওই 'এভাবে কাঁদে না'-কে দেখতাম। পড়তাম ওই পোস্টারে টাঙানো কবিতাগুলি —

আকাশ কালো ঈগল পাখা, এবং নদী তুমুল তিস্তা
পথ টেনেছে ভূচুম্বকে, এল্ পার্টিডো কমিউনিস্তা

মৃদুলদার ওই মোটা এবং গম্ভীর গোঁফ দেখে বইমেলার মাঠে আলাপ করার সাহস পাইনি। কিন্তু দূর থেকে আমি তাঁকে আমার হিরো ভাবতাম। সত্তরের আরও দু-একজনকে যেমন ভেবেছি একদা। এক দুপুরে কাঁচরাপাড়া থেকে সমীর মজুমদার এসে বলল, শ্রীরামপুরে মৃদুল দাশগুপ্তের বাড়ি যাবি? আমি সঙ্কোচ করি। কুঁড়েমি করি। বলি, এই দুপুরের গরমে ভাতঘুম ছেড়ে, সিলিং ফ্যানের অলস বাতাস ছেড়ে আমার ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া উনি গম্ভীর মানুষ — যদি অপছন্দ করেন? সমীর প্রায় টানতে-টানতে আমাকে নিয়ে গেল। আমার বাড়ি ব্যারাকপুর — হুগলি নদী পার হলেই আমার হিরোর বাড়ি। গেলাম। আশ্চর্য

হলাম ওই মোটা, গম্ভীর গোঁফের আড়ালে এক সরল শিশুর মতো, মায়াবী মানুষের সন্ধান পেয়ে। বাড়িতে আর কেউ ছিল কি না বুঝলাম না। একতলা বাড়ি। কবি চার্মস সিগারেট পান করেন। আমি আর সমীর দেদার ফোকোটে চার্মস পান করলাম।

মৃদুল কবিতা শোনাচ্ছেন — একটি কবিতা ছিল তাঁর সদ্যোজাত কন্যার জন্য — আবেগপ্রবণ পিতার চোখ ছলছল করে উঠল। আমি এতটা, এই মানুষটা সম্পর্কে ভাবিনি। ভেবেছিলাম কঠিন, ভেবেছিলাম যুক্তিপ্রবণ। কিন্তু বাস্তবে তিনি এত মায়াময় যে আমি কবিকে ভালোবেসে ফেললাম।

তারপরে মৃদুল দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার সহকর্মীর সম্পর্ক। আমি তিনবছর *আজকাল*-এ নিচুতে, উনি উঁচুতে। কিন্তু পাতা বেরিয়ে যাওয়ার পর গভীর রাতে আমরা বন্ধু, আত্মীয়। কত গল্প-আড্ডা। আমার দপ্তরের পুরোনোদের বলে দিয়েছিলেন — এই হল রাণা, ভালো ছেলে (আমি যে কী হারামি সে আমিই জানি!) সহযোগিতা কোরো তোমরা — অর্থাৎ পিছনে লেগো না ভাইসব!

আজকাল-এর কালচারাল দপ্তরের ঘরে কিংবা বাইরের উঠোনে (সামনে রাতের খোলা রামমোহন রায় সরণি) আমি, অনিশ্চয় চক্রবর্তী, মৃদুলদা আরও কেউ-কেউ আড্ডা দিতাম। মৃদুলদা কবিতা শোনাতেন আমাকে একা পেলে। মাঝরাত্তিরে। সঙ্গে চার্মস সিগারেট। আমরা মত বিনিময় করতাম, বুঝতে পারতাম নিজের লেখার প্রতি তাঁর আস্থা, কনফিডেন্স — মুখাবয়বে তার ছায়া পড়ত। একবার মনে আছে, দপ্তরে আসা একটা লিটল ম্যাগাজিনের কবিতাগুলো দেখিয়ে বললেন — এগুলো কবিতা নয়। তার মধ্যে কিছু মাঝারি আলোকপ্রাপ্ত কবিও ছিলেন, নাম বলব না। বললেন — এগুলো কিছু হয়নি। এর মধ্যে দিয়ে মৃদুলদা কবিতা বলতে কী বোঝেন, কী বোঝাতে চাইছেন, তার কিছু আঁচ পেতাম। যে কবিতা একমুখী, বহুধা বিস্তৃত নয়, যে কবিতা একবারে শেষ হয়, আখ্যানে ভরা, যে কবিতা বহু আলোহীনতায় নিষ্প্রদীপ — তা কবিতা নয়। যার রহস্যময়তা শূন্য, তা কবিতা হিসেবে একেবারেই নীচের স্তরের, এরকমই আন্দাজ করতাম আমি সিগারেটের ধোঁয়ার আড়াল থেকে।

আজকাল-এ, আমাদের অফিসে একজন আর্টিস্ট ছিল (যার নাম ভুলে গেছি এখন), তাকে একদিন মৃদুলদা কাজ শেষে বলেছিলেন, ছবি কী হবে? ছবি কেমন হবে? ছেলেটি মৃদুলদার ছোটো। ঠিক জ্ঞান দেওয়া নয়, উপদেশও নয়, যেন একটা আলোচনার মতো করে মৃদুলদা বলেছিলেন, আমার মনে আছে, বৃষ্টির সন্ধ্যা, আমহার্স্ট স্ট্রিটের রাস্তায় বর্ষার জল, মৃদুলদা বলেছিলেন সেই তরুণ আর্টিস্টকে — ছবি হবে গভীর, যে কথা বলবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, যেমন অজন্তা-ইলোরার ভাস্কর্য যেমন খাজুরাহো আজও টিকে...। সেই তরুণ আর্টিস্ট দারুণ পোর্ট্রেট করত, তখন সৌরভ গাঙ্গুলির বাজার, *আজকাল* কর্তৃপক্ষ সেই তরুণ শিল্পীকে দিয়ে প্রায়শই সৌরভের পোর্ট্রেট আঁকাত কাগজের পাতায়। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, তার তুলির, স্কেচপেনের সাদা কাগজের ওপর নিখুঁত টান। মৃদুল সেই দক্ষ শিল্পীকে যে বার্তা দিতে চাইছিলেন শিল্পের, বিমূর্ততার — তার থেকে আমার চোখ খুলে যায় যে কবিতার ভাষা, কবিতার আঙ্গিক বলতে আমাদের মৃদুল কী ভাবেন বা বোঝেন। আমিও শিখতে চাইছিলাম, অগ্রজ কবির কাছে। বুঝতে পারছিলাম মৃদুলদা কেন *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর কবিতা এখন আর তেমন পছন্দ করেন না। চটজলদি পাঠক-গ্রহণযোগ্যতার থেকে একটু কঠিনের আবরণ চাপিয়ে সহজে না-বোঝার তরল আস্তরণ সরিয়ে, কেন মৃদুলদা *রান্নাঘর, আরও রান্নাঘর, সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* বা *নতুন কবিতা*-র কবিতাগুলির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অনেক ধাঁধা, কাঠিন্য, বিজ্ঞান, দর্শন মিলিয়ে এক বিমূর্ত শিল্পের দিকে, যা সহজে সমাজের পোর্ট্রেট নয়, সাম্প্রতিকের সহজ সংবাদ নয়, যে কবিতা পাঠককে কবিতার আবরণের আড়ালে নিয়ে যাবে আরও গভীর কোনো বনপথে, বা সূর্যাস্তের আড়ালের কোনো সূর্যোদয়ের দিকে।

আমি আজই আমার এক বন্ধুকে মৃদুলদার *এভাবে কাঁদে না* থেকে কবিতা শোনাচ্ছিলাম। আমি এরকম ফোনে বন্ধুদের বিভিন্ন প্রিয় কবির কবিতা শোনাই। দুটো কারণ। অন্যকে আনন্দ দিয়ে আনন্দ পাই, আর কবিতা শোনাতে-শোনাতে নিজেকেও শোনাই, যাতে আমার ভিতরের কবিতার বীজ উন্মোচিত হয়।

বিবাহ, হাসপাতাল, খাবার, স্রোত — 'তোমাকে বনের মধ্যে ছুটে যাওয়া পথ মনে হয়', 'এতোদিনে অধ্যাপিকা হয়ে গেছো দূরের শহরে' ইত্যাদি। কবিতাগুলো বহু দিক নির্দেশ করছিল, এক পঙ্‌ক্তি থেকে আরেক পঙ্‌ক্তির যে লাফ, আর মাঝে যে স্পেসের ব্যবহার তাতে করে কবিতার বহু অর্থ, বহুমাত্রিক দিশা, ও রঙের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। আমার বন্ধু বলছিলেন, *বিবাহ* কবিতাটির মানে পাঠক বিবাহিত না হলে অতটা বুঝবেন না। কারণ বিয়ের যে ভার বহন, বিয়ের যে আনন্দ-মিশ্রিত ব্যথা ও বেদনার স্বাদ, এ-কবিতায় আছে। 'ফুটোর বোতাম আজ অন্য শার্টে সেলাই করেছো / রহস্যের কিছু নেই আজ আর' — সত্যি, পাঠক বিবাহিত না হলে এ-কবিতার ফুটোর বোতামের রহস্য বুঝবেন না!

আমার খারাপ লাগে যে, মৃদুলদা এত বড়ো কবি, কিন্তু তাঁর বই-এর কাগজ ও বাঁধাই এত খারাপ, এত খারাপ তার প্রোডাকশন যে কষ্ট হয়। এখন অনেক নিম্নমানের কবিরও বই আরও ভালো প্রোডাকশন হাউস থেকে বেরোয়। ভালো প্রকাশক তো মৃদুলদার খোঁজ নিতে অধিক গভীরে গেলেন না?

আমাদের এই কবির দু-দু-জন মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নেওয়া সত্ত্বেও, তাঁর কবিতাই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি কোচিং ক্লাসের মিষ্টি প্রেমের কবিতা, অবৈধ যৌন কবিতার বাহক নন কোনোদিনই। সস্তায় তরুণ-তরুণীর মন জয় করতে তিনি চাননি। তাই তাঁর কবিতা বহু পর্দার আড়ালে থাকা কবিতা। বহু সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সেইসব পর্দা সরবে পাঠকের সামনে থেকে। তবে পুরোপুরি পর্দা উন্মোচিত হোক, তা সিরিয়াস পাঠকেরা মৃদুলদার কাছ থেকে চানও না বোধহয়।

আমাদের এই কবি শুধুমাত্র সিলেবাস-স্বীকৃত না হয়ে আরও বেশি পাঠকের, আরও সময়ের কাছে, কালের কাছে পৌঁছোন, তা আমরা চাই। তিনি ভালো থাকুন। তিনি যাত্রা করুন 'একা কবিতা'-র নির্জন গভীরে।

তোলো মুখ, এসো, ধরো হাত, চলো সঙ্গে

মন্দাক্রান্তা সেন

'ধরো সে কবিতাখানি নীল তার চারপাশে সোনালি রেখার কারুকাজ'। এরকমই ছিল *সোনার বুদ্বুদ* গ্রন্থে প্রথম কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি। এই কবিতাগুলি, আমার যদ্দুর মনে পড়ছে, অন্য কোনো একটি গ্রন্থে মৃদুলদা *নতুন কবিতা* শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর কবিতার প্রেমে পড়েছি আমি। তারপর *বিবাহপ্রস্তাব* আমাকে বিন্দাস করে দ্যায়। তিনি বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পর *আজকাল* পত্রিকার তরফ থেকে আমাকে তাঁর কবিতা বিষয়ে একটি ছোটো সমালোচনা লিখতে দেওয়া হয়েছিল। প্রিয় কবির সব পঙ্‌ক্তিই উদ্ধৃত করতে ইচ্ছে করে। সে-লোভ দমন করে কোনোরকমে উতরিয়ে দিয়েছিলাম লেখাটিকে।

তাঁকে প্রথম দেখা একটি প্রেক্ষাগৃহে। তিনি তখন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার পেলেন। মঞ্চে তিনি বসেছিলেন একটু বাঁকাভাবে, কেউ যেন তাঁকে দেখতে না পায়, এই ছিল তাঁর লজ্জাতুর আকাঙ্ক্ষা। তবু তাঁকে উঠতে হল, পুরস্কার নিতে হল। কিছু বলতেও হল। জাতকবির কুণ্ঠা তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিচ্ছিল মাঝে-মাঝে।

মনে আছে, প্রথমেই তিনি বলেছিলেন, কবি বীরেন চট্টোপাধ্যায় একদিন তাঁকে বলেছিলেন একটা বিড়ি খাবা? আজকে যখন তিনি নেই, তখন মনে হয় সেই পুরস্কার এই পুরস্কারের কাছে কিছুই নয়। আমার ঠিক সব কথা স্পষ্ট মনে নেই। কিন্তু অনেকটা এরকমই ঘটেছিল ব্যাপারটা।

মৃদুলদা *আজকাল* কাগজে কাজ করতেন। করতেন, মানে এখনও করেন কিনা জানি না। তাঁর অফিসে গিয়েছিলাম আমার প্রথম বইটি দিতে, খুব খুশি হয়েছিলেন। সে-খুশি আমার সারাটা মনে চারিয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল, আরও আগে কেন আসিনি। তাহলে বোধহয় উনি আরও আনন্দিত হতেন।

তাঁর সঙ্গে আলাপের কয়েকদিন পরে জেনেছিলাম তাঁর মেয়ের নাম 'মন্দাক্রান্তা'। শুনে, সত্যি কথা বলতে কী, প্রথমে আমার অভিমান হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আমার নামটি তার বিরলতা হারাল বুঝি। এখন সেই যৌবনের বাতুলতা ফুরিয়েছে। এখন তার প্রতি অপত্য স্নেহের মতো কিছু একটা হয়। কেমন আছ মন্দাক্রান্তা — এই জিজ্ঞাসা করতে ভারী মজা লাগে!

মৃদুলদার সঙ্গে আমার সরাসরি দেখা হওয়ার থেকে তাঁর কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় বেশি।

> নিজেকে নিদ্রিত দেখে আকস্মিক মনোবেদনায়
> শিয়রে বসেছি ঝুঁকে, কোনও কৌঁনও রাত্রিকালে একাকী নিশ্চুপে
> হয়তো দু-এক ফোঁটা অশ্রুপতনের ফলে আধো চোখ মেলে
> আবার নিদ্রায় ডুবে যেতে যেতে সে ভেবেছে, স্বপ্নে দেখা যায়।

স্বপ্নে কী দেখা যায়, মৃদুলদা? 'কুটিরের দ্বার খুলে দ্বিধায় ঘুমোয়... সে ভাবে নিশ্চিতভাবে, সম্ভাবনা, তুমি তার মৃত্যু ছুঁয়ে যাবে।'

কবিতায় নিদ্রাসক্ত, প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নাবিষ্ট তিনি অন্য আমি হয়ে বেজে ওঠেন। 'আমার কিন্তু তিন হাজার ফিট নিচে পড়ে গিয়ে, কিম্বা / ধরো এক হাজার মাইল দূরে সরে গিয়ে, না গো চোট নাগেনি, ঘুম / ভেঙেছে মাত্র।'

এই তবে তাঁর স্বপ্নের অসামান্য আপাত পরিণতি। তিনি স্বপ্ন দেখেন আরবে গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই করতে, আবার নন্দীগ্রামেও তিনি ছুটে যান। আর, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর সঙ্গে আমার মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রশ্ন করি, আমাদের প্রিয় কবিকে... 'অনেক লণ্ঠন ওড়ে, হাওয়াবাতাসের রাত, কেউ এলো আজ?' আমাদের মনে ও মগজে এলেন তিনি হাওয়া-বাতাসে চেপে, একথা বলতে : 'বাজাবো না আমাদের, বাজাবো না জলপাইকাঠের এসরাজ?'

বাজাই, মৃদুলদা, বাজাই। তবে আপনার হাতে যেমন খোলে, তেমনটা কি আমরা পারি? তাঁর নতুন-নতুন তীব্র সব কবিতা ঝমঝম করে মাথার মধ্যে, সেইটুকুও এই সামান্য লেখায়, এই সামান্য পরিসরে জানানো গেল না।

প্রিজমে বিচ্ছুরিত বর্ণালী বর্ণমালা

মাসুদ খান

কবি মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে *এভাবে কাঁদে না* বইটির মাধ্যমে। তাঁর পয়লা কবিতাপুস্তক *জলপাইকাঠের এসরাজ* হাতে আসেনি তখনও। 'তস্কর? গৃহস্থের আঙিনায় চাঁদ দেখে ঘুমিয়ে পড়েছো?' — *এভাবে কাঁদে না*-র প্রবেশক কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটির হাত ধরেই আমার প্রবেশ ঘটে মৃদুলদার কাব্যজগতে। কিন্তু তখনও ভাবিনি, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সংকেত ভাষাময় এক গূঢ় কাব্যজগৎ। তাঁর *এভাবে কাঁদে না* ও *গোপনে হিংসার কথা বলি* বই দু-টি হাতে আসে এমন এক সময়ে, যখন আমাদের মূলধারা-কবিতা পুনরুক্তিপূর্ণ ভাষ্যে, ধ্রুবপদের যথেচ্ছ ব্যবহারে হয়ে উঠছে ক্লান্তিকর; তালিকাবয়নের অতিরেকে হয়ে পড়ছে একঘেয়ে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে প্রবর্তিত ন্যারেটিভ কাব্যধারাটির ভেতর তখন ক্রমে-ক্রমে জমে উঠেছে জীবনের এবং যাপনের উপরিতলের ফেনা, শ্যাওলা ও খড়কুটা। কবিতা হয়ে উঠেছে চটপট-করে-ফুটতে-থাকা পপকর্নের মতো ফোলানো-ফাঁপানো। লজিকের বিপর্যয়ের বদলে কবিতার পদে-পদে লজিকের শৃঙ্খল... (অবশ্যই বেশ কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদে)। তাছাড়া বাংলাদেশে তখন চলছে স্বৈরশাসনবিরোধী জোরদার আন্দোলন। টালমাটাল একটা সময় — দ্রোহ ও উত্তেজনায় কাঁপা। স্বাভাবিকভাবেই কবিতাও হয়ে উঠেছে সোচ্চার। দ্রোহের কবিতা তো বটেই, প্রেম, বিরহ, এমনকী যৌনতার কবিতাও হয়ে উঠেছে সোচ্চার ও বাগ্‌বহুল।

একটা উদাহরণ দিয়ে বলি —

> যদি তুমি ফিরে না আসো
> পদ্মায় একটি মেয়ে ইলিশও আর ছাড়বে না ডিম
> রাজহাঁসের সবগুলো পালক ঝ'রে যাবে...
> যদি তুমি ফিরে না আসো
> চিত্রকর বর্ণের অলৌকিক ব্যাকরণ ভুল মেরে বসে থাকবেন
> কবির খাতায় কবিতার পঙ্‌ক্তির বদলে পড়ে থাকবে রাশি রাশি মরা মাছি।
> যদি তুমি ফিরে না আসো...

অনেকটা এইরকম পুনঃ-পুনঃ আবর্তনময়, তালিকাবহুল বর্ণনাধর্মী কাব্যভাষার প্রতাপ তখন (আমি বলছি না যে এগুলো খারাপ কবিতা, কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমরা অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এ-ধরনের কবিতায়)। পাশাপাশি অবশ্য বেশ কিছু ব্যাতিক্রমী কবিতাও লেখা হচ্ছিল তখন। যা হোক, এমনই এক পরিস্থিতিতে হঠাৎ করেই আমরা পেয়ে গেলাম —

> জ্যোতিপ্রকাশের মৃত্যু মনে রাখো, তুমি?
>
> মুঠোর বোতাম আজ অন্য শার্টে সেলাই করেছো
>
> রহস্যের কিছু নেই আজ আর, তবু
>
> তোমাকে বনের মধ্যে ছুটে যাওয়া পথ মনে হয়

কিংবা

> দুদিকে কামড় লাগা যে ফল, কখনও তা গড়িয়ে যাবে না
>
> পিছনের পথে আজ মোরগের পালক ছড়ানো

বলোনি স্বামীকে তবু ওষুধ খেয়েছো, কিন্তু শোনো —

এতোদিন পরে কেউ এভাবে কাঁদে না।

কিংবা

সোনা চালানের দলে কিছু কিছু সঞ্চয় করেছি

ধানের মঞ্জরী হাতে তুমি এলে বন্ধুর বউ

বরং অনেক কথা বলা যেতো বোবা হলে, ধর্মভীরু হলে

বাঙালিস্বভাবে নেই ঘোড়া নিয়ে ফসল পাহারা।

এরকম বেশকিছু সংকেতধর্মী কবিতা, যেখানে পঙ্‌ক্তি থেকে পঙ্‌ক্তির মধ্যকার ফাঁকা জায়গায় অস্ত যায় আরও অনেক পঙ্‌ক্তি। জেগে থাকে মাত্র যে-কয়টি পঙ্‌ক্তি, তাদের মধ্যকার সম্পর্কসূত্রটি হয়ে থাকে অনেকটাই ঝাপসা, অচেনাপ্রায়। মনে হয়, পঙ্‌ক্তিগুলি যেন ডুবোপাহাড়ের জেগে থাকা একেকটি চূড়া, যেখানে পাহাড়শ্রেণির অনেকটাই ডুবে রয়েছে পানির নীচে। এইভাবে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি বাদ করে দিয়ে-দিয়ে এগিয়ে চলে তাঁর কবিতা। কবিতা হয়ে ওঠে ইশারাপূর্ণ, সাংকেতিক। বাংলা কবিতায় সূচিত হতে দেখি এক নতুন ঘরানার গূঢ়লেখ কবিতাধারা। এখানে একটু বলা দরকার, সেই সময় আমরা পেয়েছিলাম আরেকটি অবাক-করা সংকেতভাষ্যময় কাব্যগ্রন্থ; কবি শঙ্খ ঘোষের *পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ*। সেই বই-এর কবিতাগুলিও স্বভাবে অত্যন্ত নিবিড়, সাংকেতিক, এবং চিত্রকল্পবহুল।

এরপর আমাদের হাতে আসে মৃদুলদার *গোপনে হিংসার কথা বলি*, যেখানে আরও পরিণত, আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখি তাঁর সেই সংকেতভাষ্যময় কবিতার লীলালাস্য, বিশেষ করে *রান্নাঘর* সিরিজের অসাধারণ সব কবিতায়। কবিতাগুলি যেন একইসঙ্গে অন্তর্জাগতিক ও বহির্জাগতিক; একইসঙ্গে স্বগতোক্তিময় ও সোচ্চার। যেন এক নিবিড় অন্তর্গত স্বরে স্ফুরিত হয়ে উঠেছে সমাজ ও রাজনীতির নানা বিষয়-ব্যাপার।

সম্প্রদায় ধর্মভীরু, বংশে বংশে সতীদাহ, তারই মধ্যে
আমি এই তৃতীয় বিশ্বের কোণে হাঁড়ি বসিয়েছি।
আমার দরকার হাতা, কড়া, খুন্তি, ছুরি, বঁটি, শিক, শূল,
কামান-বিমান...
তেলে জলে বর্ণভেদ, আলু-মাংসে ধর্মভেদ — আমি তাই
নুন লঙ্কা মশলা মাখাই।
মানে করো এ মশলার, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবো... ততোক্ষণে
তেজপাতা সহয়োগে ঘন ঝোল লাল করে তুলি।

রান্নাঘর সিরিজের কবিতাগুলির পটভূমিতে আবছা জলছাপের মতো জেগে থাকে সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ। আর সে-পটভূমিকে ছাপিয়ে সামনে উঠে আসে কবিতা। সমাজ, রাজনীতিকে উপজীব্য করে যে এরকম নিম্নকণ্ঠ, ব্যঞ্জনাধর্মী, শিল্পোত্তীর্ণ কবিতা লেখা যায়, সচরাচর তা দেখা যায় না। কারণ সমাজ-রাজনৈতিক কবিতাকে সচরাচর আমরা দেখে এসেছি অনেকটাই স্পষ্ট, সরাসরি, সোচ্চার, কিংবা কখনো-কখনো শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমায়। যদিও আমরা জানি, কবিতা কবিতাই। কবিতাকে ঘিরে অনেক কথা ও কোলাহলের পর কবিতা আসলে চূড়ান্ত বিচারে এক সৌন্দর্য-সৃজনকর্মই। কবিতার সঙ্গে তাই 'প্রেমের', 'বিরহের', 'রাজনীতির', 'সমাজবাস্তবতার', ইত্যাদি বিশেষ কোনো অভিধা যুক্ত করাটাই, এক অর্থে, অবান্তর।

আবার বইটিতে রয়েছে এমন কিছু কবিতা যেগুলি বিকশিত হয়ে ওঠে বোধ্যতা ও দুর্বোধ্যতার টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে, ধরা-অধরার দোলাচলের মধ্য দিয়ে। পাঠককে হাতছানি দেয় আলেয়ার কুহকী আলোর মতো। *খাদ্য* কবিতাটির কথাই ধরা যাক।

ঘুম এক ম্লান আমি কী করে বোঝাবো, কিন্তু ম্লান।
মানো তুমি তরঙ্গ-নির্ভর,
অবাক প্রবেশপথ, ধর্ম কোলে, সত্য মিথ্যা ঢাকা
দেহকেন্দ্রে জাগে রান্নাঘর।

দেখো যে ত্বকের বর্ণ বদলে যায়, ঠিক অতর্কিতে নয়, যায়।
স্বর, ভাষা, সকলই উত্তাপ।
পাশে শুলে উচ্চতারও কথা হয় খাদ্যে খাদ্যে, বোবা,
এবং স্বপ্নের মধ্যে সাপ।

এবং কবি মাঝে-মাঝেই উচ্চারণ করেন আপ্তবাক্যের মতো কিছু বাক্য...

'সূর্য ও আগামীকাল সমার্থক।'

'একটি ধানের বীজে সমুদ্র আকাশ মাটি ব্যাখ্যা করা যায়।'

'অবিশ্বাসীর মাংস শেষতক রেঁধে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না'।

'যে রাঁধে সে কোনোদিন নিষ্ঠুর হয় না'।

'রূপ মাত্র অন্ধকার।'

'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহে কে না জানে সন্ধ্যাই সকাল।'

'নিশীথে কেঁদো না নারী, ক্ষুধা এক অনিবার্য প্রণয়ের ফল'

'বলি কি ধর্মের কথা, যত গ্রন্থ তত দুর্ঘটনা'

আগেই বলেছি, বাংলাদেশের মূলধারা-কবিতা তখন শৈলীতে, বুননে ও গাঁথুনিতে অনেকটাই বর্ণনাত্মক ও ডিফিউসিভ। এমন একটি সময়খণ্ডে অনেকটা অভাবিতপূর্বভাবে শঙ্খ ঘোষের *পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ* আর মৃদুল দাশগুপ্তের *এভাবে কাঁদে না* ও *গোপনে হিংসার কথা বলি*-র ঘনবদ্ধ, মিতভাষ ও ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে বাংলাদেশের অভিনিবিষ্ট অনেক কবি ও পাঠকই তখন আলোড়িত, উদ্দীপিত। মৃদুলদার কবিতার ভাব-ভাষা-আঙ্গিকের অব্যবহিত প্রভাব-প্ররোচনার ছাপও পড়তে থাকল কারো-কারো কবিতায়।

মনে পড়ে, সে-সময় কবি শামসুর রাহমান তাঁর সম্পাদিত *বিচিত্রা* পত্রিকায় মৃদুলদার *অহঙ্কার* কবিতাটি ছাপিয়েছিলেন যত্ন সহকারে। *বিচিত্রা*-র ওই সংখ্যাটিতে পাশাপাশি মুদ্রিত অন্যান্য কবিতার মধ্যে তাঁর কবিতাটি ছিল যেন চেনা হংসমালার মাঝে অচেনাপ্রায় আগন্তুক হংসের মতো। বেশ আলাদারকমভাবে ফুটে উঠেছিল কবিতাটি। কবিতাটি শেষ চারটি পঙ্‌ক্তি ছিল এরকম :

ফাঁস করো কীভাবে সোনালি পোকা
ডিম ভেঙে সুতো বেয়ে নির্ধারিত তাপাঙ্কে পৌঁছোয়
আলপিনে আলপিনে ক্রমে অনর্গল চিঠিপত্রে ঢেকে যাবো আমি
আমার ভূমিকা হবে, সেক্ষেত্রেও, অনুবাদকের।

এর আগে-পরে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে মৃদুলদার কবিতা, বাংলাদেশে এসেছেন তিনি বিভিন্ন সময়ে, কবিতা পড়েছেন, কথা বলেছেন... ঘরোয়া আড্ডায় কিংবা অনুষ্ঠানে। আন্তরিক জানাশোনা, হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব হয়েছে কবিসাহিত্যিকদের সঙ্গে। তাঁর অন্তরঙ্গ উচ্চারণ, কথা, কবিতা বেশ সমাদৃত হয়েছে বাংলাদেশের কবি ও কবিতানুরাগীদের কাছে।

এভাবে কাঁদে না ও *গোপনে হিংসার কথা বলি* পাঠের বেশ পরে মৃদুলদার প্রথম বই *জলপাইকাঠের এসরাজ* পাঠের সুযোগ হয় আমার। আগের লেখা কবিতা পরে পাঠের কারণে কিনা জানি না, আমার কাছে মনে হয়েছে গ্রন্থটি যেন এক সংযোগপুস্তক, যার মধ্যে ঐতিহ্যবাহিত প্রচল কাব্যস্বরের সঙ্গে দ্রবীভবন ঘটেছে কবির নিজস্ব বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের। নতুন কাব্যভাষায় রূপান্তরিত হবার আগে প্রচল কণ্ঠস্বরটি যেন কিছুটা প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং কিছুটা দমও নিচ্ছে এই *জলপাইকাঠের এসরাজ* বাদনপর্বে — এরকমটাই মনে হয়েছে আমার। বইটির কবিতাগুলির মধ্যে *উইপোকা*, *ভারতবর্ষ*, *গোপন ভারতবর্ষ*, *গ্রাম চাঁপাডাঙা — ৩০২০*, *জিরাফ* সহ বেশ ক-টি কবিতা ভালো লেগেছে।

পরবর্তীকালে আমরা একে-একে পেলাম তাঁর *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*, *সোনার*

বুদ্বুদ। এই বই দু-টির কবিতাগুলিও, বলা বাহুল্য, সংহত, সংযতবাক ও স্বগতোক্তিময়। বই দু-টির প্রায় সব কবিতাই ভালো লেগেছে আমার, বিশেষ করে *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-র সব কবিতাই অনবদ্য।

রূপ মাত্র অন্ধকার। সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহে কে না জানে সন্ধ্যাই সকাল।
আমি তো ভূতের হাসি টের পাই দিবসেও, অধিকন্তু নিশীথের
অর্থভেদ ক'রে
সঞ্চয় বাড়াই, দেখি চতুর্দিকে লাস্যময়ী বিবিধ রমণী।
কেউ বা ভাষার ভুলে দ্বারে উপস্থিত আর
কারো কারো রন্ধনের ছন্দে মৃদু ত্রুটি।
পত্নী একজন হবে। সে ওড়ে সংকেতে তার কৌতূহল ধর্মের সমান বলে
উড়ন্ত আমিও
হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ, পিঠে বোঝা বাসনের; স্বপ্নে দেখি
কন্যা ঘুমে, পুত্র যায় শিস দিতে দিতে

এরকম সব সুন্দর শিল্পোত্তীর্ণ কবিতায় পূর্ণ মৃদুলদার সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহখানি।

সামগ্রিকভাবে, মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা যেন অনেকটা সেই প্রিজমের মতো, যা গ্রাস করে নেয় ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় থেকে বিকীর্ণ-হওয়া বিচিত্র সংকেত। এবং প্রিজমের ভেতরে ঘটে যায় সেইসব সংকেতের সূক্ষ্ম সংবেদনশীল প্রতিসরণ। ফলাফল হিসাবে আমরা পাই এক ঘনসংহত বর্ণালীবিন্যাস, যা তাঁর কবিতার এক অনুপম শনাক্তচিহ্ন।

কবিতা ছাড়াও গদ্য, ছড়া, কথাসাহিত্য রচনা করে চলেছেন মৃদুলদা। আর আমরা তো জানিই, একজন প্রকৃত কবির লেখা গদ্য সবসময়ই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, দ্যুতিময়, অনবদ্য। অগ্রজ কবি বিনয় মজুমদারের ওপর মৃদুলদার লেখা ছোট্ট কিন্তু দ্যুতিময় এনার্জি-ঠাসা গদ্যটি খুব আলোড়িত করেছিল আমাদের। তাঁর অপরাপর গদ্যগুলিও আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছে বহুদিন। কবিতা ও গদ্যের পাশাপাশি শিশুসাহিত্য রচনাতেও তাঁর মুনশিয়ানা দেখেছি আমরা। তাঁর লেখা আমার প্রিয় একটি ছড়ার উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে আপাতত শেষ করছি বাংলাভাষার এই গুরুত্বপূর্ণ কবির কৃতির ওপর এক অর্বাচীন অনুজের এই অকিঞ্চিৎকর লেখাটি।

সরস্বতীর বীণা
সত্যি বাজে কিনা
দেখতে গিয়ে হাত লাগিয়ে
ধমক খেল তৃণা।

সরস্বতী নিজে
পড়তেন কেমব্রিজে?
বৃষ্টিতে গিয়েছে তার
সার্টিফিকেট ভিজে।

সরস্বতীর হাঁস
সেও কি এমএ পাশ?
কোন বিষয়ে ডক্টরেট?
প্রাচীন ইতিহাস?

এসব ছড়ায় সরস্বতী
ভয়ঙ্কর চটে
বিদ্যে দেননি এই কবিকে
বুদ্ধি দেননি মোটে।

নক্ষত্রে রচিত এই সন্ধ্যাভাষা

বিশ্বজিৎ পাল

নির্বাচিত কবিতা-র ভূমিকায় মৃদুল দাশগুপ্ত বলেছেন — 'আমার গ্রন্থগুলিতো নির্বাচিত কবিতারই সংকলন, তাই চারটি কবিতাগ্রন্থই এই পুস্তকে অটুট একত্রিত'। যদিও আমার পাঠপ্রক্রিয়া যথেষ্ট অসমতল, এলোমেলো, তবু যতদূর মনে পড়ে ভারবি প্রকাশনা থেকে অরুণকুমার সরকারের যে শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার সূত্রপাতে অরুণবাবু জানিয়েছিলেন, তাঁর এযাবৎ রচিত কবিতার সংখ্যা এতই কম যে এই বইটি আদতে তাঁর কবিতাসংগ্রহ। যদিও মৃদুল দাশগুপ্তের বক্তব্যের অভিপ্রায় আমার অরুণকুমার সরকারের থেকে কিছুটা ভিন্নতর মনে হয়েছে। তবে পাঠক এর সঙ্গে সহমত না-ও হতে পারেন। যেকোনো বই (বিশেষত কবিতা) পাঠ করবার সময় পাঠকের হৃদয়-মস্তিষ্কে একধরনের গ্রহণ-বর্জনের স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। কিছু কবিতা তার প্রিয় অন্তর্জগতে ঢুকে পড়ে সীমানা পার হয়ে, কেউ-কেউ অপেক্ষমাণ থেকে যায়। এই গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়া আবহমান কাল ধরে চলছে সবরকম সৃষ্টিশীল শিল্পমাধ্যমের চরাচরে।

'নির্বাচন', এই শব্দবন্ধের অন্তস্তল থেকে উঠে আসে বেছে নেবার সদর্থক অভিপ্রায়। হয়তো মৃদুল দাশগুপ্ত মনে করেছেন, যখন একটা কবিতার বই-এর জন্মস্থানই গ্রহণ-বর্জনের অববাহিকায়, তখন পুনর্নির্বাচন অপ্রয়োজনীয়। হয়তো তাঁর মনে হয়েছে, এই পুনর্নির্ধারণ, সৃজনশীলতার পক্ষে কিছুটা হলেও অবমাননাকর। তবে আমার সামান্য কবিতা রচনা করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি — দশ বছর আগে যে আকাশের নীচে একটি নতুন কবিতার বই উন্মোচিত হয়েছিল, দশ বছর পর নতুনতর গগনবিস্তারে ওই বই পুনর্পাঠের সময়, দু-চারটে শব্দ, কিছু কবিতা মৃদু অপ্রাসঙ্গিক মনে হতেই পারে। কারণ আমাদের জীবন-অভিজ্ঞতা স্থিতিশীল নয়।

এবার কবিতায় ফেরা যাক। সূচনায় প্রণয়লিপ্সু, ছন্দকুশল, সংগীতময়, জেদি, সামাজিক অসাম্যে ক্ষিপ্ত যে তরুণ কবির কবিতার মুখোমুখি হই আমরা তীব্র *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এ, পূর্বসূরিদের প্রভাব কাটিয়ে তা ক্রমশ সমতলগামী নদীর মতো বিস্তৃত, প্রশান্ত গভীর হয়ে ওঠে শেষের আটটি চতুর্দশপদী কবিতায়। রহস্যময় জীবন-সংকেতের দিকে ঝুঁকে থাকা শেষ আটটি কবিতার আশ্চর্য শৈলী, মৃদুল দাশগুপ্ত আমাদের অবাক করে দিয়ে হেলায় বর্জন করেন তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ *এভাবে কাঁদে না*-তে। পাঠকের মনে হতে পারে, নিজের আবিষ্কৃত সাবলীল নিবিড় কাব্যপথ কেন বর্জন করলেন কবি, কোন অভিপ্রায়ে? এমনকী, প্রিয় অন্ত্যমিলের খেলা থেকেও সরিয়ে নিলেন নিজেকে।

অভিনব, সাংকেতিক এক রহস্যভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন তাঁর *এভাবে কাঁদে না* কাব্যগ্রন্থে। কিন্তু বলবার অনায়াস ভঙ্গি দেখে মনে হল — যেন কতকালের চেনা, তাঁর এই পথঘাট, ঘরবাড়ি, মানুষজন, পশুপাখি। যেন ফেরত এলেন প্রিয় বাসভূমিতে। যদিও পাঠক কিছুটা ধন্দে পড়লেন, দোলাচলেও। গোল কবিতা, আদি-অন্ত সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা কবিতা উধাও। কিন্তু অদৃশ্য সংযোগসূত্রে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝলমল করছে এই বই-এর কবিতার প্রতিটি লাইন।



প্রচ্ছদশিল্পী মৃদুল দাশগুপ্ত

এখানে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি — এই বই-এর রচনাকাল ১৯৮১-৮২ সাল এবং প্রকাশকাল ১৯৮৬ সাল — অপকবিতার বাণিজ্য প্রসারের কালো টুঁটি চেপে ধরা ঐতিহাসিক 'শত জলঝর্নার ধ্বনি'-র কৃষ্ণনগর সম্মেলনের মাত্র তিন বছর আগে। বস্তুত এই বইটি ছিল ওই সম্মেলনের অগ্রিম, তীব্র ঘোষণাপত্র, নরকের ডাকছাপ দেওয়া একটি তীক্ষ্ণ সতর্কতার চিঠি। কাব্যবণিকেরা এটি অনুধাবন করেছিলেন অনেক পরে, শব্দহীন বাণে ভূপতিত হয়ে পড়ার পর।

সত্তর দশকের শেষ দিক থেকেই একটা সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল বাংলা কবিতায়। কল্পমনীষানিবিড় কোনো নবীনতর কাব্যভাষার উন্মেষের প্রয়োজনে ছিল হয়তো। এর প্রায় ছ-সাত বছর পর *এভাবে কাঁদে না* প্রকাশিত হয় এবং আমরা বিপুলভাবে সংক্রমিত হই। মধ্য আশি, নব্বই, এমনকী শূন্য দশকের কবিতা প্রয়াসীরাও, যাঁরা ভিন্নতর পথের সন্ধানী, জীবনে একবারের জন্য হলেও এই কাব্যগ্রন্থের অভিনব জাদুভাষার খপ্পরে পড়তে বাধ্য হয়েছেন, এবং বিচিত্র ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

এখানেই শেষ নয়, আরব গেরিলাদের সমর্থনের একটা চোরাস্রোত হয়তো জেগে আছে *এভাবে কাঁদে না*-র কিছু কবিতায়। কিন্তু পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে, ক্রমশ যাত্রাপথ প্রসারিত হয়েছে, ছড়িয়ে গিয়েছে মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে। কখনো উড্ডীন, কখনো অর্ধজাগ্রত, আবার কখনো তুমুল শিহরিত, অথবা অপেক্ষমান নিঝুম, ক্লান্ত ডানার কোনো পাখি, বিপন্নতা, অনিশ্চয়তা থেকে ক্রমাগত ফিরে আসবার আকাঙ্ক্ষা, এই সবই ছড়িয়ে থাকে তার কবিতা জুড়ে। সমস্ত পার্থিব সীমা পার হয়ে রান্নাঘর হয়ে ওঠে জীবনের আধার, ভূতগ্রস্ত আলোছায়ায় ক্রমাগত জেগে ওঠা সংলাপ, ছবি, কৌতুক, বিষাদ আবহমানের প্রসঙ্গকে ঘনীভূত করে।

নক্ষত্রে রচিত এই সন্ধ্যাভাষা পাঠোদ্ধার ক'রে
লিখলাম সংখ্যার মধ্যে শূন্য, আর শূন্যের ভেতরে যতো খাবার দাবার।
খেয়েছি গোগ্রাসে নিজে, তারপর তারাপথে ভ্রাতৃসঙেঘ ডেকে
বলেছি, ক্রিকেট ম্যাচ বৃত্ত টেনে একাদশ তারকা দরকার

কতো না অবাক পথ, পাড়া ঘুরে পথচ্ছায়া, এখনও নিশ্চিত
বাতাসের করতালি; এই আঁকি রঙিন নির্জন
বাগানের মধ্য দিয়ে আলাদা ভুতুড়ে মুখে
যাই যদি সন্দেশ লুকিয়ে —
ছাদের কার্নিস ঘেঁসে ঠিক সেই নীহারিকা মেয়েটি দাঁড়াবে

আলো-আঁধারের এক অনুপম জগতের ভেতর আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই সব নির্জন রূপবতী পঙ্‌ক্তিমালা। চারপাশে জেগে থাকে গভীর প্রণয়শব্দ, কুহকসরণি, গুঞ্জনের উপত্যকা, টঙে মুত্রত্যাগরত শশী, ঝর্না জলে ফুলে ওঠা শৃগালের শব, ঠোঁটে চন্দ্রহার নিয়ে বায়সপক্ষী, সুরায় মিশে যাওয়া অশ্রু।

সঙ্গীতময়, তরঙ্গমুখর, অনাবিল, ভাষা-ঝর্নাজলে আমরা অভিভূতের মতো নেমে পড়ি। স্নাত হই। আরও স্নাত হই।

নচেৎ পতনশীল, যদি না উড্ডীন রাখে আমাকে বাতাস
কারণ সরল গ্রীবা, পরিযায়ী, শূন্যে সাবলীল —
নিছক মদিরা হেতু কেবলই কল্পনা করি, হাঁস
— সঙ্গে সঙ্গে জনপদ, ব্যাধ, টোটা, বালকের ঢিল

ফলে রক্তাপ্লুত পড়ে ধানখেতে, অল্প অল্প শ্বাস...
ওড়াতে সচেষ্ট তাও হাত ধরে দুজন বাতাস

অন্ত্যমিল ফেরত আসে অননুকরণীয় কাব্যভাষায়। ক্রমাগত এক অনাবিষ্কৃত, উত্তরআধুনিক দেশকালের দিকে আমাদের নিয়ে যান মৃদুল দাশগুপ্ত, ভবিষ্যতগামী ভাষাপ্রকরণের আলোছায়ায় অলৌকিক রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে। মৃত বাণিজ্যকবিতার অসার স্তূপগুলো পার হয়ে, ডাকঘর-এর সুদূর পথিকের মতো দিগন্তের দিকে তাঁর হেঁটে যাওয়া চোখে পড়ে আমাদের। আরও দেখি, আধুনিকতার প্রত্নউপত্যকার ওপর সরল বালোকচিত আনন্দে দু-হাতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন নতুন কবিতার ইস্তেহার।

মৃদুল দাশগুপ্ত : প্রিয় কবি, প্রিয় বন্ধু

ফরিদ কবির

জন্মের পর যে দু-একজনের সঙ্গে পরিচয় না হলে জীবনটা অপূর্ণ থেকে যেত, তার মধ্যে একজন মৃদুল। মৃদুল দাশগুপ্ত। কবি। এ-সময়ের বাংলাভাষার একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি। মৃদুল আমার বন্ধু — এটা ভাবলেই আমার বুকটা ভরে যায়।

১৯৮৫ সালের কথা। *আবৃত্তিলোক*-এর সপ্তাহব্যাপী কবিতা উৎসবের উদ্যোক্তারা অনেকটা আকস্মিকভাবেই আমাকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে বসেন। বলা দরকার, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধেই আমাকে আমন্ত্রণ জানান *আবৃত্তিলোক*-এর অন্যতম কর্ণধার, আবৃত্তিশিল্পী ও অভিনেতা সৌমিত্র মিত্র।

বাংলাদেশ থেকে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, রুবি রহমান, আবু হাসান শাহরিয়ার সহ আরও কয়েকজন কলকাতার সেই কবিতা উৎসবে গিয়েছিলেন। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কবি রফিক আজাদ ও বেলাল চৌধুরীকেও। তাঁরা শেষ পর্যন্ত যেতে পারেননি।

কবিতা উৎসবে হাজির ছিলেন পশ্চিমবাংলার উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল কবি। তরুণ কবিদের মধ্যে আমন্ত্রিত ছিলেন কেবল জয় গোস্বামী, মৃদুল দাশগুপ্ত আর ব্রত চক্রবর্তী।

কিন্তু উৎসবের প্রথম কয়েকদিন তাদের দেখা মিলল না! তৃতীয় কি চতুর্থ দিন অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে আমার পাশের চেয়ারে এসে বসল এক তরুণ। জিজ্ঞেস করল — আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?

আমি মাথা নাড়লাম — হ্যাঁ।

তরুণটি আমার দিকে তার আন্তরিক হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল — আমার নাম মৃদুল। মৃদুল দাশগুপ্ত। আমিও আমার পরিচয় দিলাম।

মৃদুল বলল — চলুন, বাইরে গিয়ে কথা বলি।

আমরা বাইরে গেলাম। চা-সিগারেট খেতে-খেতে বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা দিলাম। সেদিনের পর মৃদুলের আর দেখা পাওয়া গেল না। কবিতা উৎসব শেষে আমরা ফিরে এলাম ঢাকায়। এবং বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমি প্রায় ভুলেই গেলাম তার কথা।

আমরা তখন নিয়মিত আড্ডা দিতে যাই বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে। সেদিনও গেছি। হঠাৎ এক তরুণ এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। তাকে চেনা মনে হলেও কিছুতেই তার নাম মনে করতে পারলাম না! এর কিছুদিন আগেই কুমিল্লায় একটা সাহিত্য সম্মেলনে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি বললাম — আপনার সঙ্গে কি কুমিল্লায় আলাপ হয়েছিল?

আমার একটা হাত তখনও মৃদুলের হাতের মুঠোয়। বলল — ফরিদ, আমি মৃদুল। মৃদুল দাশগুপ্ত।

আমি খুবই লজ্জা পেলাম।

মৃদুল সপ্তাহখানেক ঢাকায় ছিল। সে-সময় প্রায় দিনরাত ওর সঙ্গেই কাটাই। এবং ওই সময়ের মধ্যে কবিতা সম্পর্কে আমার প্রচলিত ধারণাটাই ও পালটে দিল। কবিতায় আমার আজ যেটুকু সামান্য অর্জন, তার পেছনে আছে মৃদুল। না। আমার জীবনে মৃদুলের ভূমিকা শুধু এটুকু — এটা বললে ভুল হবে। মৃদুলের বন্ধু হতে পারাও আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য অর্জনের একটি।

একটি মানুষের ভালো এবং মন্দ দুটো দিকই থাকে। আমি মৃদুলের মন্দ কোনো দিক আবিষ্কার করতে পারিনি। মৃদুলের কবিতা, মৃদুলের সঙ্গ, মৃদুলের পাগলামি — সবই আমি পছন্দ করি। মৃদুলের স্ত্রী মাধবী, ওর কন্যা মন্দাক্রান্তা — সবাই আমার অত্যন্ত আপনজন। আমি যে ঘন-ঘন পশ্চিমবাংলায় যাই, এর বড়ো

কারণ মৃদুল। মৃদুল শ্রীরামপুরে থাকলে পশ্চিমবাংলায় আমার ঠিকানা শ্রীরামপুর, কলকাতায় থাকলে আমার ঠিকানা কলকাতা! পশ্চিমবঙ্গে আমার আরও একজন বন্ধু আছেন, তিনি কবি গৌতম চৌধুরী। গৌতমের সঙ্গে আমার পরিচয় মৃদুলের সূত্রেই। শুধু গৌতমই নয়, মৃদুলের সূত্রে যাঁদের বন্ধু ও প্রিয়জন হিসেবে পেয়েছি, তাঁদের কাছ থেকেও তো কম কিছু শিখিনি। কবি কালীকৃষ্ণ গুহ, কবি রণজিৎ দাশ, কবি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় — তাঁদের সান্নিধ্য, তাঁদের ভালোবাসাও তো পেয়েছি মৃদুলের কারণেই।

আমার কোনো-কোনো কবিবন্ধু বলেন, মৃদুলের কবিতা কিছুটা টাইপ্‌ড়! শুরু থেকে এ-পর্যন্ত প্রায় একইরকম। কিন্তু আমি জানি, এ-মুহূর্তে বাংলাভাষায় মৃদুলই শুধু মৃদুল দাশগুপ্তের মতো লেখে। মৃদুলের নাম না থাকলেও আমি ওর কবিতা চিনতে পারি। আমার ধারণা, যাঁরা মৃদুলের কবিতা পড়েছেন, তাঁরা সবাই ওর কবিতা চিনতে পারেন। যে-কোনো কবিতা পড়ে একজন কবিকে চিনতে পারা যায় — এমন কবি বাংলাভাষায় খুব বেশি নেই।

আমি কি ওর অন্ধ ভক্ত?

মৃদুলের জন্য অন্ধত্ব মেনে নিতেও আমার আপত্তি নেই।

কোমল হৃদয় তাতার দস্যু

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

মিলন সম্পর্কে এই বিশেষণটাই সর্বপ্রথমে ভেবেচিন্তে ব্যবহার করছি। মৃদুল দাশগুপ্তকে 'মিলন' নামে ডাকবার আর বেশি কেউ নেই। এটা ওর ডাকনাম। তিনভাই আর বোনের মধ্যে ও-ই বড়ো। আমার থেকে দশ-এগারো বছরের ছোটো হলেও সে আমার বন্ধু ও পরামর্শদাতাও বটে। যদিও মৃদুল কবিতার অ-আ-ক-খ শেখার প্রসঙ্গে শৈলেনকুমার দত্ত, দেবদাস আচার্যের সঙ্গে আমার নামটাও করে, তবে সোজাসাপটা বলি, কবি হয়েই ও এসেছে, 'জাত কবি' বলতে যা বোঝায়, সেই বিরল শ্রেণির মধ্যে মৃদুল একজন। এক শহরে থাকার সুবাদে দীর্ঘ অন্তরঙ্গতায় এত কথা জমে আছে, যে কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি — এই ভাবতে-ভাবতেই সময় কেটে যাবে, লেখা এগোবে না। মৃদুলের বাল্য-কৈশোরের সন্ধিক্ষণের কবিতার খাতা আমার কাছে ছিল, ছিল *বাইসন* পত্রিকাটি, যে পত্রিকা দেব গঙ্গোপাধ্যায় আর মৃদুলের যুগলবন্দি কৌতুকে পূর্ণ ছিল। কানায়-কানায় আনন্দে পূর্ণ ডাক্তারবাগান লেন আর কাশীডাক্তার লেনের চলাচলের পথসংযোগটি। যখন আমি মৃদুলের বাড়ি যেতুম, মৃদুল আমার বাড়ি আসত। কত ঘটনা কত কথোপকথন জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। আগের কথা আগে বলি, পরের কথা পরে।

প্রথমেই বলি, মৃদুল কবি হয়েই জন্মেছে, ওকে কবি হতে হয়নি। ও প্রসঙ্গে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারি —

কবি তো হয়েই আসে...
একটি নক্ষত্র খসে পড়ার মুহূর্তে
একটি সমুদ্র তটচুম্বনের পর
একটি ভ্রমর পরাগস্পর্শের পর
কবি জন্ম নেয় স্বভাবের দোষে...

হ্যাঁ, মৃদুলকে কবি হতে হয়নি। ওর কথায়, আচরণে, স্বপ্নে, ভাবনায় কবিতা ছাড়া বাকি সবকিছু গৌণ।

এবার বলি, কেন আমি মৃদুলকে 'কোমল হৃদয় তাতার দস্যু' বলেছি। ওর ভেতরটা খুব নরম, বাইরে একটা কঠিন আবরণ। মৃদুল বরিশালের গৈলা গ্রামের ছেলে। সেই গৈলা গ্রাম, যেখানে মঙ্গলকাব্যরচয়িতা বিজয়গুপ্ত জন্মেছেন। বরিশাল রত্নপ্রসবিনী জেলা। অনেক কবির জন্মভূমি। এ-নিয়ে মৃদুলের গর্বের শেষ নেই। কিশোর বয়সে *সন্দেশ* পত্রিকা পাঠে তন্ময় থাকত সে। মেজভাই অঞ্জন আর ছোটোভাই অম্লান দেখত, ওদের দাদাভাই ছবি আঁকায়, ছড়া লেখায় প্রথম থেকেই কত পটু। ওর প্রথম কবিতা সম্ভবত আমি ছেপেছিলাম আমাদের *শীর্ষবিন্দু* পত্রিকায়। প্রথম কবিতাতেই ফুটে উঠেছিল বিশাল এক সম্ভাবনার ছবি। ওর প্রস্তুতিপর্বেই জয়ের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়। মৃদুল আর জয় কিশোর বয়সে আমার বাড়ি এসেছে নতুন কবিতা নিয়ে। আজ হয়তো একসঙ্গে ঘোরাফেরা ওদের হয়ে ওঠে না, কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করা যায় না, সত্তর দশকের এই তরুণতম দুই কবির হাতেই নিহিত ছিল আগামী কয়েক দশক কবিতা সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের শক্তি। সেভাবে জুড়ি-বাঁধা থাকলে পঞ্চাশের যুগলবন্দি দুই স্বনামধন্য কবির মতো এরাও হয়ে উঠত মুগ্ধ বিস্ময়ের ফ্রেমে-বাঁধা হিরে-মানিক কিংবা মধু-কৈটভের মতো অমিত শক্তির দুই যোদ্ধা পুরুষ, স্বয়ং বিধাতা ব্যতিরেকে যাদের কেউ থামাতে পারত না! কিন্তু যা হয়নি, তা হয়নি। কচিৎ দু-একটা যুগলবন্দি কবিতাপাঠ ছাড়া মৃদুল ও জয়কে বাংলাদেশ পেল না। আমি তাদের একসঙ্গে কবিতা পড়তে দেখেছি বালি লাইব্রেরিতে, *বোধশব্দ*-এরই আয়োজনে, বেশ ক-বছর আগে। এমন কবিতাপাঠের আসর — এ পৃথিবী একবার পায় শুধু, পায় না কো আর!

কাহিনিকার্টুন

চতুর ইঁদুর মৃদুল

মৃদুল তখন প্রাইমারিতে। বেশির ভাগ বন্ধুর জিভেই 'ঋ' নেই। 'মৃদুল' বলতে হোঁচট খায়। বন্ধুমহলে 'ইঁদুর' নামটাই পাকা হল। তখন খেপতেন। এখন গর্ব করেন। ভারতচন্দ্র আউড়ে যুক্তি দেন, ইঁদুর একটি চতুর প্রাণী। আর, অতীতে নাকি কবিকে 'চতুর' বলা হত।



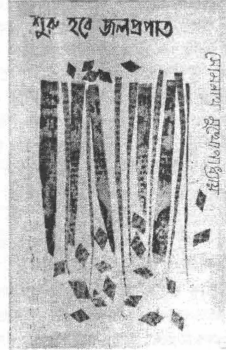


বিভিন্ন কোরাস পত্রিকার কবিসম্মেলনে কবিতাপাঠ; শ্রীরামপুর, ১৯৭৩

মৃদুল যেন এক উদাসী হাওয়া। এক বিচিত্র উদাসীনতা তাকে ঘিরে থাকে। বাহ্যিক দেখলে মনে হতে পারে যেন কিছুতেই ওর তেমন কোনো আগ্রহ নেই। ও কোনোদিন কিছু চায় না, পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে না। অথচ ওর থেকে কেউ কিছু চাইলে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেবে। ওর নিতে ভালো লাগে না। সে কারো দেওয়া সুযোগ বা ভাগ্য-পরিবর্তনের চাবিকাঠি — যাই হোক না কেন। আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি ও কাউকেও রেয়াত করেনি তাদের দাক্ষিণ্য ফিরিয়ে দিতে। সব কথা সব সময় অকপট বলা যায় না, নানা বিধিনিষেধ, রীতি বা সহবত থাকে, তাই একের পর এক ঘটনা বলা গেল না। তবে দু-একটি তো নামধাম গোপন করে বা পালটে বলাই যায়, তাই না মিলন? ঠিক আছে, কথাপ্রসঙ্গে এলে পরবর্তী সময়ে লেখা যাবে না হয়।

মৃদুল অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের এবং প্রচণ্ড অভিমানী। এমন লোককে যে সামলানো শক্ত, সে কথা মুনমুন নিশ্চয়ই বুঝেছে। মুনমুন অর্থাৎ মাধবী, মৃদুলের সহধর্মিনী। 'সহধর্মিনী' শব্দটির এত সুন্দর নমুনা আমি খুব কম দেখেছি। একটা পিকনিক থেকে ওদের আলাপ। ট্রেনে দু-একটা কথা। কী জানি কী ছিল বিধাতার মনে — মাধবী দেখল মিলনকে। চাপা অভিমানী চোখ, স্বল্প কথা আর উদ্ধত ভঙ্গিতে এড়িয়ে যাওয়ার সিগারেটে টান। সে আলাপ তাই বাড়তেই মৃদুলের আহত হৃদয়ে বিশল্যকরণীর ছোঁয়া লাগাল মুনমুন। মৃদুলের প্রেমের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। আজ মৃদুলের যে প্রেমের কবিতা নিয়ে এত হইচই আলোচনা — এসব কিছুই হত না, যদি না মাধবী তার স্নিগ্ধ উপস্থিতি দিয়ে ভুলিয়ে দিত এক কবির যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত আমি জানি, জানে আরও কেউ-কেউ। জানে শ্রীরামপুরে কাশী ডাক্তার লেনের এক অদ্ভুত গঠনের বাড়ি। মিলনের অনেক কবিতার উৎসসাক্ষী ওই বাড়িটি, যে কথা বলতে পারে না। সুতরাং সে-কথা অন্যেরাও জানল না। তবে একথা আমাকে মানতেই হবে, মৃদুলের মাধবী যেন ঘড়ার মাপে ঢাকনির মতো। হলপ করে বলতে পারি, মাধবী ছাড়া আর কেউ পারত না একটা সৃষ্টিছাড়া বেহিসাবি স্বপ্নসদাগরকে সামলাতে। অনেকে ঈর্ষা করতে পারে, মৃদুল আজ পর্যন্ত কোনোদিন আলু-পটলের দর জানে না, চিনতে পারে না লাউশাক আর কুমড়ো শাকের পার্থক্য। সংসারে লেখালিখি ছাড়া বাকি সব কাজ সুনিপুণ সমাধা করার দায়িত্ব কবিগৃহিণীর। এই মুহূর্তে মিলন জানেও না, তার নীল জামাটা কোথায় আছে। ঠিক আছে, না হয় না-জানাই রইল। পাঠকের কবিতা পেলেই হল।

মৃদুল মাকে খুব ভালোবাসত। ওর জীবনে অনেকখানি প্রভাব ওর মায়ের। মাসিমা আমাকেও দেখতেন তাঁর আর-এক ছেলের মতন। শুধু একবার তাঁর মুখে গাম্ভীর্য দেখেছিলাম আমারই নির্বুদ্ধিতার জন্য। সত্তর দশকের মাঝামাঝি হবে, আনন্দবাজার *রবিবাসরীয়*-তে আমার একটা গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটার নাম ছিল *আজ রবিবার*। ঘনিষ্ঠতার কারণেই হয়তো হবে, সাত-পাঁচ না ভেবে গল্পের নায়কের নাম দিই মৃদুলের নামে, আর অবিবেচকের মতো ডাক্তারবাগান নামটিও ঠিকানায় থাকে। নায়কের বাবা মারা গেছে, সে কাঁদতে পারছে না, পরে রাত্রে ছাদে গিয়ে সে অঝোরে কাঁদে — এটাই ছিল মূলভাব। আমি বুঝিনি ওই গল্পটি মাসিমা বা মৃদুলের পরিবারে কী আলোড়ন তুলতে পারে। মৃদুল আমায় কিছু বলেনি, কিন্তু ওর বন্ধু-বান্ধব অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিল আমার ওপর। আমি অবশ্য বোঝাতে চেয়েছি, ইচ্ছা করে কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে লিখিনি; জানতাম না, এমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে। দু-একদিন পরে মাসিমা আবার স্নেহের ডাক দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সে গল্পের কপি আমার কাছে নেই। রমাপদদা বলেছিলেন, ভালো হয়েছে গল্পটা। কিন্তু সে-মন্তব্যের আনন্দ উপভোগ করতে পারিনি। বাস্তব ঘটনা গল্পের মতো হয়নি। মাসিমা আগে চলে গেছেন, অনেকদিন পরে মেসোমশাই। সেদিন মিলনের বাড়ি গিয়ে মন্দাক্রান্তাকে দেখে চমকে উঠেছি। মনে হল, যেন মাসিমা ফিরে এসেছেন। তাঁর যৌবনের ছবি মন্দাক্রান্তার মুখে। পরে শুনলাম, কেউ-কেউ নাকি বলেওছে এমন কথা।



প্রচ্ছদশিল্পী মৃদুল দাশগুপ্ত

আর একবার মিলনের উল্লাস দেখেছিলাম, যেবার ও বাবাকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে জন্মভিটা স্পর্শ করিয়েছিল। বরিশাল জেলা তার মস্ত অহংকারের জায়গা। একটা সময়ে মিলন উগ্র রাজনীতি-আন্দোলনের একজন হয়ে দেশ জুড়ে খুব ঘোরাঘুরি করেছে। সেইসময় থেকেই পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশের বহু জায়গায় গিয়েছে। চম্বলে গিয়ে সাংবাদিক হিসেবেও যে প্রতিবেদন লিখেছিল — তার জনপ্রিয়তা আজ গল্পকথা। কুরোশিয়ো-র *সেভেন সামুরাই* মিলনের খুব ভালো-লাগা সিনেমার মধ্যে অন্যতম। আমার মনে হয়, কোনো এক জন্মে মিলন হয়তো ওইরকম এক সামুরাই ছিল, যার তরবারির তীক্ষ্ণতা এখন কলমের মধ্যে রয়েছে। তীক্ষ্ণতা আর তীব্রতা নিয়েই মৃদুলের কবিতা অভিযান। আমার আশা ও আনন্দ, এই অভিযান দেখতে-দেখতেই যেন ঘুমিয়ে পড়ি।

লিডার

দীপন মিত্র

মফস্‌সল থেকে এল এক দেবদূত
আমাদের এই বৈঠকবাজারে
জল থেকে ওঠা তার ভাষা
যেরকম উঠেছিল দ্রাক্ষালতা একদা ভেনাস।
নিজেকে নিদ্রিত দেখা তার অধিগত
নিজেকে ফেরত পাওয়া মৃত্যুপরে পুরনো পাড়ায়
তাকে দেখি সন্ধ্যাকালে রাত্রিকালে বিশুর দোকানে
চা ও সিগারেটে আলো করে আমাদের ষষ্ঠীতলা
ময়রাডাঙার অলিগলি...

কবিদের আমার দিওয়ানা, বেগানা এক-একটি দেবদূত বলেই মনে হয়। তাদের উড়ন্ত, নিয়মভাঙা, বেপরোয়া অতি-জীবন, শব্দে-ছন্দে মাদারির খেলা আর ভাঙা-ভাঙা, নেশাতুর ভাষায় লেখালিখি আমাকে খুব টানে। আমার এই ছোটো লেখা এমনই এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে কিছুটা সান্নিধ্যের সামান্য আখ্যান। আমার এই দেবদূত কবি মৃদুল দাশগুপ্ত। তাঁকে আমি 'মৃদুলবাবু' বলে সম্বোধন করি।

ময়রাডাঙার মোড়ে ষষ্ঠীতলা। এই মোড়ের মাথা থেকে দক্ষিণদিকে একটু এগোলেই গোপাললাল ঠাকুর রোডের ওপর বন্ধ বিআই কোম্পানির উলটোদিকে খাতা-পেনসিল-বই-এর দোকান 'লিডার'। আমাদের আড্ডার ঠেক, আমাদের বৈঠকবাজার। সুবীরের দোকান। সুবীর সঙ্গীতপ্রেমী, কবিতাপ্রেমী। কবিতার স্বাদ সে সুরার মতো পরখ করতে জানে। তার এই আড্ডার ঠেক দুর্লভ। ফেরিওলা থেকে ডাক্তার, শিক্ষক থেকে দোকানদার, শিল্পী, লেখক, কবি — কার আনাগোনা নেই। কতরকম আলোচনায় বুঁদ হয়ে থাকে এই ঠেক। তা, আমাদের দেবদূত অর্থাৎ মৃদুলবাবু সারাদিনের সংবাদপত্রে কাজের ক্লান্তির শেষে বাড়ি ঢোকার আগে বাস থেকে টুক করে নেমে ঢুকে পড়তেন এখানে। একটু ভুল বললাম। লিডারে ঢোকার আগে ষষ্ঠীতলার মোড়ে বিশুর দোকানে এক কাপ চা। বিশু ও আশে-পাশে আড্ডারত তরুণদের সঙ্গে হাসি-মস্করা। সকলেরই তিনি প্রিয় মৃদুলদা, চা বা সিগারেটের যথেচ্ছ বিনিময় হয়। রাত দশটা পেরিয়ে গেছে। গোপাললাল ঠাকুর রোডে গাড়ি-বাস কমে গেছে। পথের ধুলো শান্ত। সেই সময় দোকানের মেজেতে পুরোনো কাগজ পেতে গোল হয়ে বসত আড্ডা। গল্পের রাজা তিনি। সামান্য একটা ঘটনা, তাকে রহস্যমণ্ডিত করে প্রায় অলৌকিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার তার সহজ ক্ষমতা। ফলে তাঁকে পেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠত আমাদের আড্ডা। আর বিষয়ের অভাব তাঁর ঘটত না। তাছাড়া সাংবাদিকতার সুবাদে আমাদের অজানা অনেক গোপন খবর, দেশ-বিদেশের অনেক অজানা তথ্য তাঁর আঙুলের ডগায়। আর বাংলাদেশ তো তাঁর পাশের জেলা যেন। পূর্বপুরুষেরা বরিশাল থেকে এসেছেন। বাংলাদেশ বলতেই মাতাল। বাংলাদেশের কবিতা ও কবিরা তার বুকের ভেতর বাস করেন। শ্রীরামপুর তাঁর মাতৃভূমি। শ্রীরামপুর বলতে অজ্ঞান। এক রাউন্ড দু-রাউন্ড চা আর আড্ডা। সবশেষে তাসের জমাট আসর প্রায় রাত বারোটা পর্যন্ত। তাস খেলার সঙ্গী বাপি, কানুদা, সতীনাথ। বাপি দোকানি, কানুদা ধূপ বিক্রি করেন আর সতীনাথ ভিডিওগ্রাফি করেন। মৃদুলবাবু এঁদের চোখের মণি। মাঝরাতে তাঁরা অনেকদিনই তাকে বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসতেন। লিডার থেকে বাড়ি ফেরার পথে টবিন রোডে যতীনের চায়ের দোকান। সে-দোকান মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখানে আবার এক রাউন্ড চা আর ভাঙা-ভাঙা গল্পগাছা। তা এরকমই নক্তচারী আমাদের মৃদুলবাবু। মাঝরাতে বাড়ি ফেরেন। তখন স্ত্রী-কন্যা নিদ্রায়। চান-টান সেরে খাওয়া। একটু টিভি, মাঝে-মাঝে ধূমপান। আর প্রায় তন্ত্রচর্চার মতো বাগদেবীর সঙ্গে ভোররাত তক মোলাকাত-মোহব্বতের চেষ্টা। ফল পেতাম আমরাও কখনো-সখনো। পরের কোনো তপ্ত দুপুরে দোকানের গভীর ছায়ায় বসে হঠাৎ তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে ভাঁজ-করা বেশ কিছু কাগজের মধ্যে থেকে আরও ভাঁজ-করা দু-এক পাতা বেরিয়ে আসত। একটা-দুটো নতুন কবিতা। কবিতাগুলোর আলাদা করে কোনো নাম থাকত না। *নতুন কবিতা* ১, *নতুন কবিতা* ২ — এইরকম। আমাকে ও সুবীরকে তিনি ঠাওরে ছিলেন কবিতার প্রমিত বোদ্ধা। আমাদেরও অসম্ভব আগ্রহ, উৎসাহ — কী লিখেছেন আমাদের মৃদুলবাবু। নিজেই পড়েন তিনি — স্বপ্নমুগ্ধ স্বর, থেমে-থেমে, মৃদু কিন্তু স্পষ্ট। তাঁর *সোনার বুদ্বুদ* কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাগুলিই এভাবেই আমাদের সামনেই প্রায় জন্ম নিয়েছে। আমরাই তাদের প্রথম পাঠক। ঘটনাচক্রে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল আর আমাদের বন্ধুত্ব সমবয়সি। তাঁর সখ্য ও সান্নিধ্য পেয়েছি বলেই মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা নিয়ে বলার আমার কতটা অধিকার আছে জানি না। কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারি না, নিজের মুগ্ধতার কথা না জানিয়ে থাকতে পারি না, যখন পড়ি —

ঝিঁঝির গুঞ্জন থেকে শুরু হবে, ক্রমশই কুয়াশা, শিশির...
সহসা স্পর্শের প্রায় অনুভবে ক্রমে নতশির
এখানে সাক্ষাৎ হবে, মনে ভেবে, যখন অস্থির
যতো চেষ্টা করো তাও নিদ্রা এসে যাবে

যে এই নিদ্রিত তাকে এরপর কে পাবে, কে পাবে?
অস্পষ্ট কলহ করবে সারারাত কুয়াশা, শিশির...
সহসা স্পর্শের চেয়ে অধিক অধীর
আবির্ভূতা, অনুসৃতা, বক্ষেই জড়াবে

কবিতা-নাম্নী সেই অশরীরী বিদেশিনীর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গাঢ় হয়ে যখন শরীর মেঘের মতো জাগরণনিদ্রায় একাকার, তখন এই আচ্ছন্ন ভাসমানতাকে (সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন!) কে পাবে? কী হয় তখন তার? 'অস্পষ্ট কলহ করবে সারারাত কুয়াশা, শিশির'! কী দুর্লভ লাইন! এ কি প্রকৃতি ও অবচেতনের মধ্যে অস্পষ্ট কলহ? যেন অসংখ্য অদৃশ্য বিকিরণ চলছে। মনের কোনো গভীর কোরকে অজানা লিপিতে কিছু লেখা হয়ে চলেছে। *সোনার বুদ্বুদ*-এর কবিতাগুলোতে কবিতার আসা, ভাসা, চলে যাওয়া, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া, অথবা অদৃশ্য থেকে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসা, প্রকট হওয়া — অদ্ভুত সূক্ষ্ম, অতলস্পর্শী ঘটনা পরতের পর পরতে খোদিত হয়ে আছে। অদৃশ্য এক নারী, অশরীরী প্রায় — তার অভাবিত সব আচরণ — কবিতার পর কবিতায় তাকে দেখা যায়। কবি ও কবিতার পারস্পরিক কী যে সম্পর্ক গোটা বইটিতে ছড়ানো! আর এই কবিতার ভাষা? ভিজে, জল থেকে ওঠা; যেরকম বতিচেলির ছবিতে, রিলকের কবিতায় ভেনাস উঠেছিল ঢেউ ভেঙে!

অনেক পরে, ২০১১ সালে সাহিত্য অকাদেমির এক কবিতা কর্মশালায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন মৃদুলবাবু। তিনি আমাকে তাঁর *সোনার বুদ্বুদ* বই থেকে তাঁর বাছাই করা কিছু কবিতার ইংরেজি তর্জমা করার জন্য অনুরোধ করেন। আমি কম্পিতচিত্তে আমারই অগ্রজ বন্ধু, অত্যন্ত গুণিজন, সাহিত্যানুরাগী ও সুখ্যাত অনুবাদক শ্রী স্বপন চৌধুরীর শরণাপন্ন হই। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করি। অনুবাদ করতে গিয়ে কবিতাগুলির সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ি। যাকে বলে ক্লোজ-আপ থেকে দেখা। প্রতিটি শব্দ, পঙ্‌ক্তিবিন্যাস আলাদা করে চোখে পড়ে। এ-কথা সত্যি যে কবিতার যথার্থ অনুবাদ হয় না। একটি ভাষার নিজস্ব গন্ধ, স্বাদ অন্যভাষায় রূপান্তরিত হয় না। কিন্তু যেটা হয়, সেটা হল মূল কবিতার সে এক ইন্টারপ্রেটার হয়ে ওঠে। এক ভিনদেশি আলোয় তাকে নতুনভাবে প্রস্তুত করে। উপরোক্ত কবিতাটির ইংরেজি তর্জমা এখানে রাখছি, পাঠকই বলবেন এই অভিজ্ঞতা তাঁর কেমন লাগল।

Begin it will with the murmur of cricket
Hence fog, dewdrops...
Suddenly with a feel of touch, the head stoops
Here will it call, while restless with the thought
However much you try, the sleep takes you in

Who, who will hence get the one in sleep
The mist, the dew will continue their hazy dispute all night...
Suddenly, more restive than touch
Emerging, pursuing, she clings to the breast.

১৯৯৮ সালের 'কবিতা উৎসব'। সন্ধ্যাকাল, শিশির মঞ্চ। আমি আসলে প্রবাসী বাঙালি। কয়েক বছর হল কলকাতায় চাকরিতে বদলি হয়ে এসেছি। আকৈশোর কবিতাপ্রেমী। কিন্তু জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতা বলতে সুনীল, শক্তি, বিনয়, উৎপলকুমার অথবা আরেকটু পরের তুষার রায়ের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। আর হ্যাঁ, হাংরি জেনারেশন ব্যাপারটা খানিকটা জানতাম। তবে ষাট ও সত্তরের কবিতা সেভাবে পড়িনি। কিছু নাম অবশ্যই শুনেছিলাম। জয় গোস্বামী, রণজিৎ দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত। শুনেছিলাম, মৃদুল দাশগুপ্ত একজন অত্যন্ত সিরিয়াস ও কিছুটা আড়ালে থাকা পুরোপুরি লিটল ম্যাগাজিনের কবি। সেই সন্ধ্যায় অনেকেই কবিতা পড়েছিলেন। কারো-কারো ক্ষেত্রে দর্শকমণ্ডলী থেকে করতালি এবং আরও পড়ুন অনুরোধ ভেসে আসছিল। এরই মধ্যে একসময় নিঃশব্দে এলেন মৃদুল দাশগুপ্ত। আমি সজাগ ও উৎকর্ণ হলাম। কবি বড়োই মৃদুস্বরে, খানিক জড়িয়ে বিড়বিড় করে পড়তে লাগলেন —

নিজেকে নিদ্রিত দেখে আকস্মিক মনোবেদনায়
শিয়রে বসেছি ঝুঁকে, কোনও কোনও রাত্রিকালে একাকী নিশ্চুপে
হয়তো দু-এক ফোঁটা অশ্রুপতনের ফলে আধো চোখ মেলে
আবার নিদ্রায় ডুবে যেতে যেতে সে ভেবেছে, স্বপ্নে দেখা যায়।

কী এক অদ্ভুত অঘটন; অভাবনীয় নাটকীয়তা কবিতাটিতে। দস্তয়েভস্কির কোনো চরিত্র নাকি? বুঝতে পারছিলাম অসাধারণ গভীর নির্জন মনের কবিতা। আরও কয়েকটি কবিতা তিনি পড়েছিলেন যার মধ্যে দিয়ে নৈঃশব্দ্য ঝরে পড়ছিল। মনে হল, এই কবিকেই তো আমি খুঁজছিলাম। রিলকে আমার বড়ো আপন কবি। কবিতায় আমি তাই সেই প্রশান্তি ও গভীরতা খুঁজি। সেই সন্ধ্যায় বার-বার মন বলছিল, তুমি তো এ-ধরনের কবিতাই পড়তে চাইছিলে, না! কবিতাপাঠ শেষ হলে আমি গ্রিনরুমের দোরগোড়ায় হাজির। দেখা হল মৃদুলবাবুর সঙ্গে। জানালাম আমার মুগ্ধতার কথা। দেখলাম মানুষটা একেবারেই সাদা, সরল। ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি ট্রান্সপেরেন্ট। এবং জানলাম, তিনি আমাদের বরানগরেই থাকেন।

সেদিন দারুণ আনন্দ হয়েছিল। মনে হল, বাংলা কবিতা তাহলে আমার বাড়ির খুব কাছেই থাকে! আমার অফিসের কিছু বন্ধু-বান্ধবদের থেকে জানতে পেরেছিলাম যে মৃদুলবাবু বাংলা কবিতার জগতে অত্যন্ত সম্ভ্রম জাগানো এক নাম। সেই মৃদুলবাবু এত কাছে থাকেন। তিনি আবার আমাকে তাঁর বাড়ি যাবার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। একদিন সত্যিই বরানগরে তাঁর ভাড়াবাড়িতে পৌঁছে গেলাম। রাতশেষে ঘুমোতে যেতেন বলে মৃদুলবাবু বেলা বারোটার পরে উঠতেন। ছুটির দিনের সেই অবেলায় কড়া নাড়তেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বেরিয়ে আসতেন তাঁর স্ত্রী। হয়তো মৃদুলবাবু তখনও বিছানা ছাড়েননি বা সবে ছেড়েছেন। তন্বী, ফর্সা এই মহিলাই মাধবী। পাঠকের কি মনে পড়ছে 'যখন নিজের স্বর আরেক বন্ধুর বলে মনে হবে, পিঠে হস্ত অনুভূত প্রায় / ঘুরে সে তাকাবে, কিন্তু কেউ নেই অচানক দিকশূন্য বাকশক্তিহারা / হয়তো ফিসফিস করবে কোনক্রমে, কই ঘর, মাধবী কোথায়?' ম্যাডাম মাধবীর সমাদরে কোনোদিন কার্পণ্য দেখিনি। আমাদের দেবদূত সত্যিই দেবদূত। সংসারে প্রায় পেয়িংগেস্ট। দীর্ঘদিন তাঁর বাড়ি যাওয়ার ফলে দেখেছি, কী পরিশ্রমে সংসারের যাবৎ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে এই মহিলা আমাদের কবিকে সংসারে সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে দিয়েছেন। এঁর ছায়া ও প্রশ্রয় ছাড়া মৃদুলবাবুর পক্ষে এই সমস্ত রাত জেগে মহাঘোরের কবিতা লেখা বোধহয় সম্ভব হত না। 'কই ঘর?' ...ঘর বলতে অন্ধকার ঠান্ডা ছায়ামাখা এক-চিলতে ঘর। রোদ ঢোকে না কখনো। ঘর-জোড়া খাট। চারিদিকে বই-কাগজ ডাঁই করা। একপাশে ফ্রিজ। একটা ড্রেসিং টেবিল। কোথাও কোনো চাকচিক্যের চিহ্ন নেই। মৃণাল সেন বা ঋত্বিক ঘটকের ছবির কোনো নিম্নবিত্ত সংসারের চিরায়ত ফ্রেম। যদিও স্ফূর্তি ও উচ্ছলতার কোনো অভাব চোখে পড়েনি কন্যা ও স্ত্রীর দ্বারা লালিত এই কবির ঘরে। ছড়ায় সিদ্ধহস্ত তিনি নিজেই তো লিখেছেন 'একটি পাখি, দুইটি পাখি / আমি তাদের সঙ্গে থাকি / এইটুকুনি ছোট্ট ঘরে / বড়ই কিচিরমিচির করে... দুই পাখিতে যুক্তি করে / আমায় ওড়ায় দুহাত ধরে। / ঝড় ঝাপটায় দুই পাখিতে / খাবার আনে ধারবাকিতে'। অথবা পাঠক মনে করুন অসামান্য সেই পঙ্‌ক্তি — 'নচেৎ পতনশীল, যদি না উড্ডীন রাখে আমাকে বাতাস' — শেষ দু-টি পঙ্‌ক্তি 'ফলে রক্তাপ্লুত পড়ে ধানখেতে, অল্প অল্প শ্বাস... / ওড়াতে সচেষ্ট তাও হাত ধরে দুজন বাতাস'। বাতাসও আবার দু-জন! মৃদুলবাবুই পারেন।

মৃদুলবাবুর সঙ্গে অনেক জায়গায় আমি একসঙ্গে গেছি। বেশিরভাগই মফস্‌সল বা গ্রাম। স্বনামধন্য কবিদের দর্শন পেয়েছি। এরকমই এক যাত্রা ও তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে এ-লেখার ইতি টানব। ২০০২ সালের ঘুঘু-ডাকা নির্জন দুপুরের শিমুলপুর গ্রাম। বনগাঁ লাইনের ঠাকুরনগর স্টেশনে নেমে রেললাইন ধরে একটু এগিয়ে ডান হাতে ঘন সবুজ বনানী ঘেরা গ্রাম। একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে একা বাস করতেন প্রবাদপ্রতিম কবি বিনয় মজুমদার। সকলেই জানেন দীর্ঘকালব্যাপী একধরনের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন এই কবি। গ্রামের মানুষেরা ও স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকরাই তাঁর দেখাশোনা করতেন। ঘাসজমি থেকে দু-ধাপ উঠে বারান্দা। আমাদের পায়ের শব্দে এক প্রান্তে প্রায়ান্ধকার ঘর থেকে ক্ষীণ স্বর ভেসে এল, 'কে?' — 'আমি মৃদুল — মৃদুল দাশগুপ্ত'। সাড়া দিয়ে বোঝালেন আসছেন। মোটামুটি পরিষ্কার লুঙ্গি ও ক্রিম রঙের পাঞ্জাবি পরে বেরোলেন। রোগা মুখ, ছোটো-ছোটো করে কাটা চুল, পাকা গোঁফ — দাঁত পড়ে গেছে। বহুদিনের বাসনা — দেখলাম সেই কিংবদন্তি কবিকে। মৃদুলবাবুকে দেখে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। মৃদুলবাবু তাঁর স্নেহধন্য। আর মৃদুলবাবুর কাছে বিনয়দা গুরুতুল্য, দেবতা। দু-জনের বেশ কিছুক্ষণ কথা হল। আমি দর্শক, শ্রোতা। দেখলাম দুই প্রজন্মের দুই কবিকে। যেন প্রাচীনকালের তপোবনে গুরু ও শিষ্যকে। কবিদের প্রসঙ্গে বারবার তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। কণ্ঠে কী গভীর ভালোবাসা। আশ্চর্য লেগেছিল মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত এই মানুষটিকে ছন্দের তালে ঈষৎ দুলে-দুলে শক্তির কবিতার হুবহু উচ্চারণ করতে দেখে। সুদূর নির্জন সেই দুপুরের কথা জীবনে ভুলব না। বিনয় মজুমদারকে মনে হয়েছিল বহু দূর নক্ষত্রলোকের এক দেবতা। জলের সারল্য তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে।

কিছুদিন পূর্বেই সেই দুপুরের কথা মৃদুলবাবুর সঙ্গে হচ্ছিল। 'লিডার'-এর সামনে, রাত তখন দশটা। শ্রীরামপুর ফিরবেন বলে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। বিনয় মজুমদারের কবিতা প্রসঙ্গে আমি বিনীতভাবে বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় যা বাস্তব, এমনকী বৈজ্ঞানিক সত্য, তাই তিনি লিখেছেন আর সেগুলো জ্বলে উঠেছে অনির্বচনীয় কবিতা হয়ে। আপনি তাঁকে গুরু জ্ঞান করেন। আপনার কবিতায় অলীক, রহস্যময় ঘটনা। কেমন কুহক, কুহেলিকা। প্রত্যুত্তরে মৃদুলবাবু জানিয়েছিলেন — 'বিনয়দা আমার গুরু, আমি তাঁর ভক্ত। বিনয়দা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যা বাস্তব, যা সত্য। আর আমি তাঁরই উলটো পথে গেছি। যা মিথ্যে, অবাস্তব তাকে আমি কবিতায় সত্য করে দেখাতে চেয়েছি'।

বেশ কয়েকবছর হল মৃদুলবাবু বরানগরের প্রবাস ছেড়ে ফিরে গেছেন তাঁর মাতৃভূমিতে, তাঁর সূর্যাস্তে নির্মিত ঘরে। এখানে থাকাকালীন তাঁর দপ্তরে ছুটির দিন, প্রতি বুধবার তিনি চলে যেতেন তাঁর মাতৃভূমি শ্রীরামপুরে। কিন্তু এ-পরবাস কে ভোলে? এখন প্রতি বুধবারই রাতের দিকে জন্মভূমি থেকে তিনি তাই একবার না একবার ফিরে আসেন তাঁর পরবাসে। আমরা হাপিত্যেশ করে বসে থাকি।

হাফ-প্যান্ট পরা কবি

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

মৃদুল দাশগুপ্ত আমার বন্ধু। মৃদুল সম্বন্ধে লিখতে বসে প্রথমেই মনে হল, ও হচ্ছে আমার দেখা প্রথম এবং একমাত্র হাফ-প্যান্ট পরা কবি। ১৯৬৬, তখন আমরা দু-জনেই শ্রীরামপুরী। শ্রীরামপুর স্টেশনের পাশেই আরএমএস মাঠের উত্তর-গেটের সামনে বইপত্র সাজিয়ে বসতেন ষষ্ঠীদা। আমরা বলতাম 'ষষ্ঠীদার দোকান'। সেখানে আমাদের অবাধ যাতায়াত। পত্র-পত্রিকা দেখার অভ্যাস আমাদের ওখান থেকেই। আমরা দু-জনেই পত্র-পত্রিকার পাতা ওলটাতাম। না কিনে, পাতা ওলটানোতে কোনো বাধা ছিল না ষষ্ঠীদার দোকানে। সরস্বতী সাধনার প্রথম বাহক ছিলেন ষষ্ঠীদা। মৃদুলের সঙ্গে আলাপ ওখানেই। তখন আমরা দু-জনেই হয় 'এইট', না হলে 'নাইন'। ও শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিটিউট, আমি বল্লভপুর হাইস্কুল। স্কুল যাওয়ার পথে একটু সময় থাকলে, না হলে ফেরার পথে বিকেলে ষষ্ঠীদার দোকান ছিল আমাদের জংশন স্টেশন, একটু থামতেই হবে। একদিন কথায়-কথায় মৃদুল জানাল, ওর একটা কবিতা প্রকাশ পেয়েছে বি পি দে স্ট্রিট ও ক্ষেত্রমোহন সা স্ট্রিটের মোড়ে এক দেওয়াল পত্রিকায়। কবিতা? মৃদুলের? দেখে এসে মুগ্ধ! বিস্ময়ে হতবাক! দেওয়াল পত্রিকাটির নাম ছিল *ময়লা কাগজের বাক্স*। তখনও ভাবতে পারি না, আমার চেনা-জানা কেউ মৌলিক কিছু লিখতে পারে বলে। নাইন-টেনে পড়ার সময় থেকেই বুঝতে পেরে যাই, মৃদুল আর আমার মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। পড়ার বই-এর বাইরে পড়ার অভিজ্ঞতায় ও অনেকটা এগিয়ে থাকত। আলোচনায় সব সময়েই ও বক্তা, আমি শ্রোতা। দেওয়াল পত্রিকাটা চালাতেন সোমনাথদা, সমরদা, প্রণবদারা। এঁদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল *গুচ্ছিকা সব পেয়েছির আসর*-এ, সদস্য আর মাস্টারদা হিসেবে। এঁরাই পরবর্তীকালে *শীর্ষবিন্দু* নামে একটি পত্রিকা বার করেন। সেখানেও মৃদুলের কবিতা ছাপা হত। তখন শ্রীরামপুরে একটা সাহিত্যের পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল এঁদেরই আগ্রহে। গোলকধাম, টাউনহল বা পাবলিক লাইব্রেরির সাহিত্যসভায় ওকে কবিতা পড়তেও দেখেছি।

১৯৭১-এ শ্রীরামপুর ছেড়ে চলে আসার পর যোগাযোগটা কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবুও দেখা হলেই, 'কীরে কেমন আছিস?' আর তারপরেই চায়ের দোকানে আড্ডা। মৃদুলের ছন্দ থাকত হাতের মুঠোয়। মনে আছে, তখন সদ্য পড়েছি টিনটিন কমিকস, ইংরেজিতে। আড্ডায় প্রসঙ্গ উঠল। মৃদুলও জানাল, সে-ও পড়েছে — দারুণ! সিগারেটের প্যাকেটের ভেতরের সাদা কাগজটায় মৃদুল নিমেষে লিখে দেয় দু-টি ছড়া, ওই টিনটিনকে নিয়ে। সে কাগজ এখনও রয়েছে আমার জিম্মায়, সযত্নে। মৃদুলকে নিয়ে এই লেখার সময় *চারুলতা* ছবির সেই চারুর লেখা শুরু করার আগে স্মৃতি-দৃশ্যের মতো কত ছবি ভেসে এসে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যের সঙ্গে ফিরে আসছে কত না স্মৃতি। হঠাৎ একদিন কাগজে দেখলাম, মৃদুল ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি নির্বাচিত হয়েছে। ওকে সম্মান জানাতে দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা। আমাদের গর্ব তখন আকাশ ছুঁয়েছিল। অনেকদিন দেখা নেই, হঠাৎ একদিন হাতে এল চিরকুট, 'তারকেশ্বরের মোহন্ত-এলোকেশী বিষয়ে কিছু তথ্য চাই।' মৃদুল তখন *পরিবর্তন* পত্রিকায় যোগ দিয়েছে। কবিতা থেকে সরে এসে গদ্যেও সে তার সুনাম বজায় রেখেছিল। তারকেশ্বর, চম্বলের ডাকাত — এমনি বেশ কয়েকটি প্রচ্ছদ নিবন্ধে *পরিবর্তন*-কে প্রচারের তুঙ্গে তুলে দিতে সাহায্য করেছিল। লেখালিখির ব্যাপারে আমার কোনওদিন তেমন আগ্রহ ছিল না। ভালোবাসতাম পড়তে আর পড়তে। সত্যি বলতে, লেখার যোগ্যতাও ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু দেখেছি, ও যখন কাউকে আমার পরিচয় দিত, গম্ভীর দানাদার কণ্ঠে বলত, 'দে মু আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ওকে আমি পল্টু বলে ডাকি।' বেশ লাগত শুনতে।



আজকাল-এ কর্মরত; ২০০০

অনেক বছর হয়ে গেল, এখন আমরা একই প্রতিষ্ঠানে — *আজকাল* সংবাদপত্রে, সেখানেও দেখেছি মৃদুল সবার প্রিয়। প্রত্যেকের, সম্পাদক থেকে পিওন — সবার। আর একটা ব্যাপার দেখে দারুণ লাগত — বাংলাদেশ থেকে আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে, দু-কথার পর তাঁদের অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন ছিল, 'মৃদুল দাশগুপ্ত আপনাদের এখানে কাজ করেন না?' অবিশ্বাস্যরকম জনপ্রিয় বাংলাদেশে। শেখ হাসিনা থেকে মফস্সলের কবি, খ্যাতিমান সাহিত্যিক থেকে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র-অভিনেতা — প্রত্যেকেই চেনেন মৃদুলকে।

আমি কখনোই কবিতাপ্রেমী নই। কয়েকটি দলছুট কবিতা ছাড়া মৃদুলের কবিতা পড়িইনি বললে চলে। কিন্তু ওর গদ্য আমার খুব প্রিয়। বাংলাদেশ ভ্রমণ বা বিদেশ সংক্রান্ত ছোটো ফিচার, কৈশোর স্মৃতি বা রিপোর্টাজ প্রকাশমাত্রই পড়ে ফেলতাম। এখনও পড়ি। মৃদুল বলত, 'তুই গদ্য লিখিস তো, কবিতা পড়। গদ্যের ভাষার উন্নতি হবে।'

লিখি বলতে, তেমন কিছু নয়। কাগজে কাজ করার সূত্রে দু-একটা লেখার সুযোগ পেয়ে যাই বা লিখতে বাধ্য হই। হয়তো ছাপার অক্ষরে নাম প্রকাশের জন্যেই মৃদুলকে নিয়ে এই লেখার বরাতটাও পেয়ে গেছি। তবুও বলতে বাধা নেই, এই সুযোগে মৃদুলের সঙ্গে আমার নামটাও জড়িয়ে গেল। বেশ গর্ব অনুভব হচ্ছে। মৃদুলের এই কবিতা পড়ার উপদেশ আমি খুব যে মেনেছি, তা নয়। তবে মৃদুলের কথায়, আলাপে, মুদ্রিত গদ্যে খুঁজে পাই আমার সেই পুরোনো ছোটোবেলার বন্ধু কবি মৃদুল, মৃদুল দাশগুপ্তকে।

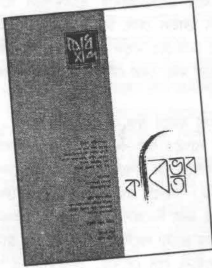
আমার বাবাই

মন্দাক্রান্তা দাশগুপ্ত

বাবাইকে নিয়ে কিছু লিখতে এখন একদম ইচ্ছে করছে না। সেই এপ্রিল মাস থেকে বাবাই ঘ্যানঘ্যান করে চলেছে সমানে, 'লেখাটা এখনও লিখলি না, ঘ্যাংঘুং, সেই কবে তোকে চিঠি পাঠিয়েছে *বোধশব্দ* থেকে। আমার মেয়ে হয়েও তুই এরকম!' টুক করে আমিও দিচ্ছি ঠুকে, 'তোমার মেয়ে বলেই তো...'!

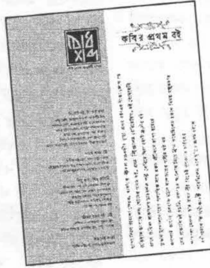
আসলে, ব্যাপারটা হল, এখন আমার বাবাই-এর সঙ্গে ঝগড়া চলছে। মিটমাট হয়ে গিয়েছিল দু-দিন আগে, কিন্তু কাল রাতে আবার হয়েছে। এবারের বিষয়? ঠিক একসপ্তাহ আগের মতোই — ফেসবুক। কম্পিউটারটা খুলেই বাবাই ফেসবুক ছাড়া অন্য কোনোদিকে তাকাচ্ছেই না। অথচ ক-দিন আগে পর্যন্ত





বিভাব কবিতা

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১২



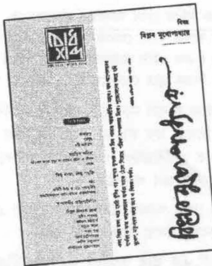
কবির প্রথম বই

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১১



সৌজন্য সংখ্যা

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০১০



কবি বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০০৯



কবি প্রবীর দাশগুপ্ত

বোধশব্দ, জানুয়ারি ২০০৮

আমাকে রীতিমত বিরক্ত করে তুলত — "ক'-টা করে দে-না, 'ক'-টা করে দে-না' বলে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, 'ক' হল একটি বাংলা সফটওয়্যারের আইকন। আমাদের এখনকার ঝামেলার সূত্রপাত সেখান থেকেই। আমিও তো সাজিয়ে ফেলেছি যুক্তি — 'এত তো 'ক'-'ক' করতে, এখন সে কোথায়? ফেসবুক ছাড়া তো আর কোথাও ক্লিক করতে দেখি না'!

এ-তো গেল ফেসবুকের কথা। এমনই টুকটাক, খুঁটিনাটি কত-শত বিষয় নিয়ে রোজ-রোজ ঝামেলা লেগেই থাকে আমাদের। মা-তো হরদমই রেগেমেগে বলে — 'তোরা এমন করিস, মনে হয় যেন পিঠোপিঠি ভাইবোন!' — এসব কথায় আমরা পরোয়া করি না আদৌ। আমাদের ঝগড়া, মারামারি এগিয়ে চলে নিজের খেয়ালে।

তবে শুধু ঝগড়াই নয়, বিস্তর ভালোবাসাও আমাদের জড়িয়ে রেখেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। সে-সব গল্পের শুরু সেই ছোটোবেলাতে। তখন বাবাই আমায় কাঁধে নিয়ে এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে বেড়াত, আর জিজ্ঞেস করত — 'কার বাবাই সবচেয়ে ভালো?' আমি সদর্পে ঘোষণা করতাম — 'আমার বাবাই, আমার বাবাই।' মাঝেমধ্যেই ছড়া কাটত আমায় নিয়ে —

সোনা ঘ্যাংঘুং, মনা ঘ্যাংঘুং
মিষ্টি-মিষ্টি হাসে,
তাইতো তার বাবাই এখন
শুয়ে আছে পাশে।

কিংবা

একদিন আমার মেয়ে ঘ্যাংঘুং
অনেক হবে বড়ো
রাজপুত্র এসে বলবে,
কোন কলেজে পড়?

আমার মনে পড়ে, এই ছড়াটিতে সুর-ও দিয়েছিল বাবাই। লিখতে-লিখতে সেই সুরে গুনগুন করছি আমি।

ছড়া, কবিতার সাথে আমার পরিচয় তখন থেকেই, বাবাই-এর হাত ধরে। অনেক ছোটোবেলা থেকেই আমি অনেক কবি, লেখকদের লেখা পড়ার সুযোগ পেয়ে আসছি, তা শুধুমাত্রই বাবাই-এর সুবাদে।

ছোটোবেলায় বাবাই-এর হাত ধরেই আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল একটি গ্রাম দেখার। আমার স্কুলে ছুটির কাজে, রচনা লিখতে দেওয়া হয়েছিল, 'তোমার দেখা একটি গ্রাম'। তখন আমি ক্লাস ওয়ান। কোনো গ্রামই তার আগে পর্যন্ত দেখিনি আমি। তাই বাবাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল সেই গ্রামে। হুগলি জেলার সেই গ্রামটির নাম এখন আমার আর মনে নেই, তবু সে গ্রামের আনাচ-কানাচ আমার আজও মনে পড়ে — যা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম বাবাই-এরই চোখ দিয়ে।

আর সেই যে যেবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হল, অবাক বিস্ময়ে হিরের আংটির মতো সূর্যটাকে দেখেছিলাম বাবাই-এর বানানো চশমা দিয়েই।

আমার ছোটোবেলায় এভাবেই ছড়িয়ে রয়েছে বাবাই। কখনো মেঘ ডাকার আওয়াজে চমকে গিয়ে আঁকড়ে ধরেছি বাবাইকে, কখনো বা মধ্যরাতে ঘুমের ঘোরে বুঝতে পেরেছি অফিসে নাইট ডিউটি সেরে, বাড়িতে ফিরে বাবাই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমার বই-খাতায় মলাট দিয়ে দিচ্ছে বাবাই, কিংবা কল্পনায় সাজিয়ে দিচ্ছে আমায়, চোখ বুজলে এখনও আমি দেখতে পাই ছোটোবেলার সেই দিনগুলো — সেলোটেপটা একদিকে টান-টান করে ধরে আছি আমি, কাঁচি দিয়ে আরেকদিকটা কেটে নিচ্ছে বাবাই।

কোনো একদিন বাবাই-এর সঙ্গে নাচানাচি (যা আমরা প্রায়ই করি!) করতে-করতে বড়ো হয়ে গেলাম আমি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি ছোটোবেলায়



স্ত্রী মাধবী ও কন্যা মন্দাক্রান্তার সঙ্গে পাহাড়ে; ১৯৯৫

বাবাই-এর মলাট দেওয়া খাতাগুলো হয়ে গেছে আমার প্র্যাকটিকাল খাতা। পরিবর্তনের এমন আচমকা ধাক্কায় যখন ছলছল চোখ, চমকে দেখি সে খাতার উপর নকশা আঁকছে বাবাই। শুরু হল আমাদের নতুন অভিযান। রাত জেগে বাবাই আর আমি পরামর্শ করে নদী থেকে মাছ, খেত থেকে ধান তুলে আনলাম সে খাতার মলাটে।

বড়ো হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই একটু-আধটু বুঝতে শুরু করলাম কবিতা, যেগুলো ছোটোবেলায় শুধুই পড়েছিলাম। ভালো লাগতে শুরু করল বাবাই-এর লেখাও। কবিতায়, গদ্যে নতুন করে চিনলাম বাবাইকে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা লেখার লোভ সামলাতে না পেরে লিখেই ফেলছি — বাবাই যখনই কোনো লেখা লেখে, সাধারণত, প্রথমেই আমায় পড়ে শোনায় এবং জিজ্ঞেস করে, 'লেখাটা কেমন?' চুপি-চুপি বলে রাখি, সব লেখা যে আমার ভালো লাগে, এমনটা নয়, তবু আমায় বলতেই হয় — 'খুব ভালো'। কখনো-সখনো বলে দেখেছি, 'মোটামুটি' বা 'ওই একরকম'। কিন্তু তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, অন্য কেউ সেসব লেখা খারাপ বললে বাবাই-এর খারাপ লাগে না, কিন্তু আমি খারাপ বললে বাবাই-এর একটু-আধটু মন খারাপ হয় বইকি! বাবাই-এর একটি কবিতা আমায় ছুঁয়ে যায় জীবনের বিভিন্ন স্তরেই। বাবাই-এর লেখা আমার প্রিয় কবিতা সেইটাই —

নিজেকে নিদ্রিত দেখে আকস্মিক মনোবেদনায়
শিয়রে বসেছি ঝুঁকে, কোনও কোনও রাত্রিকালে একাকী নিশ্চুপে
হয়তো দু-এক ফোঁটা অশ্রুপতনের ফলে আধো চোখ মেলে
আবার নিদ্রায় ডুবে যেতে যেতে সে ভেবেছে, স্বপ্নে দেখা যায়।

কখনো-কখনো আবার মনে হয় যেন বাবাই কবিতার মতো গল্পও যদি একটু বেশি সংখ্যায় লিখত, মন্দ হত না। *পার্টি বলেছিল* গল্পটি আমার বড়োই প্রিয়। অনেকগুলো রাত ভাবিয়েছিল গল্পটি আমায়। পড়তে-পড়তে অজান্তেই চোখ থেকে দু-এক ফোঁটা জল পড়েছিল কি?

বাবাই-এর লেখা আমায় সমৃদ্ধ করে, প্রেরণা দেয়। মাঝেমধ্যে সাহস করে দু-একটা আজেবাজে লেখা লিখে ফেলি আমি।

এহেন বাবাই-এর প্রতি একদিন জমা হল তীব্র অভিমান — যেদিন বদলে গেল চারপাশটা, বদলে গেল চারপাশের মানুষজন। আঠেরো বছর ধরে যে শহরটাকে নিজের বলে চিনেছিলাম, সেই বরানগর থেকে আমরা চলে এলাম শ্রীরামপুরে, বাবাই-এর জেদের কাছে হার মেনে। তবুও একদিন, বাবাই-এর প্রতি

মাত্রাহীন ক্ষোভ নিয়ে অনুভব করলাম — আমারই তো বাবাই। এই জেদের কণামাত্র হলেও বহন করে চলেছি আমিও তো। ব্যস্! মনে-মনে ছক কষে ফেললাম, যেমন করে বাবাই আমাদের নিয়ে বরানগর থেকে শ্রীরামপুরে চলে এসেছে, আমিও একদিন বাবাই-কে নিয়ে ফিরে যাব, যাবই।

দু-জনে নাচানাচি করব, গান ধরব বেসুরো। বাবাই আমায় ঠিক ছোটোবেলার মতো কাঁধে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করবে — 'কার বাবাই সবচেয়ে ভালো?' আমিও বলব — 'আমার বাবাই, আমার বাবাই'।

অ্যাটপাগস্যাড লুডির্ম

দেবজিৎ দে

'এই, গাছ থেকে নেমে আয় বলছি' —

হালকা ধমকের সুরে মাস্টারমশাই-এর গলা পেয়েই সুড়সুড় করে খেজুর গাছ থেকে নেমে আসতাম। আমি তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। মাস্টারমশাইদের বাড়িটা ছিল বেশ মনোরম পরিবেশে। বাড়ির পিছন দিকে সীমানার বাইরে বিরাট পুকুর। বাড়ি সংলগ্ন টুকরো এল প্যাটার্নের জমিতে আম-কাঁঠাল-পেয়ারা গাছ ও খেজুর গাছ। এছাড়া জবা, কলকে প্রভৃতি ফুলের গাছ এবং তাদের ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ বাগানে যাওয়ার জন্য আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠত, তাই পড়াশোনার ফাঁকেই বাথরুম যাওয়ার নাম করে বাগানে বেরিয়ে পড়তাম, চড়ে বসতাম গাছে। ধমক খেতাম বটে, কিন্তু কোনোদিনই তাঁর থেকে শাস্তি পাইনি। সেই সময় খুব কাছ থেকে দেখেছি তাঁর সুন্দর হস্তলিপির আঁকি-বুকি কাটা কবিতার পাণ্ডুলিপি। তিনি তা থেকে পড়েও শুনিয়েছেন কখনো-কখনো। স্মৃতির মণিকোঠা হাতড়ে তার দু-এক কলি এখনও আমার মনে আছে — ছিটকে পড়া সাবান — তাতে নখের চিহ্ন আঁকা, ক্রসিং এর ঘট্‌ঘট্ — গেল শেষ ট্রেন — ঐ বুঝি বাবা ফিরছেন।

এই মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে তখন কোনো বন্‌ধ বা হরতাল পড়লেই বেরিয়ে পড়তাম। সাইকেল করে, গ্রামের পথে। নবগ্রাম মোড় ছাড়িয়ে মিল্কি বাদামতলা বড়া অঞ্চলে। জিরিয়ে নিতাম গাছের ছায়ায়। সবুজের সমারোহে চোখ যেত জুড়িয়ে। সেখানকার দরমা-ঘেরা টালিচালার দোকানে তিনি আমাকে তেলেভাজা ও মুড়ি খাওয়াতেন। শেষে এক ভাঁড় চা নিজেও খেতেন। সে এক অপূর্ব অনুভূতি। সেই তখনই কোনো একদিন, তিনি তাঁর নামের ইংরেজি অক্ষরগুলিকে উলটো দিক থেকে সাজিয়ে 'অ্যাডপাগস্যাড লুডির্ম' (ATPUGSAD LUDIRM) হয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কলকাতা ছাড়িয়ে সুদূরেও গেছি তার সঙ্গে, বহুবার। ঝিকিরা গ্রাম — আমার এখনও মনে আছে। সেবার ওঁর সঙ্গে তপন ভট্টাচার্য নামে এক দাদা গিয়েছিলেন, তিনি খুব ভালো কার্টুন আঁকতেন, সেই তখনই তপনদা একটি কার্টুন এঁকেছিলেন এবং মাস্টারমশাই তাঁর সহজাত স্বভাবে তার ওপর একটি ছড়া রচনা করেছিলেন। আমাদেরও বলেছিলেন, তাতে লিখতে। সেটি এখনও আমার কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে।

আমার ক্লাস বদলানোর সঙ্গে-সঙ্গে মাস্টারমশাই-এর ব্যস্ততাও বেড়ে গেছিল। সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কারণে আমাকে মাঝে-মধ্যে তোপসে হয়ে টুকরো খবর সংগ্রহ করতে হত।

তাঁর ডাঃ বাগানের বাড়িতেই দেখেছি, অনেক গুণী মানুষজনের আনাগোনা। বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি শামসুর রাহমান সাহেবকে দেখেছি তাঁর বাড়িতে আপ্যায়িত হতে। বাংলাদেশের ফরিদ কবিরও আসতেন। কবি জয় গোস্বামী, অমিতাভ গাঙ্গুলি, সোমনাথ মুখার্জিকে দেখেছি ও চিনেছি তাঁরই বাড়িতে। সেই বাড়ি থেকেই আমার ছড়া লেখার হাতেখড়ি। তিনি আমার লেখা ছড়ার ভুল শুধরে দিতেন এবং পড়ে শোনাতেন তাঁর আদরের কন্যা ঘ্যাংঘুং-কে। রান্নাঘর থেকে খুনতি হাতে বেরিয়ে এসে মিটিমিটি হাসতেন মুনমুন বউদি। সেই তখন থেকেই মাস্টারমশাই হয়ে গেলেন আমার 'গুরুদেব'। আজও আমি তাকে এই নামেই ডাকি।

চোখের সামনেই দেখেছি গুরুদেবের মাতৃপিতৃবিয়োগ ও ভাই-বোনের বিবাহ। এবং সংগ্রামী উত্তরণ। পরে তিনি ওই বাড়ি ছেড়ে বরাহনগরে গিয়ে উঠলেন। বর্তমানে শ্রীরামপুরের লেনিন সরণিতে তাঁর নিজস্ব বাড়িতে তিনি স্ব-মহিমায় বিরাজমান। নানা পুরস্কারে ভূষিত আমার গুরুদেব কোনোদিনই নিজের ঢাক নিজে পেটাতেন না। সেই কারণে এই ২০১২-তে তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার পাওয়ার আগাম খবর আমার জানা ছিল না। এইদিন বউদি ও ঘ্যাংঘুং-কে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন পুরস্কার গ্রহণ করতে, আমারও যাবার ইচ্ছে ছিল — ইচ্ছে ছিল সেই পরম মুহূর্ত উপলব্ধি করার। দুর্ভাগ্য, যেতে পারিনি অসুস্থতার জন্য।

তাঁর মতো মৃদুভাষী গম্ভীর অথচ সহজ মানুষ আমি কমই দেখেছি। যখনই পথের মধ্যে কোথাও দেখা হয়ে যেত তখনই তিনি তাঁর নিজস্ব লেখা যদি পকেটে থাকত, তা আমাকে পড়ে শোনাতেন। আমিও সে সুযোগ হাতছাড়া করতাম না, পারলে আমিও কিছু পড়ে শোনাতাম। তিনি সেই সহজাত ভঙ্গিতেই ভুল শুধরে দিতেন। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে গুরুদেব যেমন ছিলেন, এই সাতান্ন বছর বয়সেও সেই একই। মধ্যে কেটে গেছে কত বছর ও ব্যস্ততাময় জীবন। তবু তিনি আমার মাস্টারমশাই, আমারই গুরুদেব, যিনি সাতাত্তরেও বদলাবেন না। আমার সমগ্র ইন্দ্রিয় তাঁর সৃষ্টির উত্তরণের সুসংবাদ শোনার জন্য সজাগ হয়ে থাকবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যেন তিনি ও তাঁর পরিবার সুস্থ থাকেন এবং আমি যেন তাঁর স্নেহ থেকে কখনো বঞ্চিত না হই।

*

কাহিনিকার্টুন



বিস্কুটবিভ্রাট

দু-শো বিস্কুট চাই। বলেছেন গিন্নি। বাজারে ছুটলেন মৃদুল। কঠিন সে কাজ সেরে ফিরলেন বীরের মেজাজে। ছোট্ট ব্যাগে উপচে পড়ছে থিন অ্যারোরুট। গুনে-গুনে দেখিয়েও দিলেন ঠিক-ঠিক দু-শো পিস। নো কম, নো বেশি।

কবিতার কথা

একেবারে এই সময়ের ছয় কবি — বলা যায়, শূন্য দশকের।
মৃদুল দাশগুপ্তের ছ-টি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে এঁরা লিখেছেন নিজেদের কথা।
কবিতার কথা। ব্যক্তিগত গদ্য।

হোটেলের নাম জলপাইকাঠের এসরাজ

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি ব্যক্তিগত যোগ

মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯৯৮-এর নভেম্বর। আমাদের মফস্‌সলে তখন ফাতনাভাসা নৈঃশব্দ্য। আমরা তিন সদ্য যুবা এসেছি জমিল সৈয়দের বাড়ি যিনি পাকেচক্রে তখন আমাদের মফস্‌সলেই থাকেন এবং আমাদের মতো অতি তরুণদের অন্য কবিতার দিকে যাবার আগুনমন্ত্র দেন। আমরা চিনে নিচ্ছি সুব্রত সরকার মণীন্দ্র গুপ্ত রমেন্দ্রকুমারের কবিতা। জমিলদা নিজে হাতে করে দিচ্ছেন তাঁর সম্পাদিত বাংলা কবিতার সংকলন। তুলে দিচ্ছেন *নীলক্ষুর চন্দ্রযান, পরীর জীবন* (অঞ্জলি দাশ)। আমরা উত্তেজিত হচ্ছি। অন্তত আমি, জীবনের গতিবিধি নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই সময়। যেমন লোকে আর্টকলেজে পড়ে, বা বিদেশে ক্রিয়েটিভ রাইটিং পাঠশালায় যায়, সে ছিল তেমনি দিন। ১৯৯৮/৯৯/২০০০। তিনটে বছর। আস্তে-আস্তে দানা বাঁধল *পদ্যচর্চা*। ১৯৯৯-এর আগস্টে বেরোল প্রথম সংখ্যা। আর সেই কাগজের দ্বিতীয় সংখ্যা বেরোনোর আগে এক গ্রীষ্মমাখা দুপুরে সুব্রত সরকার এলেন জমিল সৈয়দের বাড়ি। আমরাও হাজির। নানা কথা ও স্মৃতিবিচরণের শেষে বেরোল সে-সময়ে অপ্রকাশিত *ফারেনহাইট ফোর ফিফটি ওয়ান ডিগ্রি*-র পাণ্ডুলিপি। আর সেখানেই শুনলাম, সুব্রতদা পড়লেন পাণ্ডুলিপি থেকে। শুনলাম সেই লাইনগুলো — 'শরীরে শুধু ক্লোরোফিল, শপথ পাথরগুলির, ওরা তখন / জল থেকে উঠে এসেছে / সমুদ্র তীরবর্তী হোটেলের খোঁজে — / হোটেলের নাম নীলক্ষুর চন্দ্রযান, হোটেলের নাম / জলপাইকাঠের এসরাজ'। আমার কৌতূহল যাচ্ছিল না। আমি *জলপাইকাঠের এসরাজ* পড়িনি। কোথাও পাওয়া যায় বলেও শুনিনি। জমিলদাকে সে-কথা জানালাম। জানালাম, যদি *ব্রহ্ম ও পুঁতির মউরি*-র (রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী) মতো কোনো অ্যাডভেঞ্চার করে যোগাড় করা যায়। কিন্তু বৃথা। তখন সে-বই কোথাও নেই। সেপ্টেম্বর নাগাদ একদিন জমিলদার কথামতো গেলাম মৃদুলদার সঙ্গে আলাপ করতে। *আজকাল* অফিসে। আলাপ হল। লেখা চাওয়া হল। পরে একদিন পেলাম লেখা।

কাচের পাত্রে ভ্রমর

প্রতিশ্রুতির ওপরে মেঘ, এবং নীচে জটিল মাটি
তার নীচে জল, মধ্যে ছায়া, শরীর ভাঙছে দৃষ্টিপাতে
দশদিকে পথ ক্ষুরের ফলা
কাটছে পাথর শিল্পকলার
নামছে স্থিতি, জীমূতবাহন খুব গোপনে ঢুকছে ঘরে

অন্ধকারে মাংসাশী ফুল ভ্রমরটিকে হত্যা করে

লেখাটা দিয়ে বলেছিলেন, পুরোনো লেখা। অনেকদিন পরে পাওয়া। তবে অপ্রকাশিত। কিন্তু, ১৯৯৯ সালে একুশ বছরের তরুণের মনে এ-লেখা দাগ কাটেনি। ভালো লাগেনি, সেটা বলতে আজ কোনো দ্বিধা নেই। আমরা তখন *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* পড়ে মজেছি। তার সঙ্গে এই লেখা! নভেম্বরে বেরোল আমাদের কাগজ। শীর্ণ আটপাতার কাগজে উজ্জ্বল সেই কবিতা। প্রথম পাতায়। আর সেই সময়েই বেরোল মৃদুল দাশগুপ্তের *নির্বাচিত কবিতা*। *অফবিট* থেকে। শ্যামল ধর প্রকাশক। (শ্যামলদাই আমাদের সন্ধান দিয়েছিলেন ছকু খানসামা লেনের এক অদ্ভুত প্রেসের। সেখানে নানা প্রাপ্তবয়সের পত্রিকাদের মাঝে আমাদের নিরামিষ কবিতার কাগজ আসত) সেই *নির্বাচিত কবিতা* হাতে নিয়ে দেখলাম *কাচের পাত্রে ভ্রমর* তাতে রয়েছে। এবং ভূমিকা থেকে জানা গেল, সে *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর গোপন অংশ। পাতার অভাবে সে এতকাল প্রকাশিত হয়নি। এবং বুঝলাম আমরাই তাকে প্রথম ছাপার অক্ষরে এনেছি।

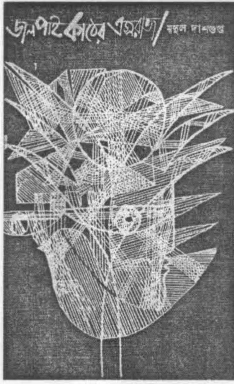
যা কিছু ব্যক্তিগত নয়

এখন চৌত্রিশ বছর বয়সে মৃদুল দাশগুপ্ত ও *জলপাইকাঠের এসরাজ* নিয়ে লিখতে গিয়ে বারবার বাধছে। কবির প্রথম বই এবং তা নিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার যে আবেগের জায়গা সেখানে এই বইটির বিশেষ জায়গা আছে। যদি ভুল কিছু লিখি। একটা ভয় কাজ করে যায়। তাই প্রতিনিয়ত সাবধান হই যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। এই সেই বই, যেখানে পোঁতা হয়েছে পরের মৃদুল দাশগুপ্তের বীজ। বেরিয়েছে মহিরুহ *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* বা তার আগেকার তরুণ শালগাছ *গোপনে হিংসার কথা বলি*। এই সেই বই, যেখানে বাংলা কবিতা রাজনৈতিক কবিতার লিরিকপাঠ নিল —

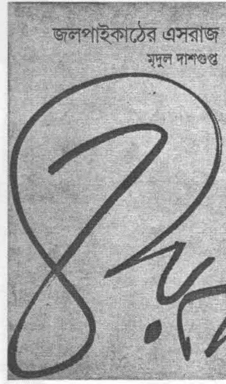
বিষবৃক্ষে বসেছে সে কোন্ পাখি — পালকের গন্ধ পায় কবি;
বৃক্ষ অর্থে সমাজ, শাখাপ্রশাখায় আর ফাটলেকোটরে
শাসনপ্রহারের বেশ কিছু গুপ্তসূত্র আছে।

ভারতবর্ষ

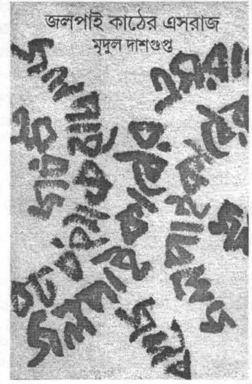
আর রাজনৈতিক লিরিকপাঠই বাংলা কবিতায় মৃদুল দাশগুপ্তকে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিল সত্তরের কবিদের মধ্যে। সত্তর মানে রক্তপাতের দশক। সত্তর মানে উত্তাল পরিবর্তনের দশক। আমরা যারা সে-দশকে জন্মে নব্বই-এর যুবক, তাদের কাছে ফিকে সেসব দিন। আমাদের কাছে সত্তর মানে, বাবার নস্টালজিয়া। সত্তর মানে, দালালতন্ত্র ও পেডিগ্রিরাজের সূচনা। যে-দশকের শেষে ক্ষমতায় আসা সরকার প্রচলন করল মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ নামক এক কল্পতরু, যার তলায় দাঁড়িয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েরা আর ইংরেজি শিখল না। পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু কলকাতার আন্টিনিকেতনে পড়া ছেলেমেয়েরা গেল না। সেইসব প্রচলনকারীদের নিজেদের সন্তানেরা পড়ল ইংরেজি। আমাদের কাছে সত্তর মানে, রক্ত গরম করা জেলা ও কলকাতার বিভাজনের শুরু। যার ফলে



প্রথম সংস্করণ



দ্বিতীয় সংস্করণ



তৃতীয় সংস্করণ

নয়ের দশকে অমুকের ছেলে তমুকের নাতি বা অমুকের আশীর্বাদধন্য না-হলে আর কেউ জেলা থেকে এসে কলকাতায় নিজের পরিচয় তৈরি করতে পারে না। আর এই সত্তরই বাংলার সবচেয়ে রক্তাক্ত দশক। বাংলাদেশের জন্ম। নকশাল। আমরা যারা জানি না বরানগর গণহত্যা। আমাদের সামনে যখন খবরকাগজ নেই, বাম বলতে সরকার বা বিধি, তখন —

> ...সেদিনও এমনই রাত, জালিয়ানওয়ালাবাগে
> ডায়ারের বন্দুক কেড়ে নিয়েছে সোনার টুকরো ছেলে
> দ্রোণাচার্য ঘোষ!
> ভাবো, ভাবো, সেদিনের উৎসব! বরানগরের গঙ্গায় জল থেকে
> আবার এসেছে উঠে
> তিনশো তরুণ।
>
> *আগামী*

বহুবার গিয়েছি পরবর্তীতে বরানগরে, শৈশবের কোল ঘেঁষে পারিবারিক সামন্ততন্ত্রের বীজতলায়। পাকেচক্রে সে তো বরানগর জুট মিলের কাছে। সেখানেই তো এই শূন্য দশকে ঘটে গেছে মজুর কর্তৃক ম্যানেজারের হত্যা। গেছি। আলমবাজার ঘাটে দাঁড়িয়ে ভেবেছি কেন শূন্য থেকে যায় বারবার বিপ্লবের ভাঁড়ার। আরও পরে জুটে গেছে পেরুর উগ্রপন্থী নেতা আবেমাল গুসমানের দলের আত্মসমর্পণকারীর মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার সুযোগ। উঠে এসেছে একই কথা, বড়ো বেশি তাজা রক্তের গন্ধ পেরুতে। আমার মনে হয়েছে, আলমবাজার ঘাট। আর যতবার আলমবাজার ঘাট দেখব এই জীবনে, ততবার মনে পড়বে *আগামী* কবিতার বাক্যগুলো। রাজনীতি। এই শব্দটি বাঙালির মজ্জায়। সঙ্গে আছে যথাযথ আবেগ। অথচ এই বাঙালির রাজনৈতিক কবিতায় ছিল স্লোগানধর্মিতা (সুভাষ মুখোপাধ্যায় অবশ্যই এর ব্যতিক্রম)। মৃদুল দাশগুপ্তের হাতে আবেগপ্রবণ বাঙালিজাতির রাজনৈতিক কবিতা লেখা হল। যাকে আগেই বলেছি লিরিকপাঠ নেওয়া। মৃদুলই প্রথমবার দেখালেন, যে কবিতা শুরু হয় 'অহংকার আর অভিমানের মধ্যে কাচের দেয়ালটুকু বুঝতে পারলে না'-তে, সেই কবিতা শেষ হয় 'গরল আমি ডরাই না হে / বিষে আমি ভয় পাই না / আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি' — এই বাক্যগুচ্ছে। এগুলোই মনে হয় চিহ্ন। নিজের সময়কে পরে-আসা লোকেদের সামনে মেলে ধরার।

আরেকটা কথা লিখে রাখা দরকার এই সুযোগে। বাংলা গীতিকবিতার দেশ। স্মরণযোগ্য পঙ্‌ক্তির কদর যে কোনো বাক্যের চেয়ে দামী। আর তার ফলেই এই কবিতায় জায়গা পাওয়া খুবই কঠিন কাজ। কারণ বাংলায় স্মরণক্ষমতা কম, আর স্মরণযোগ্য লাইন না থাকলে কবিকে মনে রাখতে এ ভাষা পারে না। অন্তত পারেনি এখনও অবধি, আর এখানেও *জলপাইকাঠের এসরাজ* এক সফল বই। 'পথ টেনেছে ভূ-চুম্বকে, এল পার্টিডো কমিউনিস্তা' থেকে 'তোমার গোপন তিল জানি না কোথায়, তবু তার নাম আমি / রেখেছি মমতা' — একের পর এক লাইনে আমাদের স্মৃতি ভরে থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে। তখন বেশি বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার বাসনায় ভর্তি হয়েছি এক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখনও স্নাতকোত্তরের ক্লাস কলকাতার একটা কলেজে হত। সেখানেই এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। সেই মেয়েটির সঙ্গে চকিতে ভাব হয়ে যায় তার ভাসা-ভাসা কবিতাজ্ঞান থেকে। যে জ্ঞানে থাকে তার স্বামীর দেওয়া একটি কার্ড, যেখানে *বিবাহ প্রস্তাব* নামক কবিতাটির প্রথম স্তবক লেখা ছিল। সেই বিখ্যাত —

> বাড়িটি থাকবে নদীর কিনারে, চৌকো,
> থাকবে শ্যাওলা রাঙানো একটি নৌকো,
> ফিরে এসে খুব আলতো ডাকবে, বউ কই...
> রাজি?

মেয়েটি মুখস্থ বলেছিল স্তবকটি।

কীভাবে কাঁদে না

অরিত্র সান্যাল

আমি যে অঞ্চলে থাকি সেখানে ক-দিন যাবৎ একটি মিশকালো নতুন ছটফটে কুকুর ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়। কলকাতার অত্যন্ত প্রাণকেন্দ্রে থাকতে-থাকতেও চোখের সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তার অন্তর্গত মফস্‌সল। কেটে গেল বেশ কয়েকমাস। ইতিমধ্যে ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে স্থানীয় বাহিনীতে মিশে গেছে সে। কালো চকচকে। এক দেখাতেই বোঝা যায় বিদেশি। গায়ে যত্নের ছাপ ছিল। এখন আস্তে-আস্তে শহরে ঘষটে যাচ্ছে। এরকম যত্নলালিত কুকুর রাস্তায় কী করে চলে

এল! তার উৎফুল্লতা কমেনি। এত লোক একসঙ্গে ছাতের তলায় তো কোনোদিন দেখেনি। এবার দেখছে আকাশের তলায়। শুধু কোনো-কোনো নীল কামিজ পরিহিতা মেয়েদের সে পিছু নেয়, খানিক অনুনয়-বিনয়, আর তাদের আতঙ্কে হতাশ হয়ে তার ফিরে আসা। শুধু মাঝে-মাঝে অন্যান্য কুকুরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি কোনো কুকুরকে এভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে যেতে দেখিনি। একদিন এভাবে তাকে দেখলাম। শুধু মুহূর্ত কতভাবে কত কিছুকে কবিতার যোগ্য করে তোলে।

জ্যোতিপ্রকাশের মৃত্যু মনে রাখো, তুমি?

মুঠোর বোতাম আজ অন্য শার্টে সেলাই করেছো

রহস্যের কিছু নেই আজ আর, তবু

তোমাকে বনের মধ্যে ছুটে যাওয়া পথ মনে হয়

বিবাহ

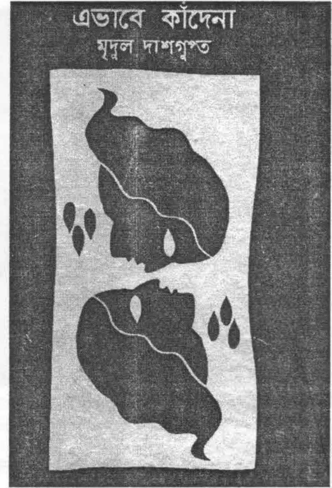
ছোটোগল্পের কাজ, বিশেষত এটাই। একটা মুহূর্ত থেকে একটা প্রেক্ষাপটের অবয়বে যাওয়া আর না-যেতে-পারাটাকে উপভোগ করানো। *এভাবে কাঁদে না*-র প্রথম ষোলোটি কবিতার সব ক-টি সংক্ষিপ্ত, বেশিরভাগই চার লাইনের। ছিটকে আসা কোনো-কোনো খণ্ড যার পিছনে-পিছনে রয়ে গেছে কোনো না কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতি, আখ্যানের হানাবাড়ি। পর-পর ষোলোটি। এভাবেই কাব্যগ্রন্থের শুরু। তারপরের কবিতাগুলি ধীরে-ধীরে কায়কল্পে বড়ো ও বিস্তৃত হয়ে যেতে থেকেছে।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে কুকুরটির কথা ভাবি। সে কি জানে, যে এতদিন পরে কেউ এভাবে কাঁদে না? প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে আমি তাকে ডাকি, আয় খোকা। আমাদের সঙ্গে থাক বনের মধ্যে ছুটে যাওয়া পথ। মুঠোর বোতাম, অন্য শার্টে সেলাই আর কে ও জ্যোতিপ্রকাশ? যে-ই হোক, তার মৃত্যুটি কিন্তু প্রেমিকের। লেখার নাম *বিবাহ*। এক লহমায় আখ্যানে উৎসুক হয়ে উঠে তাকে অনুমান করে আবার এই মুহূর্তে ফিরে এসে দেখি, এই অসহায় বনের মধ্যে ছুটে যাওয়া পথের প্রশমিত হয়ে থেকে যাওয়া। থেকে যাওয়া ঘরের মধ্যে, ছা-পোষা সংসারে।

এভাবে কাঁদে না।

তাহলে কীভাবে? — কে-ই বা বলে দিচ্ছে একথা? তার অবস্থানটি নিয়ে আমাদের প্রশ্ন বেঁচে থাক। খুব একা বিপন্ন মানুষের জীবনে দলে যাওয়ার চেতনা আর একার বিষাদের মধ্যে কোনো দূরত্বই নেই। বেঁচে থাকার জন্য লড়াই আর এই জাগতিক জীবনে সব প্রতিকূলতার প্রতি অভিমান — খুব ওতপ্রোত। এই অভিমানটুকুই জেগে থাকা। আর এই অভিমানটুকুরই নায়ক হিসেবে কবি রোপণ করে নিজেকে, সবার মাঝে। খুব অন্ধকারে তার একটা সামান্য উঁচু মঞ্চ আছে, আমরা দেখি। একটু উঁচু, যাতে আরেকটু দূর অবধি দেখা যায় প্রেম আছে কি না, আরেকটু দূরে, কোথায় সূর্য উঠল, কোথায় কান্না-কারখানার সাইরেনে রক্তগরম হয়ে উঠল কার। সে-সময় খুব অন্ধকারে সূর্যের নিত্যনৈমিত্তিক ওঠাটাই তার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক আচরণ বলে মনে হতে থাকে। এই একা থেকে বহু হয়ে ওঠার সেতুর এধার আর ওধার থেকে ক্রমাগত ছুটে আসছে কয়েকটা লাইন। একই সেতু দু-দিক থেকে দু-জগতের। কিন্তু কোনোকিছুই বিচ্ছিন্ন নয়। বনের মধ্যে সেই ছুটে যাওয়া পথ শেকল-ছেঁড়া অব্যর্থ এক বিপ্লবের। মনের মধ্যে।

এখন আর কোনোকিছুই তেমন ভালো লাগে না যাতে চতুর্দিক ডানা ঝাপটিয়ে ওঠে। এক বিন্দুতে থরথর করছে এমন মেয়ে দেখে প্রেম বা... ভয়ের সেই মারাত্মক চাপ। কিছু না। সব লুঠ করে নিয়ে গেছে এক শীতল আবেগহীনতার দুর্নীতি। চুটিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অদ্ভুত এক অন্যমনস্কতার ক্লোরোফর্ম ভর্তি বয়ামে আবিষ্ট করে রেখেছে। উত্থান নেই পতন নেই একটা শব্দহীন স্বাদের জীবন



যাতে দুঃখ নেই রাগ নেই — ওই জন্মাল আরও একটা অন্যমনস্ক শিশু। দলে এসো।

এ সময় প্রকৃত সন্দেহ হয় — এমন ক্ষতিসাধন হয়তো করেছে কবিতাই — জীবনে এমন এক উচ্চমার্গীয় নিস্তরঙ্গতা ঘটিয়ে ছেড়ে। সমবেত হওয়ার আগে মানুষ কতটা বিচ্ছিন্ন, একা থাকে? কে যে সবাই মিলে একা, নির্ণয় করতে-করতে আজ গোপনে প্রেরণা দিই, ভাগ করে খা আমাকে...। আজ এতদিন পর, তিরিশ বছর আগে রচিত বই-এর সামনে দাঁড়িয়ে বোঝা যায় যে নিজের সঙ্গেও কথা চালাতে কতটা উঁচু মঞ্চে উঠতে হয়। কতভাবে ডেকে তুলতে হয় শ্রোতৃবৃন্দ হিসেবে নিজের ভগ্নাংশগুলোকে। আগে এদের একজোট করি। করতে-করতে বেলা কেটে যায়। খুব জটিল সময়ে কবিই পারে আগুন উস্কে দিতে, আবার নিভিয়ে দিতেও। সে নিজেকে রোপণ করে ভিড়ে, যখন হারিয়ে গেছি, বহুর মধ্যে, বিপন্নতায়। এক না-ছোড় কবিই চিবুকে হাত রাখছে, এভাবে কাঁদে না।

তস্কর? গৃহস্থের আঙিনায় চাঁদ দেখে ঘুমিয়ে পড়েছো?
দলে এসো।
ওভারহেডের তার ছাই করে দিয়েছিলো চালচোর মায়ের শরীর?
আয় খোকা।
অবিরাম সাইকেল? দড়ির ওপরে হাঁটো?
পা ওপরে নিচে মাথা? দুনিয়া মাতাও।
তাঁত ছুটে খিটকল মাকু বিঁধেছিলো পেটে?
বাবাকে এখনও মনে পড়ে?
আয় ভাই আয়।

আর তুমি, ফুটপাথে আমাদের হুল্লোট শুনে
মায়ের বুকের মধ্যে জড়োসড়ো, অবাক দুচোখ —
এখন এসো না
শুধু অপেক্ষায় থাকো।

এই তার বিভাব কবিতা। প্রথমে পরামর্শ এভাবে না কাঁদার, তারপর এমন

কিছু আহ্বান — আয় ভাই আয়। আর এই দলছুট প্রজন্মের আর-এক শিশুর প্রতি নির্দেশ অপেক্ষায় থাকার। কবে রাতে এক অনুরূপ ঝঞ্ঝা এসে তারও দুয়ার ভেঙে দেবে, আর সংগ্রামের টানে ভিতর থেকে সে মিশে যাবে এই রুগ্নপেশি ছায়ামানুষদের দলে। অন্ধকারে এখনও তার অবদান আসতে দেরি। সে অপেক্ষায় থাক। একটা রাতের অপেক্ষায়। যেভাবে সে জেগে উঠতে পারে, তার অপেক্ষায়।

বাস্তবকে ধারণ করতেই প্রান্তজীবনের বিভিন্ন উৎস থেকে ছোটো-ছোটো ইতিহাস-আখ্যান উঠে আসছে কবিতায়। পাঠকের প্রতি গল্পকার সাদত হোসেন মান্টোর আর্তি ছিল — 'আমার সময়কে জানতে, আমার গল্পগুলি পড়ুন। যদি সেগুলিকে সহ্য করতে না পারেন, তাহলে বুঝবেন সময়টাই অসহনীয় ছিল'। এভাবে ভাবা যেতেই পারে, যে — *এভাবে কাঁদে না*-তে কবি টনটনে যন্ত্রণাবিন্দুগুলিকে বিমূর্ততায় আচ্ছন্ন করে রাখতে চাননি সময়ের তাগিদেই। তার পিছনের প্রেক্ষাপটগুলি মুহূর্তের বিহ্বলতায় হারিয়ে যে যাচ্ছে না — তার কারণ এর তলায় কাজ করছে ভিড়ে বেড়ে ওঠা এক কবির দায়বদ্ধতা। গণচেতনার মূল্যবোধ। যে গানগুলি প্রান্তিক মানুষের, তাতে সংগ্রাম, প্রেম, ঈর্ষা, কাম, রাজনীতি, ক্রোধ, ফেটে পড়ার কোনো আলাদা আনুষ্ঠানিকতা নেই। রক্তেই সবকিছু মিশে আছে।

গোপনে প্রেরণা দিই, ভাগ করে খা আমাকে, কালীমার্কা বাংলারীতি
আয় ভাই ভাঙিচুরি না টলেই নিরামিষে আনন্দ উৎসব

যে মাতাল মদ ছাড়া, ছাড়া পাওয়া যে বসে বিয়েতে চোর, যার প্রেম
ছুটে গেছে দিক দিক — সমস্ত ভাইকে দিই আশাঃ এসো দলে

যে আগুন চিনে নেবে আমাকেই আমাদের
আমি তার জনশূন্য সোনার রূপোর কক্ষা
একা একা আঁকতে অক্ষম

তুলি-কলমের আঁকা ভিখারি মায়ের আর রাত্রি শাসকের
কালো ফুটফুটে শিশুর উত্তরে বলিঃ তোমাকে বাঁচাতে চাই
সময়ে বসাতে

বিশ্বকর্মাপুজো

এমত ভয়ঙ্কর রিক্ততায় বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন সবকিছুকেই ন্যূনতম বোধ হয়।

দুদিকে কামড় লাগা যে ফল, কখনও তা গড়িয়ে যাবে না

পিছনের পথে আজ মোরগের পালক ছড়ানো

বলোনি স্বামীকে তবু ওষুধ খেয়েছো, কিন্তু শোনো —

এতোদিন পরে কেউ এভাবে কাঁদে না।

খাবার

এ এক দাম্পত্যের অন্ধকার ছবি। মধ্য জীবনের ক্রাইসিস। এ-ছবি এক মধ্যবিত্ত পরিবারের, নাইটল্যাম্প নেভানো, মশারির ভেতর সুরক্ষিত, গোছানো রাতজীবনের। কিন্তু যে ফল দু-দিকে কামড় লাগা তার জীবন কোনোদিকেই গড়ায় না, হয়তো গর্ভনিরোধকের অর্গ্যানাইজড ভায়োলেন্সে শরীরের অতীতে মোরগের ক্ষয় ছড়ানো বন্ধ্যাত্ব এসে বসেছে। বহুদিন হয়ে গেল তা-ই এভাবে কাঁদা মানায় না। সামাজিক অবস্থান আলাদা হলেও, উদ্ধৃত অন্যান্য কবিতায় যে বিপর্যয় ফুটে ওঠে তার মাত্রা কিন্তু এখানে প্রায় এক।

...জেনো
তুমিও আমারই ছায়া, যদিও সুদূর কোনো উঁচু বাড়ি, অথবা
আকাশ খোলা, বৃষ্টি এলে গাছের নিচেই ঘর,
আমরা দুজন চেনা, ঠিকানা জানি না ঠিকই — এতো যোগাযোগ

২০৭০

এই পঙ্‌ক্তিগুলি, আমার কাছে, সংলাপের একটি অংশ হিসেবে প্রতিভাত হয় যা হয়তো *খাবার* কবিতাটির, বা *বিবাহ* কবিতাটির মানুষগুলির সঙ্গে *বিশ্বকর্মাপুজো* কবিতায় বা প্রবেশক কবিতায় বা *চোর* কবিতায় প্রকাশিত পৃথিবীর মধ্যে ঘটে গেছে। কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়।

কবিতা সেই ইতিহাস, যা সত্যের থেকে খানিকটা বেশি। আজ যদি ২১১২ সনের 'ইতিহাস' লেখার সম্মুখীন হতে হয়, কী কল্পনা করব? হয়তো ভাবব চিন্তাশীল এক কম্পিউটারের ছবি, অধিকাংশ রোবটের বেকারত্ব অথবা পাতায় নতুন শিশুদের ছেলেবেলার গতিচিত্রের অ্যালবাম, প্রতিটা ধর্ষণের খবরে ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির কাগজ থেকে আমার লিঙ্গ অবধি নেমে আসবে বৈদ্যুতিন চাবকানি। নিজস্ব পাপলজ্জাঘৃণার সব কিছুর থ্রি-ডি এফেক্ট ঘিরে ফেলবে আমাদের জীবন। এমন চিন্তা আমার, কারণ আমার বাস্তব ঘিরে আছে জগতের এই রূপ। ২১১২ সালে থেকে এই আনতাবড়ি কল্পনা দেখে হেসে উঠবে কেউ।

সংযোগ হারালে? ভয় শুধু এইটুকু, তেমন বইয়ের পোকা না হয়ে নিশ্চিত
জেনো
তুমিও আমারই ছায়া, যদিও সুদূর কোনো উঁচু বাড়ি, অথবা
আকাশ খোলা, বৃষ্টি এলে গাছের নিচেই ঘর,
আমরা দুজন চেনা, ঠিকানা জানি না ঠিকই — এতো যোগাযোগ

চিনিকলে লুটিয়ে পড়েছি, হাড়ের মড় মড় আমি রেখে দিই, আমি তো
গানের ভাষা তেমন বুঝি না, জানো তুমি? তবে সেই
ধ্বনিকে লাগাও কাজে, যদি থাকে সামান্য কাঁথাও —
দাও পড়োশির দুব্‌লা শিশুকে, আর গাও
দেখো শীত কাঁপবে না, আমি মৃদু সম্পর্ক গড়েছি

সাইকেল উড়িয়ে যায় কারখানা ফুঁড়ে যে ও, না খেয়েই
বিয়োনো বউয়ের পাশে,
আমি ভাবি কী দেবে সে সন্তানের মুখ দেখে, তাই এই চিরকূট
তোমার বিশ্বাসে থাকি সেদিনও এমনভাবে বেঁচে

মুছে দিলে পড়ো তুমি যতো দাগ ফাটা ক্ষয়া
আমাদের জীবনে ঘটেছে, ঘট্টে; ঘটনাপ্রধান সেই বহমান নদীতীরে
একদা আমারই ছবি
দাঁড়িয়ে তাকাও যদি মনে কি হবে না এই জল-মাটি পুরুষ-রমণী
উৎপাদিত সমস্ত ফসল শস্য — সব আমাদের?

২০৭০-এ বসে কেউ এই কবিতায় অবাক চোখে তাকাবে কি না — এ কথা জানা সম্ভব নয়। আমাদের ভবিষ্যচিন্তাগুলির সবই কেমন কল্পবিজ্ঞানের মতো! কী প্রবল বিজ্ঞানের সূত্র-নির্ভর। আসলে বিজ্ঞানই তো ধারক হয়ে উঠেছে ক্রমবিকাশের। সভ্যতার। সেদিক দিয়ে বিবর্তিত কোনো মানব হয়তো হেসে ফেলল ২০৭০ নামাঙ্কিত এই কবিতা পড়ে। তারপর... তারপর, হয়তো সে একবার ভাবল — ১৯৮১-৮২-তে রচিত এ কাব্যগ্রন্থ! কী নাম — মৃদুল দাশগুপ্ত। ইনি ১৯৭০ সাল নিশ্চয়ই দেখেছেন। ভবিষ্যচেতনাতেও তাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছে এই এরা — এই চিনিকলে লুটিয়ে পড়া লোক, তার পড়োশির শীতে কাঁপা দুব্‌লা শিশু, এই না-খাওয়া কারখানা শ্রমিক, তার বিয়োনো বউ — এরা, এরা সব কারা? তারপর, তার মনে প্রশ্ন উঠবে, ১৯৭০? কী ছিল ১৯৭০-এ?

গোপনে হিংসার কথা — স্বাধীন, অসুন্দর

অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

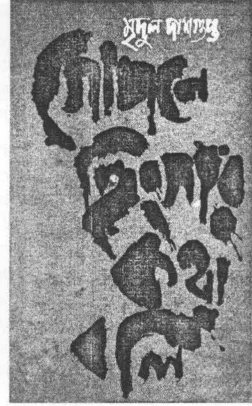
দেখেছিলাম 'নুনের জাহাজ এসে গঙ্গার ঘাটে ভেড়ে'। কোথাও যাবার ছিল না, ইভনিং শো-এও না, অকারণেই স্কুল ছুটির পর শ্রীরামপুরের ঘাটে বসে। তখন রক্তে টান দিতে শুরু করেছে কবিতার 'কু-বাতাস'। সে হাওয়ায় মাংস শরীর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যেত। সে-সময় হাতে পেয়েছিলাম বেশ কিছু কবিতাবই। নিঃসঙ্গতার জিভের ডগায় নুন-ছোঁয়ানো কাব্যভাষাই ছিল বেঁচে থাকার অবলম্বন। সবাই তো একইভাবে বাঁচে না — বেঁচে থাকতে শেখে না — আবার, শিখেও অনাগ্রহে ভুলে যায়। সারাদিন 'কাজের কাজ' না করে সারারাত জেগে ভাবতাম 'বর্ণমালার সাঁকো' কী? কীভাবে ব্যক্ত করব সেই স্পষ্ট অনুভূতি যা অস্পষ্ট না হয়েও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে? বিমূর্ততাকে কোন অগ্রজ কবি কীভাবে ধরেছেন তাঁর কবিতায় — এই ছিল একমাত্র সন্ধান।

দেখেছিলাম হিরোর ভাই ডন কীভাবে মুখ না তুলে সারাদিন সিমেন্টের সাথে জল দিয়ে বালি মাখে। তার অমানুষিক কায়িক শ্রমের মধ্যে যেন মিশে ছিল গূঢ় অভিমান, জেদ আর একগুঁয়েমি। মৃদুল দাশগুপ্তর *শরীর* কবিতার শেষ দু-ছত্র 'ঘুম নেই আমি একটানা / খুঁড়ে যাই তোমাদের মাটি' যেদিন চোখে পড়ল, মুহূর্তে চিত্রিত হল ডনের কোদাল চালানোর শেষে চা খেতে বসার দৃশ্য, অপ্রসন্ন ঘোলাটে চোখের বিদ্যুৎ, আর বজ্রগর্ভ মেঘ যেন 'তোমাদের মাটি' — এই শব্দদুটো কড়কড় শব্দে উচ্চারণ করে উঠল!

কবিতায় যা পড়ি, সেই শব্দের উপমা সারাজীবনে খুব বিরল দু-এক মুহূর্তেই এক ঝলক চোখের সামনে আসে, কানে পৌঁছোয়, স্পর্শে-ঘ্রাণে অনুভূত হয়। যেমন হয়েছিল একটি প্রেমের সম্পর্ক আচমকা ভেঙে যেতে। কিন্তু সে এত কর্মব্যস্ত সময় ছিল যে, শোকার্ততার কোনো ক্ষমা, কোনো অবসর ছিল না আমার কাছে। সকালবেলা কর্মক্ষেত্রে বেরোবার সময় শরীর অবসাদে ভেঙে আসছে। বাধ্য হয়ে রিকশা নিয়েছি। চারিপাশ যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত 'ইহলোক'। হ্যাঁ, *ইহলোক* কবিতাটিকে এভাবেই দেখতে পেয়েছিলাম আমি। 'ছাদের মাদুর থেকে' মাত্র ক-দিন আগে 'আকাশে উড়েছিলাম' একজনের সাথে — কিন্তু, সে এখন এত দূরে যে, তার কাছে আর যাওয়া যায় না। '...পথে খুলি, হাড়, / রেললাইন ঘাসের জঙ্গলে ঢেকে গেছে'। আর আমি দম-আটকানো একটা মশারি ফুঁড়ে আরেকটা মশারি — তারপর আরও-আরও অনেক মশারির গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছিলাম — 'সময় সকাল' তো কী? আর কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা না হবার অন্ধকারের তলায় মশারির নাইলন যেন স্নায়ু ছিঁড়ে দিচ্ছে আর ঘেঁটে যাচ্ছি 'ফিতে খোলা মাংস তাল তাল' হয়ে।

একাদশ শ্রেণিতে পড়ি তখন। ফুসফুসে বড়ো ধরনের আক্রমণ হল সেবার শীতকালে। বাঁচব কিনা জানতাম না। কয়েকটা নিতান্ত কাঁচা লেখা আর ক-টা খুব প্রিয় কবিতার বই ফেলে রেখে চলে গেলে কীই বা এমন ক্ষতি? পড়াশোনাতেও সুবিধে করে উঠতে পারলাম না কোনোদিন, চকচকেও হয়ে উঠতে পারলাম না এই পাড়া ঘরে... নিঃসঙ্গ চোখের জলের ওপরে প্রিয় কবির আঁকা সাঁকোটি তবে কি পেরিয়ে চললাম? চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে দুটো লাইন — 'শ্বাস ওঠা, রাত্রির সীমায় / সেই কবি, পবিত্র, উধাও' — 'না বলা কথার বিষে' ভিজে উঠেছিল দু-চোখ। কীসের জন্য এই শাস্তি? 'বোবা জেদি তৃতীয় পতাকা' — যা নিয়েছিলাম কোলের ওপর, পিঠের নীচে বালিশের 'বিবর্ণ দেশ'। ভেবেছিলাম, যদি কোনোদিন কবিতার বই হয় আমার, তার 'অশুচিপত্রে নরকের ডাকছাপ' থাকবেই থাকবে। প্রতিস্পর্ধী কবিতার বিষে বেঁচে উঠেছিলাম সেবার।

বেঁচে থাকতাম *রান্নাঘর* সিরিজের বিচিত্র কবিতায়। মশলা, মধু, শর্করা, দুধ-এর সেই বাংলা ভাষা বোঝা না-বোঝার দোলাচলে আমার পৃথিবী সত্যিই



রান্না হতে চেয়েছিল, চেয়েছিল 'জল ভেতরে ঢুকুক'। 'গোপনে হিংসার কথা' যুগপৎ বলতে-বলতে আর শুনতে-শুনতে জীবন কাটছিল খুব শ্লথগতিতে। খাপছাড়া হয়ে উঠছিলাম দিন-দিন। 'তেলে জলে মশলার রক্তিম সূর্যাস্তে' ঘনিয়ে উঠত 'তুক'। 'উনুনের তুমুল হাঙ্গামা'-এ ভিড়ে গিয়ে হঠাৎ ছিটকে সরে আসতাম অনেক দূর থেকে কবিতার চিত্রময়তা দেখতে পাবার আকুলতায়। লুকিয়ে পড়তে চাইতাম 'মাংসের গন্ধের নিচে'।

আজও নিজের তালুর স্পর্শে মুখ মুছে ভাবি, তুমি আমাকে আর চিনতে পারবে না নিশ্চিত! আমাদের আলাদা দেশ, আলাদা ভাষা — না, এ কোনো হিংসা-ক্রোধের কথা নয়, নেহাৎ উপশমের সহনীয় একটা পথ। আসলে আমরা কেউই বোধহয় 'নিজেকে অতো ভয়ংকর শাস্তি দিতে' চাইনি কখনো!

যে গৃহ সূর্যাস্তে রঙিন

জিৎ মুখোপাধ্যায়

প্রায় এক দশক আগে মৃদুল দাশগুপ্তর সঙ্গে আমার মনোরম পরিচয়। সে-ও এক গদ্যের আড়ালে। আমরা তখন সবেমাত্র কলেজে উঠেছি। বন্ধুদের মুখ আর একধরনের অলীক স্বপ্নের আভাস কেমন যেন ঘিরে থাকত সেইসব দিন। শুধুমাত্র কবিতা দিয়েই অনবরত গড়ে উঠত সে অনন্ত সময়, তা আজ আর নিজের কাছে নিজেকে বলতে হয় না। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এর উপর ছোটো-ছোটো বইঘরগুলো তখন আমাদের কাছে সব পেয়েছির দেশ। পুরোনো বই-এর স্তূপ সরিয়ে আমরা উদ্ধার করতাম সব নক্ষত্রের মতো বই। কত পত্রিকার দুর্লভ সংখ্যা। বেশিরভাগ দিনই পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে পাড়ি দিতাম বন্ধুদের মেসবাড়িতে। কখনো রাজাবাজার। আবার কখনো শহরতলির মিশনে। কোনো ঘরানাতে সেদিন আবদ্ধ থাকেনি আমাদের সেই রোদ-ছায়ার পাঠ। তর্জনি নির্দেশ করার মতো ছিলেনও না কেউ। এভাবেই একদিন সে সুসময়ে হাতে এসে গিয়েছিল একটি পত্রিকার আশ্চর্য সংখ্যা।[১] অনেকজন কবি জানিয়েছিলেন তাঁদের কবিতাভাবনা — কেন লেখেন? আর তার পরে তিনটি করে কবিতা। সেই পত্রিকার সূচনায় ছিল শঙ্খ ঘোষের *হালকা একটা আলাপ* নামে এক লেখা। মলাটে বড়োই ভাবুক একখানা মুখের ছবি। তার ত্রিচক্ষু। তখনও জানা হয়নি

সেইসব কবিদের লেখার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য। আমরা গোল হয়ে বসে উচ্চকণ্ঠে লেখাগুলি পড়ি। দুপুর জুড়ে তর্ক করি। ভাবনার দীর্ঘ ওই মিছিলে, একটি লেখা পড়ে চোখ ভিজে গিয়েছিল খুব। সে লেখা যেন ঘটমানের সামনে থেকে কথা বলছে। যার বেঁচে থাকার মুখচ্ছবির উপর নেই সময়ের মুখোশ। বলছে : এই আমার ক্ষুভিত বেঁচে থাকা কবিতা নিয়ে। সেই ছোটো গদ্যটি লিখেছিলেন কবি মৃদুল দাশগুপ্ত। নিজের কবিতাভাবনা বিষয়ে, যার শিরোনাম *আমি যে রঙিন* :

> প্রায় অচল জিহ্বা মুখগহ্বরে অতি কষ্টে নেড়ে, আমার করতলে তর্জনীর টোকা দিতে দিতে, বাবা বলেছিলো, ল্যাখোস তো?
>
> হ।
>
> মস্তিষ্কে অধিক রক্তক্ষরণে দৃশত বোধহীন, তাও আর্তনাদ; খুইলগ্যা দে — অক্সিজেন, স্যালাইনের নল ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলেছিলো বলে বাবার হাত-পা গজদড়ি দিয়ে বেডের রেলিংয়ে বাঁধা ছিল। খুলে দিই।
>
> দেহি। — লিখেছি কিনা নিশ্চিন্ত হতে বাবার হাত এরপর আমার প্যান্টের পকেটে থাবা দিতে থাকে।
>
> বের করে দিই দুটো একটা কাগজ।
>
> মুঠো করে ধরে চোখ বোজে বাবা। সেরিব্রালের ছোবলে বেঁকে যাওয়া মুখে বরিশালি হাসির ধীর বিলীন ঝিলিক, আধো আলোয় তাও টের পাই। গত ১৫ মার্চ (৯৭), মাঝরাতে, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। পরদিন সকালে মৃতের মুঠোয় কুটোর মতো ধরা কবিতা দুটি ফের নিয়ে পকেটে রাখি। কেন লিখি? এরপর, আজ, এ প্রশ্ন অবান্তর।

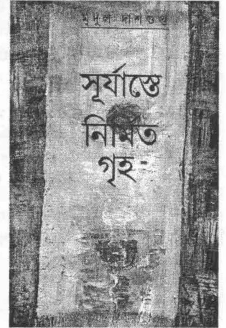
সেদিন আমরা আর কেউ কথা বলিনি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। আমরা যেন একটা পথ পেয়েছি। যে পথ সব ঘুরে শেষে চলে গেছে কবিতার গুঞ্জনে।

সেই শিকড়ের অন্তরালে শৌখিনতার কোনো মাত্রার কথা আজও সেভাবে ভাবতে পারি না। এ অবশ্য প্রতিজ্ঞা করে গড়ে তোলা কোনো নিয়ম নয়। এভাবেই হয়তো আলো-অন্ধকারে একমুখি যাত্রা ছড়িয়ে পড়ে নতুনতর বিশ্বাসে। ভেঙে যায় সচল অভ্যাসের ভিত। তখন ভাবতে ইচ্ছে করে 'মৃতের মুঠোয় কুটোর মতো ধরা' সে কবিতা, অতীত সংকটের বার্তা নয়। বরং জানিয়ে দেওয়ার উপায় — দৈনন্দিনকে ছুঁয়ে থাকবে আমার চলাচল। সত্যি তো, তখন অবান্তর হয়ে পড়ে 'কেন লিখি' একথা বলবার রুচি। এরপর একে-একে পড়া হয়ে গেছে তাঁর সব কবিতা। একাধিক গদ্য। এমন কবিতাময় সংলাপের ভেতর দিয়ে তাঁর কবিতার দিকে যেতে-যেতে বুঝতে পারি, নাটুকেপনার অনেক উপরে দাঁড়িয়ে আছেন এই কবি। সাজিয়ে আর বানিয়ে তোলবার আয়োজন নেই কথা বলায়। অন্দরমহলের ভাবনায়। একটা দশকের অনুপুঙ্খ সময় গাঢ় হয়ে মিশে আছে মৃদুলের প্রথম দিককার কবিতায় *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর কবিতামালায় আমরা কি টের পাই না সময়ের ঘূর্ণাবর্ত? যে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল গোটা সত্তর দশক জুড়ে। সেই লেখা পড়ে বড়ো নিবিষ্ট হয়ে আসে মন। বড়ো সুচেতনার সে বোধ। প্রেমে-সংগ্রামে অবিরাম টান। কবিতার কাছে প্রণত হবার অভিজ্ঞতা সেখানে।

আজ একথা নতুন করে বলবার প্রয়োজন পড়ে না, তাঁর কবিতায় সর্বদা ছড়ানো থাকবে ভাঙাচোরা সময় আর জীবনের ইতিহাস। 'সত্তর দশকে এই আশ্চর্য শহরে' একদিন শোনা গিয়েছিল স্পষ্ট ঘোষণা : 'গরল আমি ডরাই না হে / বিষে আমি ভয় পাই না / আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি'। সেই অর্থে আমার কোনোদিন দেখা হয়নি, সত্তর দশকের ভেতর নিহিত হয়ে থাকা কালো আগুন। দুরন্ত ক্ষোভ। বিপরীত মতাদর্শের রেখা। প্রতিবাদ। দেওয়াল জুড়ে লেখা মুক্তির গান। অথচ সে-দশক এখনো বেঁচে আছে কবিতায়। চলচ্চিত্রে। শিল্পের নির্মাণে। যে সময় নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখতে হয়েছিল, সেইসব ছেলেদের কথা — ব্রাহ্মমুহূর্তে যারা ঘর ছেড়ে গিয়েছিল। কেউ ফিরে আসেনি। কেবল 'ভেসে আসে হরিধ্বনি, বহুদূর থেকে...'। 'জন্মভূমি আজ' এই দুটো শব্দ তখন শিরোনাম হয়ে উঠবে তাঁর কবিতায়। একবার মাটির দিকে তাকাতে বলবেন। মানুষের দিকেও। অন্ধকার কঠিন পাথর হয়ে আসে এ কবিতায়। সেদিন 'গোলাপেও পুলিশের গন্ধ'



প্রথম সংস্করণ



দ্বিতীয় সংস্করণ

ছিল। মৃণাল সেনের *কলকাতা ৭১* শুরু হবে কুড়ি বছরের এক ছেলের দৌড়নোর ছবি দিয়ে। 'হাজার বছর ধরে' সে দেখছে 'শোষণের ইতিহাস'। কিন্তু 'মৃত্যুর ভিড় ঠেলে' সেই চলা থেমে যায় গুলির শব্দে। তিনটি গুলি। শহরের চেনা পার্কে পড়ে থাকবে তার পরিচয়হীন শরীর। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে তাই বলতে হয়, 'পাবে না জেনেও কাল রাত-দুপুরে বন্দুক উঁচিয়ে / দু' গাড়ি পুলিশ / সারা বাড়ি খুঁজে গেল তন্ন তন্ন করে।' এই দমন ও প্রতিবাদের জার্নালের যেন শেষ নেই। বলতে-বলতে ক্রমশ বেড়ে যায় অসীম পরিধি। সেদিনের লড়াই-এর কথা বলা আছে অগণিত অক্ষরের শিয়রে। কত তরতাজা ছেলেদের নাম পড়ে মুখস্থ হয়ে যাবে গোটা জন্মের জন্য। মৃদুল দাশগুপ্ত ওই দিনগুলিতে লিখবেন : 'আছি বাতাসের মতো, ও আমার মিষ্টি মা-মণি / আছি তোমার দুচোখে আজও কঠিন শীতল / মানো না যে মরে গেছি, বোকা মেয়ে, এখন মানোনি / তাই জেগে বসে থাকো, ভাবো এলো পলাশের দল'। যে যুবক বেরিয়েছিল অনেক আকাঙ্ক্ষায় অথচ ফেরা হয়নি ঠিকানায়। হয়তো গলির শেষ ঘরে। বেড়ে উঠেছে তার মা-র প্রতীক্ষা। মৃত্যুর পরও। *কোনো শহিদের মা-কে* নামে এই কবিতা, শুধু সূচনাবিন্দু হয়ে থেকে যায় না। কখনো সরাসরি উঠে আসে তাদের মধ্যে দ্রোণাচার্য ঘোষের নাম। তখন '...বন্দুক নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে / দ্রোণাচার্য ঘোষ! / ভাবো, ভাবো সেদিনের উৎসব! বরানগরের গঙ্গার জল থেকে / আবার এসেছে উঠে / তিনশো তরুণ'। কে এই দ্রোণাচার্য? জেলে খুন হয়ে যাওয়া একজন। কৃষক সন্তান। সর্বোপরি পল্লবিত তরুণ কবি। এভাবেই তখন 'একটি মশাল ঘুরতে ঘুরতে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সহস্রকে' আর নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত হাওয়া বয়ে যাচ্ছে নকশালবাড়ি থেকে ময়দান অবধি।

পুরোনো দিনগুলোর দিকে অল্প তাকাতে হল কিছুটা অন্ধের মতো। তার কারণ, ওই ছোটো গদ্যটার পরে যখন অকাতরে শুরু হয়েছিল তাঁর কবিতা পড়া — জানা ছিল না এসব দিনের সামান্যটুকু। অল্প একটা আভাস ছিল শুধু ভাঙাগড়ার। পড়তে-পড়তে আবর্তনটা উপলব্ধি করা। কিন্তু যেদিন খুঁজে পাওয়া গেল ভিতরমহলের এই দরজা — বুঝে নিতে দ্বিধা রইল না, কোন পথে অনুপ্রবেশ করছেন এই কবি। সেদিনের প্রত্যয়ে ভর করে চার দশক পেরিয়ে এসেও এক সাক্ষাৎকারে উচ্চারণ করেন তিনি : '...মনে তো সমাজ বদলের স্বপ্নই বলবৎ আছে। সেই স্বপ্নই আজীবন... দেখে যাব ...শ্রেণিহীন মানুষের বিজয়ের স্বপ্ন...'। চিরদিন। গোটা জীবন। দিনে-দিনে তাঁর চেতনা আরও প্রখর হয়ে উঠবে। বিরামহীন নতুন রূপে।

পুনরায় একবার প্রথমদিকের কথার রেশ ধরে কবুল করবার : *আমি যে রঙিন* কবিতাভাবনার পরবর্তীতে যে তিনটি কবিতা ছিল, আজ তা *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* গ্রন্থের শেষ তিনটি কবিতা — *সন্ধ্যা বোয়িং, আকাশে একটি তারা* ও *নিজেকে*

নিদ্রিত দেখে। অবশ্য *নিজেকে নিদ্রিত দেখে* কবিতার নাম ছিল তখন *মূর্খ*। আর পঙ্‌ক্তিগুলি আমরা যখন-তখন বলতাম। ক্লাস করতে-করতে। আকুল বর্ষার দিনে লাইব্রেরিতে। কখনো অধিক রাতের হল্লা সেরে কুয়াশা পেরিয়ে এসে বাড়িতে আলতো পা দিয়ে মনে পড়েছে :

নিজেকে নিদ্রিত দেখে আকস্মিক মনোবেদনায়
শিয়রে বসেছি ঝুঁকে, কোনও কোনও রাত্রিকালে একাকী নিশ্চুপে
হয়তো দু-এক ফোঁটা অশ্রুপতনের ফলে আধো চোখ মেলে
আবার নিদ্রায় ডুবে যেতে যেতে সে ভেবেছে, স্বপ্নে দেখা যায়।

এমন আচ্ছন্নতা ভুলে যাওয়ার নয়। অনেকদুয়ারি হয়ে আসত সেদিনের ঘরে ফিরে আসা। পিছনে ফিরে তাকালে সে পথটুকু খুব দেখা যায়।

২

বারবার ছোটো কবিপত্রকে নিজের কবিতা প্রকাশের মঞ্চ হিসেবে দেখে এসেছেন মৃদুল। নিরাভরণ তার রং। সেখানে দায় আছে নিকট আত্মীয়তার। *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-র কবিতাগুলি *আরও রান্নাঘর* নামে প্রকাশিত হয়েছিল দুই বাংলার ছোটো কাগজে। অবশ্য এই কবিতাগুচ্ছের যথার্থ সূচনা ধরা আছে *গোপনে হিংসার কথা বলি* গ্রন্থে। সমগ্র অভিযাত্রার ঘ্রাণ পাওয়া যায় কবির মনের ভেতরের ঘরে। যেখানে প্রতিদিনের দেখা ঘটনা হয়ে উঠছে ইতিহাস। তার রকমফের আছে। দিনলিপির সূক্ষ্ম রেখা তাতে। রহস্য ও সংকেতে ঢাকা উপরিতল। আমরা পথে যেতে-আসতে দেখি তো বিশাল হাইরাইজ। কতকালের বাড়ি। তারই পাশে ছোটো ফুটপাত। সেখানে রান্না করছে কত পরিবারের মানুষজন। একদিন এভাবেই ফুটপাত ধরে যেতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল 'এটাই যেন গোটা পৃথিবীর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ, গোটা পৃথিবীটাই রান্নাঘর... তার পেটের ভেতর আমরা আছি'। আর তাই চাইলেন পথের শ্রম শেষে 'কোনো পান্থ উপোসী থাকবে না'। জেনে যাচ্ছি, রন্ধনশালার অনুষঙ্গের উপাদান হয়ে উঠবে তাঁর কবিতার নাম। 'অন্ন' 'তাপ' 'মশলা'-র মতো শব্দ তখন মৃদুলের কবিতার স্রোত ছুঁয়ে থাকছে। 'রান্না হচ্ছে' তাঁর প্রতিদিনের জীবনের কেন্দ্রে : 'নিজেকে পাচক ভাবি, অন্ধকে শোনাই গান, / বধিরের জন্য আলো, ক্ষুধার্তের হাতে অস্ত্র দিই। / হাওয়া দিই গোপনীয়তায়। যদি / সম্পর্ক ছাড়াই কোনো রেলসেতু গড়ে ওঠে...! আমি তাই / ভোর ভোর অল্প আঁচে পাত্র বসিয়েছি।' *রান্নাঘর* পেরিয়ে *আরও রান্নাঘর* অবধি এই অভিজ্ঞান গভীর হয়ে থাকবে। *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-এ এসে দেখব 'নক্ষত্রে রচিত' হবে সেই ভাষা। বলা যায় তাঁর কোলাহলের ঘরে সন্ধ্যাই হয়ে উঠবে সকাল। কেননা 'কারো কারো রন্ধনের ছন্দে মৃদু ত্রুটি' থেকে যাবে।

সূর্যাস্ত হয়ে যাবার পরে অন্ধ যেমন ঘুমিয়ে পড়ে, অকলুষ সেই পথে কবির রহস্যময় যাত্রা। ইশারা আরও অবারিত। তখন আনন্দে নেমে আসে, পাত্রভর্তি অন্ন। আবার পড়তে গিয়ে দেখি, তাঁর সামাজিক মুখচ্ছবিটাই কখনো মেঘময় হয়ে ওঠে। তখন জানতে ইচ্ছে হয় : 'বিবাহ হয়েছে তার?' নাকি এ বেদনার পিছনে 'সে একা রাঁধে, খায় একা, নিদ্রা যায় একাকী কোথাও'। তখন অভিজ্ঞতায় জড়িয়ে পড়তে থাকে পরিচিত ছায়া। দৃশ্যে আর শব্দে মিশে তাই '...বাক্য, গুপ্তবিদ্যা' হয়ে ওঠে। সেই আড়ালে তাঁর কবিতায় সমানে ভরে থাকে দেশকালের চলমানতা। ভ্রাম্যমাণ সংসারের থালা, বাটি ও উনুনের তলদেশে ফুঁ দিয়ে জাগিয়ে তোলা আগুনে 'সকল রান্নাই শিল্প'। এক আলোকিত সমগ্রতা ও-রান্নার ঘরে।

সবকিছুর পরেও মৃদুলের বিশ্বাস, কবিতা 'স্বয়মাগত'। হয়তো সে কারণেই তাঁর পরিমিত কথাগুলি কেবলই মনে হয় অন্তরীক্ষ খুলে নেমে আসে। কতদিন পড়তে গিয়ে দেখি, সমাপিত হয়ে আসছে সম্মিলিত শব্দের নিছক অর্থ — ঠিক সেখান থেকে শুরু হয় অনুভূতির কারুকাজ। নানা বিষয়ের রূপ অতল হয়ে দেখা দিতে থাকে। আমাদের নিচু পৃথিবীর জীবন আরও অন্তর্লীন হয়। তাই ফের পড়ি *ক্ষুধা অসমাপ্ত রেখে* কবিতার কিছু অংশ :

ক্ষুধা অসমাপ্ত রেখে তাকাই কন্যার দিকে, সে হয় তখন
অবাক জলের পাত্র, মাতৃভাষাময় তার মুখের মমতা।
দক্ষতা, তোমাকে দিই এই দৃশ্য, ভাবো, আমি এরও পরে
নিজমাংস খাই

যে মন সর্বত্রগামী, তাও যেন মুছে দিই মন থেকে;
অকার্যকারিতা, আমি
তোমার সন্ধান করি দশহাতে ক্ষতস্থানে...

ব্যক্তিগত এমন প্রবাহের অপর প্রান্তে, সংসারের মেয়েটির ঘুম ভাঙিয়ে তাকে 'যাও রাঁধো' বলা আর অনেক পরে প্রণয়ীর কাছে যেতে 'সে বলে, দুঃখিত, আজ ঢের রান্না বাকি পড়ে আছে'। ছোটো-ছোটো ছবি মনে সাজাতে গিয়ে বুঝে যাই, রচনার গোপনে তিনি রাখবেন রৌদ্রময় আবরণ। পাঠক আমি নেমে যাই তার শিকড় ধরে, নীচে — সীমায়, সেই মহাশূন্যের কাছটিতে। তারপর আর কিছু নেই। শুধু আভাটুকু — জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকা কালের ক্রম। ক্ষত। কাহিনির শেষে 'লবণের মধ্যে থেকে আমরা নিজেরা মিশি সমস্ত রান্নায়'। এই গ্রন্থের ঘর খুলে অপেক্ষা করি প্রতিদিন, অলক্ষ্য সে তরঙ্গের — খুব নীরবে তাকাই সে ঘরের দিকে। আবার থেমে-থেমে পড়ি। নিশ্চিত একটা বোধের পথনির্দেশ দেখি। ধীরে সেখানে খুলে যাচ্ছে অন্তর্লোকের জানলাখানা। তমসতা ছাড়িয়ে গিয়ে এক বাঁক। চারপাশের মুখশ্রীর শেষে 'কথা বলা নদীর ওপারে' চোখ তুলে 'ঈশ্বরের কিঞ্চিত অধিক' স্বরে সেখানে কেউ বলছে :

অর্ধেকেই বাক্যহারা, বলি, শাস্ত্র বাকিটা পড়াও!
ওঠ ধূম গ্রন্থাগারে! কাহিনীর তলদেশে জাগে রান্নাঘর

কাহিনি শুধু ক্ষতচিহ্নকে বহন করে চলবার নয়। দাম্পত্যের এককণা চিরায়মান রোদ্দুর কখনো এসে পৌঁছোয় নতুনত্ব নিয়ে। রান্না বাকি পড়ে থাকবার আত্মজীবনের মনে পড়তে থাকে উড়ন্ত রিকশায় 'নভোচারিণীর' কোল। যেখানে 'রাখা বাংলা ভাষা, সহজ কেতাবখানি ৬৪ রান্নার।' পড়ে থাকে সেখানে : 'এতো রান্না বৃক্ষতলে হাজার ক্ষুধার মুখে / প্রতিধ্বনি জাগে।' আমি ফের হাঁটতে থাকি *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর স্রোতের উপর।

আমার ঘর জড়িয়ে এতদিনে উঠে এসেছে অনেক লতাপাতা। কবিতার। নিরভিমান এক সময়ে রোপিত হয়েছিল সেই বীজ। রোজ সকালে আমি সেসব সবুজ পাতা সরাই। স্মৃতি সরাই দু-হাতে। ভাবি, কবিতার ভেতর আমাকে নিরুদ্দেশ করে দেওয়া শাশ্বত পঙ্‌ক্তি নিয়ে। পড়তে-পড়তে এগিয়ে যাওয়া — ফেলে আসা ভুবন। যে কবিতার হাত ধরে আমি এসেছি নির্জন নির্দিষ্ট শহরে। *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* বই হয়ে উঠবার আগে, তার মধ্যের তিনটি কবিতা পড়ার শিহরনের সঙ্গে যুক্ত আছে আমার বন্ধুরা। কৈশোর পেরিয়ে যেতে গিয়ে যাদের সঙ্গে দেখা। এখনও দেখি, কোরাসে সবাই বলছি *আকাশে একটি তারা*-র রূপ :

অধিক দুশ্চিন্তা হেতু মনের উপরে এক নক্ষত্রস্থাপনে
সংশয়ে অস্থির ভাবি এবার কল্পিত মূর্তি নিকটবর্তিনী।
যেন রশ্মি ক্ষতস্থানে, রোগগ্রস্থ তত নই আর —।

নিবিড় তারকাসঙ্গে একাকিনী, ভুলে গেছি নাম...
কিশোরীর কৌতূহলে তথাপি সে একে একে
সকল বোতাম
পুনর্বার খুঁটে খুলে, আলোলিকা, রুদ্ধশ্বাস, সহসা বিহ্বল

দূরে রান্না হচ্ছে কোথাও। দিগন্ত ছাড়িয়ে উঠছে ধোঁয়া। উত্তরণ আছে তার।

৩

প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং হাউসের তিনতলায় যে ঘরটায় একসময় জীবনানন্দ থাকতেন, সেটা খোলবার একটা আয়োজন করা হয়েছিল এ বছর (২০১২) তাঁর জন্মদিনে। খুবই ছোটো আর জীর্ণ সেই ঘর। সামনে কাঠের বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে তলায় তাকালে বিষম ব্যস্ত মহাত্মা গান্ধি রোড। সেদিনের নানারকম আন্তরিকতার ভেতর নীরবে ঘটে গিয়েছিল একটা ঘটনা। দুপুর পেরিয়ে ওখানে এসেছিলেন মৃদুল দাশগুপ্ত। অপরিসর ঘরে নীচু গলায় তিনি বলছিলেন, জীবনানন্দের বাড়ির কথা। বরিশালের কথা। শ্রোতা মাত্র জনাকয়েক। কাছে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম বারো বছরের স্মৃতি। তাঁর কাছে জানতে ইচ্ছে করছিল 'মৃতের মুঠোয় কুটোর মতো ধরা' কবিতা দুটোর ছবি। কোন দুটো কবিতা ছিল সে ঠান্ডা হাতে? অসংকোচে আর তা জানা হয়নি। নিশ্চয়ই তাঁর সমগ্র কবিতার ভেতর আছে সেই কবিতা। প্রথম দিককার কবিতা পড়বার সূত্রে আমি চেয়েছিলাম এই কবির কবিতার অন্দরে ঢুকে পড়ার চিহ্নরেখা ধরে রাখতে। কীরকম বিভোরতা ছিল এক নতুন পাঠকের। বড়ো আলোর সে বিকেলে সিঁড়ি দিয়ে খুব দ্রুত নেমে যাচ্ছেন মৃদুল দাশগুপ্ত। হয়তো অধিক রাত্রে বা তক্ষুনি ফিরে যাবেন 'সূর্যাস্ত নির্মিত গৃহ'-তে। নিজেরই বাড়িতে। যাওয়ার পথে ছড়িয়ে থাকবে এই পৃথিবীর রৌদ্রছায়ার শত রান্নাঘর।

১. *এবং মুশায়েরা*। কবি ও কবিতা বিশেষ সংখ্যা। জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৮।

একটি কবিতা, ধানখেত থেকে

অভিমন্যু মাহাত

পুরুলিয়ার জমি একফসলি, রুক্ষ, কাঁকর যুক্ত। খরাপ্রবণ। বৃষ্টির জল নির্ভর। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে...' প্রার্থনায় জমিতে কৃষিকাজ হয়। বৃষ্টি না হলে খরা। আর খরা মানেই একটা সময় ছিল আমাদের 'কদ' খেয়ে থাকা। কদ একধরনের শস্যবীজ। যার দানা ক্ষুদ্রাকৃতি। শস্যদানা সেদ্ধ করলে পরিণত হয় বৃহদাকারে। সেই কদ খেয়েই দিন গুজরানো। 'ভাত' দেখতে পাওয়া ছিল মহার্ঘ। খরাপ্রবণ জেলা বা একফসলি জমি হলেও তার প্রতি আত্মীয়তার অভাব কখনোই ঘটেনি আমাদের। বরং আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আত্মীয়তার নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের একফসলি জমিকে এক দেবী হিসেবে মনে করেছি।

বস্তুত, আমাদের আদিবাসী রীতিতে ধানজমিগুলিও এক দেবী। বছরের প্রথম জমিতে লাঙল দেওয়ার দিনে 'হাল পুণ্যাহ' পুজো। বীজের চারা বোনার সময় 'রোহিন' উৎসব। ধানের চারা প্রথম রোপনের দিন 'পাঁচ আঁটি' অর্থাৎ ধান গাছের বিয়ে-রীতি জড়িয়ে রয়েছে। কোনো-কোনো জমিতে বিশেষ দেবতা থাকলে, সেখানে লাল ঝুঁটিওয়ালা মোরগ বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। এরপরে রয়েছে ধানগাছ কাটার পূর্বে গরাম থান পুজো।

আমাদের রীতিগুলো উল্লেখ করলাম, কারণ এই রীতিগুলো ধানখেতকে আবর্তিত করেই। রীতি বা প্রথা না থাকলে তার প্রতি মমত্ব বোধ জাগে না। এই রীতি-প্রথা নিয়েই আমাদের জীবনচর্চা বা বেঁচে থাকা। বস্তুত, মৃদুল দাশগুপ্তের *ধানখেত থেকে* পড়ে আবার আমি নিমগ্ন হলাম কৃষিকাজে। ধান জমির প্রতি আচ্ছন্ন। জীবিকার স্বার্থে এখন আমাকে আমার গ্রাম থেকে বহু দূরে থাকতে হয়, কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থটি পড়ে আমি ফিরে পেলাম আমাদের রীতিনীতিকে।

কিশোর ধানের চারা, শিশুধান,
ওড়ে ধর্মবক...
উদ্বেগে তাকিয়ে থাকি
আমিও তো কবিতা-কৃষক

ধর্মবককে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কবি নিজে উপলব্ধি করেছেন তিনি একজন কৃষক। ফসল ফলানোই তাঁর কাজ। কিন্তু ধানের চারা না থাকলে, জমি থাকলে কৃষক কোথায় যাবেন? বাঁচবেনই বা কীভাবে? ওই অস্থির সময় কবিকে জাগ্রত করে গিয়েছে। পাঠককেও নাড়া দিয়ে গিয়েছে।

বই-এর দ্বিতীয় কবিতায় মানব ছদ্মবেশধারী দানবের কথা বলা হয়েছে। মানবেরা মূলত অন্যের অনিষ্ট করতে যায় না। চিরপ্রথা অনুযায়ী অন্যের ক্ষতি করতে যান দানবেরা। আর দানবেরা এসেছেন মানুষের বেশে। আর এখানেই শঙ্কিত কবি। কেন দানবেরা আসবেন মানব হয়ে? সেই কথা বলে প্রজাদের অর্থাৎ রাজ্যবাসীকে জাগ্রত করতে চাইছেন কবি। বলতে চাইছেন সত্যজিৎ রায়ের কথা। রাজাকে দড়ি ধরে দাও টান। রাজা হবে খান-খান। কবির দূরদৃষ্টি অবশ্যই তারিফযোগ্য। এই কবিতাটিকে আমি সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক কবিতা বলছি না। মোদ্দা কথা হল, ক্ষমতায় থেকে যিনি দানব হবেন, তিনিই খান-খান হবেন!

কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় কবিতা *রাজার ঘোড়া*। রাজা ঘোড়া ব্যবহার করেন দখলের জন্য। যুদ্ধের জন্য। ঘোড়া এখানে রূপক। ঘোড়ার সওয়ারিরা আগের মতো আর বল্লম, বর্শা, তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করেন না। এখন তাঁদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র। বোতাম টিপলেই রক্ত। কান্না। শোকার্ত পরিবার। কী যায় আসে রক্তে? রাজার ঘোড়া যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। দখল হয়েছে। এইবার দখল হওয়া সাম্রাজ্যে পুঁতে ফেলো ইটের গাঁথনি। লোহার যন্ত্রাংশ। ধ্বংস হোক শস্য। আমাদের পেটের ভাত।

ওয়ান ফরটি ফোর। এই ধারা যতটাই গণতন্ত্রের পক্ষে, ততটাই বিপক্ষে। অন্তত ১৪৪ কবিতায় এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। ক্ষমতার অপব্যবহারে পরিবেশকে ধ্বংস করেছেন ক্ষমতাধারীরা। উজাড় হয়েছে গ্রামের লোক, সাধারণ চাষি। চড়ুই-এর ঝাঁক যখন বাস্তুহারা হয়ে পড়ছে, তখন তো প্রমাণিত নিজের ভিটেতেও বাস করতে পারছেন না কেউ। কেমন এই ধারা? কার মঙ্গলে সংবিধানের পাতায় সংযোজিত হয়েছিল? কবি যেমন উত্তর পাননি। আমরাও উত্তর পাব না।

একদিন কবিতাটি পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি...

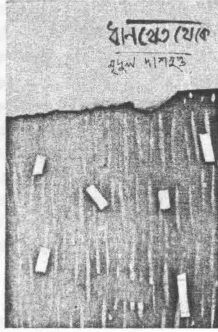
থমথমে মুখ তাঁর
গমগমে গলা
দু'হাত দুলিয়ে তাঁর
ওস্তাদি চলা।
পেল্লাই বাড়ি তাঁর
গাড়ি কাচ ঢাকা
চাকরি-বাকরি নেই
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।
আগে পিছে রক্ষীরা
সাথে শত চ্যালা
শহরে বসান তিনি
বার্ষিক মেলা।
সব্বার দাদা তিনি
কারও নন দাদু
থানা ও পুলিশ কেনা
বাঁ হাতের জাদু।
ছোটরা সকলই বোঝে
রেখেছেও ভেবে
এই লোক একদিন
হামাগুড়ি দেবে।

আমি এই কবিতাটি নিয়ে বলব না কিছু। পাঠক বুঝে নিন।

অন্যায়ের প্রতিবাদ কবিদের রক্তে বরাবর রয়েছে। কবিরা মূলত প্রতিবাদীই। সে প্রতিবাদ রাস্তায় নেমে বা লাঠি নিয়ে সবসময় হয় না। প্রতিবাদ হয় তাঁর



প্রথম সংস্করণ



দ্বিতীয় সংস্করণ

লেখায়। যে প্রতিবাদ ক্ষণিক সময়ের জন্য হয় না। তা আবহমানের। 'মা-র কোল থেকে শিশু কেড়ে নেয় / শুরু হলে সেই কালো অধ্যায় / আমি বলবই — এটা অন্যায়...'। রাষ্ট্র যদি জোর করে জমি দখল করতে যায়, কবি বলবেন সেটা অন্যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে রাজি আছেন কবিও।

জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল নন্দীগ্রাম। সেই নন্দীগ্রাম নিয়েও মৃদুল দাশগুপ্তের কলম গর্জে উঠেছিল। মাটির নীচে পোঁতা শিশু-কঙ্কালগুলির আর্তনাদ তিনি শুনতে পেয়েছেন। ছেঁড়া ডুরে শাড়ির হাহাকার শুনতে পেয়েছেন কবি। 'ভেসে আসা শব, পরিচয়হীন / কী তোমার নাম? / — নন্দীগ্রাম।' পরের কবিতায় ক্রন্দনরতা জননীর পাশে থাকাটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন কবি। বলেন, 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে / এখন যদি না থাকি / কেন তবে লেখা, কেন গান গাওয়া / কেন তবে আঁকাআঁকি?'

প্রতিবাদী হলেই তুমি মাওবাদী। সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটা অনেকেই হয়তো বলবেন। কিন্তু কয়েক বছর আগেই লিখে এসেছেন মৃদুল দাশগুপ্ত। *লাল পতাকা* কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'উন্নয়নের নিন্দা করছ! / হত্যা বলছ! আচ্ছা! / বান্দোয়ানের কেস দিয়ে দেব / মরে যাবে বউ-বাচ্চা!'

'সমাজ জুড়ে যখন ব্যস্ত বৃহন্নলা', মৃদুল দাশগুপ্ত তবু অনুভব করেছেন সমাজকে। রাষ্ট্রকে। কোনো তত্ত্ব-তাড়িত নয় এই অনুভব। তাঁর উচ্চারণ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। শানিত করেছেন তাঁর কলম ধানখেত আক্রমণকারীদের। আমি আচ্ছন্ন হয়েছি তাঁর *শূন্যে সাবলীল* কবিতায়। '...রক্তাপ্লুত পড়ে ধান খেতে, অল্প অল্প শ্বাস... / ওড়াতে সচেষ্ট তাও হাত ধরে দু'জন বাতাস'।

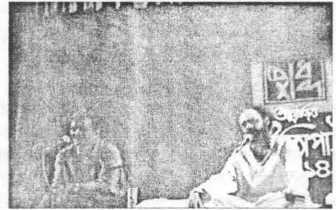
সবশেষে, হিরণ মিত্রের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ কাব্যগ্রন্থটিকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীর অলংকরণ নিয়ে দু-চার কথা বলার ধৃষ্টতা নেই আমার।

এক ভাসমান সোনার বুদ্বুদ

রাজদীপ রায়

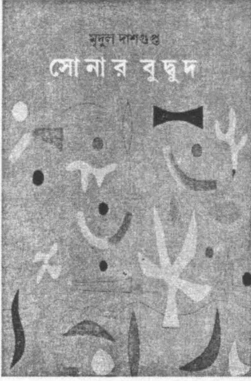
তখন ওঁকে সেভাবে চিনতাম না। জানতাম না, উনি কে। সেটা ২০০৩-এর ২৮ সেপ্টেম্বর। সুস্নাতদার ডাকে আমরা কয়েকজন মিলে গেলাম বালি সাধারণ গ্রন্থাগারে। কবিতা পড়বেন জয় গোস্বামী এবং মৃদুল দাশগুপ্ত। তখন সবেমাত্র স্কুল শেষ করে কলেজ। বন্ধুদের কারো-কারো হাতে ঘুরত *ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা?* কিংবা *পাতার পোশাক*। *কবিতাসংগ্রহ* ১-টাও কেউ পড়তে দিয়েছিল যেন। টিভিতেও মাঝেমধ্যে দেখতে পাই। তাঁর কবিতাপড়া শুনেছি ক্যাসেটে, আমার মাস্টারমশাই-এর কাছে। তিনি জয় গোস্বামী। তাঁর টানেই সেদিন ছুটে গিয়েছিলাম বালি সাধারণ গ্রন্থাগারে। কিন্তু তখনও জানতাম না সেই প্রাপ্তির সঙ্গেও আমার জীবনে এক অন্য প্রাপ্তি জড়িয়ে রয়েছে। তা হল কবি মৃদুল দাশগুপ্তকে আবিষ্কার। একের পর এক কবিতা পড়ে যাচ্ছেন মৃদুলদা। মন্থর, ধীরে-ধীরে, দুলে-দুলে, মাঝে-মাঝে বলছেন, আমি কিন্তু পড়া থামিয়ে মাঝে-মাঝে সিগারেট খাব। ধরাচ্ছেনও। *জলপাইকাঠের এসরাজ, এভাবে কাঁদে না, গোপনে হিংসার কথা বলি* পেরিয়ে মৃদুল দাশগুপ্তের পড়া এসে পড়ল তাঁর সাম্প্রতিক লেখা কবিতায়। উনি বললেন, এই লেখাগুলি নতুন। শুনলাম সেই কবিতাগুলি, *নতুন কবিতা* শিরোনামে পড়ছিলেন মৃদুল দাশগুপ্ত। সেদিনের সেই অনুষ্ঠান আমার জীবনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই কারণে, আমি ওইদিন বাংলা কবিতার এক অন্যতম মহিরুহকে আবিষ্কার করেছিলাম যিনি সার্চলাইটের আলো থেকে চিরকাল দূরে থাকতেই ভালোবাসেন। এরপর থেকে তাঁর আমি চিরফলোয়ার। তখন যেখানেই তাঁর কবিতা পড়ি, *নতুন কবিতা* শিরোনামে দীর্ঘ যেন একটি কবিতাই লিখে চলেন মৃদুল। এরপরে একদিন জীবনানন্দ সভাঘরের একটি অনুষ্ঠানে প্রথম তাঁর সঙ্গে কথা বলা। সাহস করে শুধালাম : আপনার নতুন বই-এর নাম কি *নতুন কবিতা*-ই রাখবেন? মৃদু হেসে বললেন : বই করার পরিকল্পনা আছে। তবে এক্ষুনি নয়। আরও কিছুদিন পর। তবে নাম হবে *সোনার বুদ্বুদ*। তারপর থেকে অপেক্ষায় থেকেছি। বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছে সেইসব লেখা। অবশেষে শুনলাম, তাঁর নতুন কবিতাবই পেতে চলেছি ২০১০ বইমেলায়। সেই তাঁর বলা নামেই। বইমেলা পেরিয়ে সংগ্রহ করলাম বই। পড়লাম :

> মৃত যে, নিঃশ্বাস ফেলবে, লেখো বাক্য তদ্রূপ শাসনে
> লেখো তো তেমন দেখি, যেন ঝর্না নিজে স্নানরতা
> আঁকো তো দর্পণ, চিত্রী, অশ্রুধারা চরাচর... মুহূর্ত আসনে
> তাহলে মস্তকে তুলবে উন্মাদেও জনস্রোত,
> কালক্রমে হবে রূপকথা



বোধশব্দ আয়োজিত কবিতাপাঠে মৃদুল দাশগুপ্ত ও জয় গোস্বামী; বালি, ২০০৩

আস্তে-আস্তে মনে পড়ল, এই লেখাগুলির সঙ্গেই আমি এই কবিকে আপাদমস্তক পেয়েছি। তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি প্রথম এইসব কবিতা। আজ এই বইটা হাতে পাওয়ার পর যেন সেই পাওয়ার ঝুলিটা সম্পূর্ণ হল। একটি বৃত্ত পূর্ণ হল আজ। সেই বৃত্তে অদ্ভুত এক মাদকতা। এক অভূতপূর্ব উদ্যানভ্রমণ। এক গাছ থেকে অন্য গাছে, এক ডাল থেকে অন্য ডালে চলে গেছি গুণমুগ্ধ সারসের মতো। ডুবে গেছি কত বুদ্বুদের মায়ায়, তার সৌন্দর্য ও সৌকর্যে, আত্মীয় মনে হয়নি নিজেকে। মনে হয়েছে দ্রষ্টা। দেখতে-দেখতে নিজের পুনর্জন্ম হয়েছে। গর্ভে জন্ম হয়েছে। জন্মের আকার বুঝেছি। এখনও সম্পূর্ণ হয়নি সেই বুঝে ওঠা। মৃদু, কৌণিক, সংযত এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি শব্দই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ ধ্রুব কোনো প্রাচীনতার দিকে। যতই প্রাচীনতার আদিম গন্ধ আসছে, ততই আরও জীবনানুগ হয়ে উঠছে, আধুনিকতার শীর্ষ ছুঁয়ে যাচ্ছে মায়াবৃন্তগুলি, এই



শিশিরকোরকগুলি আঁতুড় হয়ে থাকুক জীবনে। মাথুর হয়ে থাকুক। সবকিছুই কি তাৎক্ষণিক হয়?

এরপর একদিন আমন্ত্রণ এল, কবিতা পড়ার। মেদিনীপুরে মহিষাদলে *লোককৃতি*-র কবিতা উৎসবে। এদিকে কবি সুজিত সরকার, আমাদের সুজিতদাও কিছু বলবেন রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে, অন্যদিকে বক্তা হিসেবে থাকছেন অমিতাভ গুপ্ত। আগ্রহ ছিল এই বিষয়টি নিয়েও। তবে এই নয়, আরও একটি ঔৎসুক্যের জায়গা ছিলেন মৃদুল দাশগুপ্ত। ওইদিন, *লোককৃতি*-র পক্ষ থেকে ওঁকে সম্মানিত করা হবে। অনুষ্ঠানে পৌঁছোলাম বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ। সঠিক সময় আর মনে নেই। কী এক কৌতূহলে এবং মৃদুলদাকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়ার অভিপ্রায়ে *সোনার বুদ্বুদ* ব্যাগস্থ করেছিলাম। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল একটি কলেজে। মৃদুলদা যে বেঞ্চে বসেছিলেন, ঠিক তার একটা বেঞ্চ ছেড়েই বসতে পেলাম। বসে-বসে ভাবছি, তাহলে বইটা কি ধরিয়ে দেব? সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ধরিয়েই দিলাম। দাদা... আমার আধোশঙ্কিত কণ্ঠে ডাক শুনে ঘুরে তাকালেন মৃদুল দাশগুপ্ত। চোখে জিজ্ঞাসা, যেন বললেন : কেন ডাকছ? আমি আর কিছু না বলে বইটা তাঁর হাতে দিলাম। উনি হাতে নিয়ে আমার দিকে হাস্যময় মুখে তাকালেন, তারপর ঝুঁকে লিখতে লাগলেন। কিন্তু একটা নাম লেখার পক্ষে সময়টা যেন একটু বেশিই লাগছে! কিছুক্ষণ পর ঘাড় ঘুরিয়ে আবার হেসে বইটা দিলেন কবি। তিনি মুখ ঘোরাতেই সঙ্গে-সঙ্গে খুললাম বই। যে পৃষ্ঠায় তাঁর অনুপম ঋজু গদ্যে ভূমিকা লেখা, সেই পাতাতেই লিখে দিয়েছেন : 'রাজদীপ বইটি পড়ে আমাকে কিছু জানাবেন?' নীচে 'শুভেচ্ছাসহ মৃদুল দাশগুপ্ত'। দিনটিও মনে আছে— '২৮.০৩.২০১০'। আমি আর কী বলব, তখন আমি শিহরিত, খানিক লজ্জিতও। প্রথমত 'আপনি' সম্বোধন, দ্বিতীয়ত কবি মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর কবিতাবই পড়ে আমায় জানাতে বলছেন! এ-ও কি সম্ভব! কুঁকড়ে গেলাম ভীষণ। তেমনি আরও অনেকের স্বাক্ষরের থেকে বিশেষ হয়ে রইল এই স্বাক্ষর। যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কবি মৃদুল দাশগুপ্তকে পাওয়ার আনন্দ। তুমুল বৃষ্টিতে যখন চেনের ফাঁক দিয়ে ব্যাগে জল ঢুকে ব্যাককভার ভিজিয়ে দিয়েছে, তখন মর্মাহত হয়েছি ভীষণ। আবার ভূমিকার পাতাটি খুলে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে, যখন দেখেছি, শিখেছি, কীভাবে একজন বড়ো কবি তাঁর সামান্য এক পাঠককেও এত গুরুত্ব দেন, যত্নে আগলে রাখেন।

কাহিনিকার্টুন



মাতাল হইতে সাবধান

প্রথম মদ্যপান। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। তখন কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ। ঢক-ঢক করে এক গ্লাস। তারপর নেশা কাটাতে, গন্ধ তাড়াতে মাইলের পর মাইল হাঁটা। হঠাৎ গলি থেকে ছুটে আসা কিশোরী আটকাল পথ। আর্তস্বরে কাতর আবেদন, 'আমাকে বাঁচান, প্লিজ। একটা মাতাল তাড়া করেছে।'

প্রবন্ধ

অনভিজাতদের জন্য অপেরা

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

সৌন্দর্য হবে ভক্ষ্য, অথবা কিছুই নয়।

— আঁদ্রে ব্রেতঁ

আধুনিকতার পরিমাপ নিতে গিয়ে দেখি যে 'স্তব্ধ রাত্রে তুমি কেন বাইরে যাও' — সমর সেনের এই বাক্যটি মোটেই অরাজনৈতিক নয়। বরং চল্লিশ দশকের কবিতার সাধারণ জলবায়ুতে এই আপাত সরলতা একটি ছলনা। এই সূত্রটি ধরে যদি এগোই, তবে দেখব যে সত্তর দশকের কাব্যচর্চায় আপাত সরলতা একটি রাজনৈতিক রণকৌশল। তা, অনেক সময়, রান্নাঘর বা অভ্যন্তরীণ গৃহস্থালির কথা বলতে-বলতে সীমানা পার হয়ে যায়। আসলে রাজনৈতিক অবদমন এইরকম সাংস্কৃতিক চিহ্নায়নকে অবধারিত করে তুলেছিল। আপাতত যার কথা বলছি, সেই মৃদুল দাশগুপ্ত প্রায় গত তিরিশ বছর ধরে কবিতার জন্য এই পাসওয়ার্ডটুকু উপহার দিয়ে যাচ্ছেন পাঠকদের।

আমাদের এই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার মূল সমস্যা এই যে এখনও এখানে সৌন্দর্যের পতাকাতলে কবিরা মিলিত হতে চান। কবিতা, আমাদের পক্ষে, এখনও মদিরেক্ষণা। কবিতা প্রধানত দ্রৌপদীর শাড়ি — এরকম বিশ্বাস থেকে কবি ও তার পাঠক উভয়েই জীবনের সফলতা রোমহর্ষে উপভোগ করেন। আর তাই কাব্যের খুব সরল উচ্চারণকেও সঙ্কেতপল্লীর নীল নকশা হিসেবে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়।

প্রথমেই বলি, সমালোচনার সংসদীয় নিরপেক্ষতায় আমার আস্থা নেই। মৃদুল দাশগুপ্ত যে সময়ের ভাষাকর্মী সে সময়ের গন্ধ আমার জামায়, আমার শরীরে। সুতরাং তার কবিতা বিষয়ে আমার ছোটো এই প্রতিবেদন পক্ষপাতযুক্ত একটি প্রস্তাব। মৃদুল গোপনে হিংসার কথা বলে, সুতরাং প্রকাশ্যে তাকে সমর্থন করার দায় আমাকে নিতে হয়।

কিন্তু মৃদুল কি খুব গোপন আততায়ীর মতো এসেছিল আমাদের কবিতায়? বরং তার প্রথম বই *জলপাইকাঠের এসরাজ* পড়ে আমার মনে হয়, বালক অরণ্য রহস্যে একবারেই অভিমানী — সে বয়ঃসন্ধিকাল। সমগ্র সত্তর দশক ধরে আমরা দেখেছি খবরের কাগজের নিসর্গ ও রূপোপজীবিনীর সিঁদুর। সমগ্র দশক জুড়ে এমন যন্ত্রণা নেই যা তোমার নির্যাতিত লালের তুলনা। রাষ্ট্রপুঞ্জে চাঁদ ওঠে; যন্ত্রগণক ও সাঁজোয়া গাড়ির সামান্য তটরেখা, শর্বরী ও সমুদ্রের কৃষ্ণনীল ঘুম সরিয়ে দিয়ে মৃদুল যেখান থেকে নিজেকে শনাক্ত করে তা ঐতিহ্যস্বীকৃত কবিতাভবন। সেখানে থরথর প্রণয়াঞ্জলি। সেখানে আহত ওষ্ঠাধর যা বিশ্বাস করে হৃদয় ও সমাজের বিরোধ যদি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে তবে কবিতাই একমাত্র সম্ভাব্য উচ্চারণ; কবিতাই পরিত্রাণ। চর্যাপদ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত অনেক কবিতাই এরকম পৌত্তলিক আবেগ নিয়ে লেখা। কিন্তু বইটির অন্তত একটি লাইনে এক অমোঘ গোপনীয়তা আছে যা চোখে পড়া মাত্রই আমাদের সহর্ষ অভিবাদন দাবি করে :

আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি

বিবসনা নির্লজ্জ। এই রূপসীই তবে আদি প্রতিমা; কাব্য। ফরাসী চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ একদা যেমন তথ্য ও আখ্যানের মধ্যে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়েছিল, মৃদুল তেমনভাবেই শব্দের উন্মুক্ত শরীর দেখলেন। এই শব্দরাজি, এই বিবৃতি সবচেয়ে প্রকাশ্য এবং সেইজন্যই সবচেয়ে সাংস্কৃতিক। এই ভাষা প্রতীক ও রূপকের পরপারবর্তী। এ ভাষার কোনো ভান নেই; কোনো আশ্রয় বা প্রত্যাশা কিছুই নেই। মনসামঙ্গল থেকে দূরদর্শন — কবিতা অনেকভাবে প্রচারিত হল। কাব্য অনাদি — বাংলা ভাষার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত, সংহত ও সূচিমুখ বাক্যটির পিতৃত্ব বরণ করে নিয়েছিলেন আরেকজন কবি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। মৃদুল আমাদের সময়ের একজন কবি কিন্তু মায়া কাটাল। অতঃপর সালঙ্কারা কন্যার বদলে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে হাড়ের স্থাপত্য, একসময় ইংরেজি ভাষায় কবি লরেন্স অনুরূপ 'বিবৃতির পাথুরে প্রত্যক্ষতা' কামনা করেছিলেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, সময় যেখানে মৃদুলকে আছড়ে ফেলেছিল সেখানে স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নভঙ্গ কিছুই ছিল না। সমাজনীতি বা ইতিহাসের ছাত্ররা বলতে পারবেন যে সত্তর দশকের শেষ থেকে আশা ফুরিয়ে গেছিল। থাকলেও এত কম যে, বিষ্ণু দে থাকলে বলতেন, কোনো নিরাশা ছিল না।

'দক্ষিণে প্রতিক্রিয়া, বামে ঋতুমাখা শালু, হেসে ওঠে ঐ গাছ যুদ্ধচুক্তিতে কিংবা শান্তির বাতাসে;' স্বীকার বা অস্বীকারের যাবতীয় প্রকল্প অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলে কবিকে বুঝতে হয় আবেগের ঘনীভবন বা নিরসনের পক্ষে কবিতা খুব উপযোগী পন্থা নয়। আমাদের পরিবেশ ও ভাষাবলয় দৃশ্য ও আখ্যানের অবিরল অবস্থানচ্যুতিকে অনায়াসে মেনে নিয়েছে। সুতরাং কবিকে অন্যরকম অশ্রুপাতের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

মৃদুল যুগপৎ উদাসীনতা ও স্বল্প ভাষণ আয়ত্ত করার চেষ্টা করলেন তাঁর দ্বিতীয় বই *এভাবে কাঁদে না*-তে। এই বই একজন মেরুন মানুষের প্রসাধন গ্রন্থ। বা অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, চৈত্রের প্রখর চরাচরে যখন সবকিছুই নিত্য বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতহীন, স্বচ্ছ; তখন একজন ছায়াহীন ভূতলবাসীর আত্মকথা। আমরা ছোটো এই পুস্তক-ধৃত যেকোনো লেখা উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে, মৃদুল রোজনামচার কিছু তারিখবিহীন সংকেত চিহ্ন উপহার দিয়েছেন। যা ব্যক্তিগত ছিল তা সামাজিক হয়ে উঠলে গূঢ় লোকাচারের মতো আরও ব্যক্তিগত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিস্ময়কর ও সরল সত্য এটুকুই।

মৃদুলের কবিতা না ব্যক্তিক না সামাজিক। কিন্তু ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক স্তরে যাওয়ার করিডোর বিশেষ। আর এই করিডোর থেকেই তিনি প্রত্যাঘাত হানেনও। কাব্যে প্রবর্তন করতে চান, সহিংস আধ্যাত্মিকতার রেওয়াজ। *গোপনে হিংসার কথা বলি*-র প্রথম কয়েকটি শব্দরেখই তো আমাদের নরকজয়ের দেওয়াল লেখা। আমাদের ভাষার মানচিত্র জুড়ে যে প্রতি-সাংস্কৃতিক বিকল্পের সন্ধান করছিল তথাকথিত মুক্তির দর্শক, মৃদুল সেই অভিযানে অংশ নেন। তখন থেকে মৃদুলের কবিতা স্বাধীন ও অসুন্দর। তার অশুচিপত্রে নরকের ডাকছাপ। র‍্যাবোঁ একদিন সৌন্দর্য নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নরকযাপনের পর আবার সহসা তাকে খুঁজে পান।

She's found again
What?
Eternity,
It is the sea... run away
With the sun.

মৃদুল কবি বলেই বুঝতে পারেন কথ্য বা লিখিত রূপের অতিরিক্ত কোনো ভাষারূপ থাকতে পারে। অভিজ্ঞতা প্রায়ই দৃশ্যকল্পে অনূদিত হয় না : 'আমি বুঝতে পারছি তোমার কষ্ট হচ্ছে — তাও ভাষা।' সেইজন্যেই আমার এই বন্ধু প্রায় নিশ্চিত যে, ভাষার পরাগসংযোগের জন্যই কোনো মহৎ বা গভীর বা উঁচু ভাবনার প্রয়োজন নেই।

'একটা পোস্টকার্ড পারে জীবনের মানে বদলে দিতে।' জীবনের এই মানে বদলে দেওয়ার জন্য ক্যাপিটাল বা জীবনদেবতার প্রয়োজন না-ও হতে পারে। এই-ই মৃদুলের গোপন বামপন্থা বা প্রকাশ্য প্রেমপত্র এবং অবশ্যই চূড়ান্ত ইস্তাহার। যখন স্বপ্নের পক্ষধ্বনি সায়াহ্নের বা সকালের নয়, যখন জাগরণে দৃশ্যের মহড়া, যখন কতিপয় সংখ্যা ও কয়েকটি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত করেছে দ্রব্যের মহিমা, যখন আমাদের শোওয়ার ঘর থেকে বক্তৃতা করেন রাষ্ট্রপতি, তখন মৃদুল বেছে নেন

এমন এক অবস্থানভঙ্গি যেখান থেকে সৌন্দর্যকে স্পর্শ করা যাবে। যা কিছু প্রত্যক্ষ, যা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তা, এবং একমাত্র তাকেই মৃদুল দাশগুপ্ত দাম দেবেন। কোনো অলীক রূপায়ন বা দর্শন-সংকটকে নয়। শুরুতে আমি এ জন্যই ব্রেতঁকে স্মরণ করেছিলাম যে কবি হিসেবে মৃদুল দাশগুপ্তও শূন্যতার অবতলের চাইতে শয়নপূর্ব রতিমুদ্রাকে, চাক্ষুষ বলেই অধিকতর জরুরি মনে করেন।

সন্দেহ নেই একারণেই তিনি দাঁত ও খাদ্যের মেলামেশার মধ্যে খুঁজে বেড়ান তাঁর পৃথিবী। তাঁর নন্দনবিশ্ব মূলত রান্নাঘর; তাঁর সৃজন প্রক্রিয়া আসলে এক রন্ধন প্রণালী। কিন্তু স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শময় এই পার্থিব শব্দের সংসারই যদি মৃদুলের উপজীব্য হত তবে তাকে নিয়ে আমার কথা বলার প্রয়োজন হত না তত। একটু যত্ন নিয়ে মৃদুলের লেখা পড়লে বোঝা যায় সে তার অন্যতম প্রধান সহকর্মী অনন্য রায়ের মতোই কাব্যকে দার্শনিকতায় সংরক্ত দেখতে চায়। অনন্যর মনোপ্রবণতা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মতো; সংস্কৃতি ও মনীষার নানা অধ্যায়কে জড়িয়ে ধরে তার লেখার চেহারা তৈরি হয়। অন্যদিকে মৃদুল দাশগুপ্ত ভারতীয় রাগসঙ্গীতের মতো ডিফারেনসিয়াল। সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে একটি শব্দে কিংবা কোনো পদবন্ধে। আস্তে-আস্তে সেই নিবদ্ধ দৃষ্টি পরতে-পরতে বিমূর্তায়ণের মধ্যে ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানায় — 'সেভাবে একটি দেশলাই কাঠি থেকে আমরা উইলো গাছের অরণ্যে চলে যেতে পারি। যে সিগারেট খাচ্ছি তার তামাক পাতা থেকে চলে যেতে পারি দূর তুরস্কে।'

মৃদুলের পরিপ্রেক্ষিত-ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে আমরা যখন বুঝতে পারি 'ছাদের কার্নিস ঘেঁসে ঠিক সেই নীহারিকা মেয়েটি দাঁড়াবে' আর 'স্পন্দন আমি তাতে মাত্রা এনে খিচুড়ি ফোটাই', তখন মেনে নিতে অসুবিধা হয় না উপকরণের তুচ্ছতা সত্ত্বেও মৃদুলের কণ্ঠস্বর অতিশয় গম্ভীর ও দূরান্বয়ী। আমি নিশ্চিত যে আর কয়েকবছর পরেই কালেজীয় শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো সমালোচক জীবনানন্দের থেকে ধার নিয়ে লিখবেন, মৃদুলের কাব্যেও মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো। আদিপর্বের জয় গোস্বামীও সময়ের এই চিহ্নায়নে অভ্যস্ত ছিলেন।

আমার খুব গর্ব হয় যে আমার সময়ের একজন কবি মুক্ত মানুষের পদ্য লিখতে চায় ও সেই সূত্রে বোতাম, উনুন বা রন্ধনশালা ও ডাকনাম নিয়ে মাথা ঘামায়। জঁ পল সার্ত্র লক্ষ করেছিলেন ফ্রান্সের সমগ্র সাম্যবাদী সাহিত্যে প্রকৃত কবি একমাত্র আরাগঁ, যিনি নুড়িপাথর নিয়ে লিখতে পারেন। পাঠক মৃদুলের প্রসঙ্গে এই বৈদেশিক অনুষঙ্গটুকু মনে রাখলে উপকৃত হবেন বলেই মনে হয়।

ভিলাসকেথ একটি ছবি এঁকেছিলেন — *লাস মেনিনাস* (রাজান্ত পুরচারিকাবৃন্দ)। তাতে পটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন স্বয়ং শিল্পী। মিশেল ফুকো বলতে চেয়েছেন প্রতিরূপায়ণ বিষয়ে এই চিন্তা পদ্ধতি (এপিস্তেম) সংশ্লিষ্ট যুগের চরিত্র লক্ষণ শুধু ধারণ করে না, তাকে উন্মোচনও করে। মৃদুল অন্যভাবে লেখে — (আমি কিন্তু তুলনা করছি না)।

...এমন কি যে পাচক — সেও এই পরমান্নে
মিলে মিশে যায়!

আমি দীর্ঘদিন ধরে বলতে চাইছি প্রচলিত অর্থে যাকে সত্তর দশক বলা হয় সেই পর্বে এক নতুন কবি সাধারণ সংঘ-সাহিত্যের ইতিহাসে সময়ের দান। মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা পড়ার পর এ সিদ্ধান্তে আরেকবার আত্মার শিলমোহর না লাগানোর কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না।

মৃদুল মনে করে তার ক্ষুৎকাতরতার সামান্য প্রশমন হবে সারল্যের সামান্য টোকায়। আমরা মৃদুলের কথা মতোই জানলার কাচ দিয়ে এই দেখা দেখতে শিখলাম আপাতত। দেখার রকমফের আছেই। তবে জানলার কাচ দিয়ে দেখার যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন রেনেসাঁসের দেবদূত লিওনার্দো তাতে — মানে, আমি কোয়াত্রোসেন্তো পরিপ্রেক্ষিতের কথা বলছি — প্রায় পাঁচশো বছর টিকে গেল। মৃদুল দাশগুপ্ত সেই ভরসাতেই আছে।

রূপকথার কালক্রম বা এক জাদুকরের ভ্রমণকাহিনি

গৌতম চৌধুরী

একপারে শ্রীরামপুর, অন্যপারে ব্যারাকপুর। একপারে উইলিয়ম কেরি, অন্যপারে মঙ্গল পাণ্ডে। একদিকে মিশনের ছাপাখানা হইতে ছড়াইয়া পড়িতেছে বাংলা বহির বহর, আর কলিকাতার বাবুসমাজের 'নবজাগরণ'-এর সড়ক চওড়া হইতেছে। অন্যদিকে কোম্পানির সেনাছাউনি কাঁপাইয়া ছুটিল প্রথম বেআদব টোটা, বারুদের গন্ধ ছড়াইয়া পড়িল তামাম হিন্দুস্তানের আসমানে। মাঝে ঝিম মারিয়া শীর্ণ মধ্যবিত্ত হুগলি নদী। পুণ্যলোভী মানুষ তাহাকেই নাম দিয়াছে গঙ্গা। কোম্পানি কবেই বিদায় লইয়াছে। রাখিয়া গিয়াছে ব্যারাকপুরের সেই অতিকায় সেনাছাউনি। আর শ্রীরামপুরে গুটিকয় গির্জা আর মহকুমা কাছারি।

সময় সন ১৯৬৫। যুদ্ধ বাধিয়াছে একই দেশের ভাঙিয়া যাওয়া দুই টুকরায় — ভারত-পাকিস্তানে। ব্যারাকপুর আর সীমান্ত হইতে কত দূর? আকাশপথে যশোর হইতে বড়োজোর মিনিট পনেরোর পাল্লা। দুইখানি পাকিস্তানি বোমারুবিমান সকল নজর এড়াইয়া সহসা আসিয়া পড়িয়াছে ব্যারাকপুরের সাঁজোয়া ঘাঁটির মাথায়। শ্রীরামপুরের নদীতীরবর্তী এলাকাগুলি হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তাহাদের ঘুরপাক। শুনা যাইতেছে তাহাদের গর্জন। তখন সকাল দশটাও বাজে নাই। আপিস-কাছারির উদ্দেশে ছুটিতেছেন বাবুরা। গল্প-গুজব করিতে-করিতে ইস্কুলের পথে চলিতেছে বালক-বালিকারা। সহসা তাহাদের চমকাইয়া দিয়া ভীষণ শব্দে বাজিয়া উঠিল সাইরেন। ইস্কুল-মুখো বালকেরা হাঁ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল, পাক-বিমান বোমা ফেলিবার আগেই ভারতের বিমান-সাবাড়কারী কামানের গোলা গিয়া লাগিল তাহাদের একটির পেটে। এমন সময় পিছন হইতে ভূগোল-স্যারের বাজখাঁই গলা — শুয়ে পড়, মাথা নিচু করে শিগ্‌গির উপুড় হয়ে শুয়ে পড়। মাটির উপর উপুড় হইয়া শুইয়া, বালকেরা কনুইতে ভর দিয়া দেখিতে লাগিল, গোলা খাওয়া পাক-বিমানটি জ্বলিতে-জ্বলিতে ঘুরপাক খাইয়া পড়িল গঙ্গার বুকে। তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিল, লাল-লাল পিপার মতো দেখিতে কয়েকটি বস্তু। আর একটি বিমান ফাঁক বুঝিয়া পলাইল।

শ্রীরামপুর শহরের প্রান্তবর্তী গঙ্গার তীর ধরিয়া হাঁটিতে-হাঁটিতে গত বৈশাখের এক গোধূলি সন্ধ্যায় মুগ্ধের মতো শুনিতেছিলাম পাক-ভারত যুদ্ধের এই দৃশ্য-বর্ণন। নয় বছর বয়স্ক এক বালকের স্মৃতি, বর্ণনা করিতেছিলেন ছাপান্ন বছরের এক অনতিতরুণ, যাঁহাকে বাংলা কবিতার পাঠক মাত্রেই একবাক্যে চিনেন। তিনি মৃদুল দাশগুপ্ত। গত প্রায় চার দশক ধরিয়া এইরূপ কত যে কাহিনি আর কিস্‌সা তাঁহার জবানে শুনিলাম তাহার গুনাগুনতি নাই। এতদিন ধরিয়া নানা সুখে-দুখে সহমর্মী হইয়া জীবন কাটিল, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটও তো হইয়াছে অল্পবিস্তর, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে চিত্রবিচিত্র সব অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনিবার মোহটান আজও রহিয়া গিয়াছে সেই প্রথম জীবনের মতো। তুচ্ছ-অতুচ্ছ যেকোনো ঘটনাকে শ্রুতিমোহন করিয়া পরিবেশন করিবার শিল্পে মৃদুলের রহিয়াছে এক সহজাত অধিকার। তবে কথকতার সেই মদির বিস্তারে আখ্যান অপেক্ষা রহস্যের অনুপানই বেশি।

এহেন সুকথক হওয়া সত্ত্বেও, *আমি আর পিপি* নামের একটি শীর্ণ ও অধুনালুপ্ত গল্পপুস্তিকার ব্যতিক্রমী প্রয়াস বাদ দিলে, কৈশোর-উত্তীর্ণ মৃদুল কিন্তু পা বাড়াইলেন কবিতারই নিষিদ্ধ নির্জন জগতে। এবং নিজগুণে অচিরেই সমকালীন বাংলা ভাষার একজন অবিসংবাদী কবি হইয়া উঠিলেন। এবাদে তাঁহার গুটিকয় গল্প যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পাইয়াছে কবির লেখা গল্প হিসাবেই। অবশ্য, নব্বই দশকের শুরুর দিকে *হেরফের, যথাযথ* নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসও মৃদুল লিখিতেছিলেন, তদানীন্তন *যুক্তাক্ষর* পত্রিকায়। তাহা বেশ জমিয়াও উঠিতেছিল। কিন্তু কাগজটির অকালমৃত্যুতে সে-উপন্যাস বিষয়ে অতঃপর

পাঠকেরা আর কিছু জানিতে পারেন নাই।

তথাপি, কথকতা একটি শক্তি বটে। এবং সে-সওগাত যাঁহার ধমনিতে রহিয়াছে, তিনি তাহা গুম করিবেনই বা কীভাবে, আর করিবেনই বা কেন। মৃদুলের ক্ষেত্রেও, গল্প ফলাইয়া তুলিবার উপর তাঁহার সহজ ও স্বাভাবিক হক এক গোপন রসায়নের মতো তাঁহার কবিতায় সিঁধাইয়া গেল। আজিও বাংলা কবিতার পাঠকের নিকট, অন্তত তাঁহার প্রথম জীবনের কবিতাবলির এক অদম্য আকর্ষণ, তাহাদের ভিতর চারাইয়া থাকা সেইসব কাহিনিচূর্ণগুলি। আমাদের স্বপ্নলোক ও রূঢ় বাস্তবের, রূপকথা ও সমাজ-ইতিহাসের, ব্যক্তিমন ও যৌথ অবচেতনের ভিতর নক্ষত্রধূলিকণার মতো ছড়াইয়া থাকা নানান কীর্ণ আখ্যান হইতে চয়ন করিয়া তিনি গড়িয়া তুলিলেন কবিতার এক প্রগাঢ় ছায়াপথ। অপরাধীর অকুস্থলে ভ্রমণের মতো, মাঝে-মাঝে নিজেও সেইসব কাহিনির ভিতর ঢুকিয়া পড়িতে চাহিলেন, মিশিয়া যাইতে চাহিলেন, কবির নিরঙ্কুশ স্বভাবে — 'ঢুকেছি গল্পের মধ্যে, ঢুকে পড়া চরিত্র আমার, / দাও ঘুরে বেড়াবার হাওয়া, তুমি দ্যাখাবে না আলো? / ঢুকেছি গল্পের মধ্যে, বসতে কি দেবে না চেয়ার? / বলবে না 'তুমিও মেশাও আমাকে তোমার গল্পে...' (*চতুর্দশপদী ২ / জলপাইকাঠের এসরাজ*)।

২

কাহিনির এই মায়াময় 'আবছায়া' ঘনাইয়া আছে, দেখিতে পাই, শেষ বহিটি ইস্তক, মৃদুলের সমগ্র কবিতাজীবন ব্যাপিয়াই — 'পিছনে কাহিনী ছোটে তিল থেকে তাল' (৪৫নং কবিতা / সোনার বুদ্বুদ)। কিন্তু অল্প আয়াসেই নজরে পড়ে, সেই 'কাহিনী'-র চলনপথে আখ্যানের সকল খোলস ক্রমে ঝরিয়া গিয়াছে। গোপন কস্তুরীর মতো এক অধরা রহস্যঘ্রাণ সম্মোহিত পাঠককে ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছে গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে। *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর মেঘস্পর্শী জনপ্রিয়তার কথা মনে রাখিলে ইহাকে একটি বৈপ্লবিক ঘটনাই বলিতে হয়। এই অতিশয়োক্তির মর্মশাঁস টের পাইবার জন্য আমাদের পহেলা মৃদুল দাশগুপ্তর সেই প্রথম কবিতাবইটির কিংবদন্তিকে কিছু স্পর্শ করিতে হয়।

সত্তর দশকের ইতিহাস লইয়া নানা অতিকথা রচিত হইলেও সত্তর-একাত্তর সাল বাদ দিলে, আসলে প্রথমার্ধে তাহা ছিল এক উত্তুঙ্গ শ্বেতসন্ত্রাস ও পরার্ধে মধ্যবিত্তের মানসিক স্থবিরতার পত্তনের দশক। ইহারই ভিতর ছেষট্টি হইতে একাত্তরের ভিতর বাড়িয়া উঠা একটি প্রজন্মের একাংশের অকাতর আত্ম-বলিদান তাহার সতীর্থদের ভিতর যে-ক্ষোভ-ঘৃণা-পলায়নপরতা-প্রতীক্ষা-মমতা ও অবদমিত যৌনতার জন্ম দিল, তাহারই কাব্যভাষ্য সত্তর দশকের কবিতা নামে খ্যাত। যাহার সহিত সত্তর দশকের বস্তুত কোনো সম্পর্ক নাই। আর, যে দু-একটি কবিতাপুস্তকের কাছে ওই রক্তাপ্লুত প্রজন্ম তাহার শুশ্রূষা ও আত্মচিকিৎসার নিবিড় ভাষাটি খুঁজিয়া পাইল, তাহার ভিতর জলপাইকাঠের এসরাজ (রচনাকাল ১৯৭০-৭৯, প্রকাশ ১৯৮০) প্রধানতম। মৃত্যুর-ছোবলে-নীল যে-বাড়ির সামনের রাস্তাটি সে গভীর অনুশোচনায় এড়াইয়া চলিত, সে-বাড়ির মৃত সখার মায়ের উদ্দেশে বিড়বিড় করিয়া বলিবার জন্য সে যেন খুঁজিয়া পাইল এক অশ্রুরুদ্ধ সান্ত্বনার ভাষা —

আছি বাতাসের মতো, ও আমার মিষ্টি মা-মণি
আছি তোমার দুচোখে আজও কঠিন শীতল
মানো না যে মরে গেছি, বোকা মেয়ে, এখনও মানোনি
তাই জেগে বসে থাকো, ভাবো এলো পলাশের দল

কোনো শহীদের মা-কে / জলপাইকাঠের এসরাজ

সে যেন খুঁজিয়া পাইল, ব্যর্থ অভ্যুত্থানের শামাদানটি প্রতীক্ষার অবচেতনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার এক রূপকথা-রঙিন ভাষা —

পাতার ওপর শব্দ পায়ের
হারিয়ে যাওয়া সেই যে ভাইয়ের
একটি মশাল ঘুরতে ঘুরতে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সহস্রকে
চৈত্র আসে রক্তদ্রোণের, পলাশ শিমুল আর অশোকের।

এল্ পার্টিডো কমিউনিস্তা / জলপাইকাঠের এসরাজ

সে যেন খুঁজিয়া পাইল, সময়ের চূড়ায় সওয়ার হইয়া দূরাগত কোনো ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করিয়া লইবার এক স্বপ্নারোহী ভাষা —

ধরো, সেদিনও এমনই রাত, জালিয়ানওয়ালাবাগে
ডায়ারের বন্দুক নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে
দ্রোণাচার্য ঘোষ!
ভাবো, ভাবো সেদিনের উৎসব! বরানগরের গঙ্গার জল থেকে
আবার এসেছে উঠে
তিনশো তরুণ

আগামী / জলপাইকাঠের এসরাজ

এবং তাঁহার তারুণ্যদীপ্ত সেই প্রেমের কবিতাগুলি, যাহা হইতে পরবর্তী পুরুষপ্রজন্ম বাছিয়া লইল তাহাদের বিবাহপ্রস্তাবের বয়ান —

বাড়িটি থাকবে নদীর কিনারে, চৌকো,
থাকবে শ্যাওলা রাঙানো একটি নৌকো,
ফিরে এসে খুব আলতো ডাকবো, বউ কই...
রাজি?

বিবাহপ্রস্তাব / জলপাইকাঠের এসরাজ

অথচ সাফল্যের এই বৃত্তীয় নির্মাণ স্বয়ং কবিকে খুশি রাখিতে পারিল না। বা, খুশি-অখুশি নিরপেক্ষ এক অন্তর্গত প্রেরণার চাপে, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *এভাবে কাঁদে না*-এ (রচনাকাল ১৯৮১-৮২, প্রকাশ ১৯৮৬) পঁহুছিতেই কাব্যশরীর হইতে আখ্যানের সমস্ত চিহ্ন যেন সহসাই ঝরিয়া গেল। কোনো এক মহা-আখ্যানের অপমৃত্যুর অভিঘাতেই হয়তো বা আসিয়া ছায়া ফেলিল কায়বাক্যে, মনোবাক্যে —

শস্য, মেঘ, জলাধার বহুবার এসব ভেবেছি

নৌকো থেকে নেমে এসে হাত রেখেছিলে

মাংসাশী যা করে তা মেঘ জল নক্ষত্র মানে না

তাছাড়া গল্পের শেষে নৌকাডুবি এক্ষেত্রে ঘটেনি

দুপুর / এভাবে কাঁদে না

পড়িলে মনে হয়, প্রতিটি পঙ্ক্তির মাঝের ফাঁকগুলি যেন ছাড়িয়া রাখা হইয়াছে পাঠকের নিজস্ব অন্তর্পাঠ রচনার পরিসর গড়িয়া দিবার উদ্দেশে। আখ্যানের যে-মেদুর পদচিহ্নগুলি উহাদের মাঝে ছিল, কোনো এক নির্মোহ নিষ্ঠুরতায় যেন ঘষিয়া-ঘষিয়া সেগুলি মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। গল্প আছে, কিন্তু গল্পের শেষে আখ্যানসম্ভব নৌকাডুবি আর নাই। *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর আঁচড়হীন সাফল্যের পর এই ঝুঁকিপূর্ণ মোচড়কে কি বৈপ্লবিক বলিতে পারি না? অনুরূপ মন্তব্যের সমর্থনে, প্রিয় পাঠিকা-পাঠকের জন্য এই পর্যায়ের আরও একটি কবিতা উদ্ধার করিবার খায়েস প্রশমিত করিতে পারিলাম না —

প্রাণের লোহার কথা ভাবো দিন ফুরোতে না দিয়ে প্রাণপণে

এসেছে সহস্র হাতে নক্ষত্রের রশ্মিগুলি তোমাকে জানায় কাচ ফুঁড়ে

অকাতরে দিয়ে যাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় খালিপায়ে আসোনি এখনও

যুদ্ধ ও চুক্তিতে বাঁচে কিছুতে বাঁচে না ওরা নিশান নির্মাতা আমি
তোমাকে হৃদয়

জননী / এভাবে কাঁদে না

৩

এভাবে কাঁদে না-র পর্বটি সম্ভবত মৃদুল দাশগুপ্তর কবিতাজীবনে সর্বোচ্চ ফসলের ঋতু। মাত্রই একবছর সময়কালে যেন এক ঘোরের ভিতর এই কবিতাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন কবি। তাহার ভিতরেও একটি আবছা বিভাজন রহিয়াছে। একাশির শেষদিক হইতে কবিতাগুলি আরও বদলাইয়াছে, সংখ্যাতেও প্রভূত। একটি কবিতার (*আত্মপরিচয়*) বয়ানে কালপর্বটির উল্লেখ আছে (...আজ শেষ ১৯৮১) বলিয়াই, আমরা টের পাই শীতকালের ওই তিন মাসে (ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ অবধি) রচিত কবিতার চরণগুলি আগের চেয়ে বিস্তার পাইয়াছে। কবিতাও আর চার পঙ্‌ক্তিতে সীমায়িত থাকে নাই, ক্রমে বহুদূর দীর্ঘ হইয়াছে। কিন্তু এহ বাহ্য। আত্মসান্ত্বনার এক জটিল প্রক্রিয়ায় সংলিপ্ত থাকিতে-থাকিতে তিনি জীবন সম্পর্কে এই বুঝে পৌঁছান, যে, —

সে লুকোনো। না খুলি না তথ্যের চেয়েও সে তো
আরও স্বাভাবিক সত্যি, বন্ধুদের কাছে ভাঙি
না খুলেই নানাভাবে তাকে।

জীবন / এভাবে কাঁদে না

যে-জীবন লুকানো, তথ্যের আড়ালগুলি না-খুলিয়া তাহার স্বাভাবিক সত্যকে নানাভাবে ভাঙিয়া বলিতে গেলে তৈয়ার হয় এক কল্পমর্মর ভাষা। নানান সংকেত ও ইশারার তড়িৎপ্রবাহে সতীর্থ পাঠকেরা কবির সেই বয়ানে কেবলই মুগ্ধ বিস্ময়ে আলোড়িত হইতে থাকেন —

কে গেঁথেছো হারপুন? না মনে রেখেই বলি — আমি নিজে।
বন্ধুরা লুকিয়ে এসো আজকে যা জানো
বাঁচি বলে ব'লে যাই, একদিন ভাসবো না ভাসাবো না এই ভাষা
পড়ে নিতে নাম নাও টুকে

তিমি / এভাবে কাঁদে না

বলা যায়, মৃদুলের আগামী কাব্যভাষার মৌল কাঠামো এই রহস্যময়তার মেঘবিদ্যুতে গাঁথা হইয়া গেল, কিছুদিন পর যেমন নিজেই তিনি বলিবেন — 'আমি যে বাতাস দিয়ে বাড়ি তৈরি করি!' অতঃপর তাঁহার সব কাহিনিই 'গোপন কাহিনী'। আর তিনি প্রকাশ্যে বলিবেন না, যে, 'তাপসীকে তার কবি দিলেন অস্ত্র', বা 'ছড়িয়েছি, মৃদুল এই মীনরাশি ভয়ংকর জলে...', বা 'আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি,' বা 'পথ টেনেছে ভূচুম্বকে, এল্ পার্টিডো কমিউনিস্তা', বা 'সীমান্তে আমার ঠাকুমাকে বুটের লাথি মেরে / আমাদের থালা বাসন পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো', ইত্যাদি। ক্রমে, ঘৃণা বা প্রণয়, আসক্তি বা হিংসা, সব কিসিমের কথাই বলিতে হইবে গোপন কায়দায়। আজ সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহার এন্তেজারি —

পথ জ্বেলে দেওয়া ক্ষত দেখে কাঁদে যে ছেলে একাই, যদি তাকে
কাঁধে নাও, তবে হাত খালি ব'লে যাত্রীদলে মিশে যাবো
মাথায় পালক পাতা, হাতে বুনো মহিষের শিঙা

আলো / এভাবে কাঁদে না

পথচারীদের ভিড়ের ভিতর *স্বেচ্ছাগায়েব* হইয়া যাওয়া কবির হাতের সেই 'বুনো মহিষের শিঙা' অতঃপর বাজিয়া উঠিল *গোপনে হিংসার কথা বলি*-র কবিতাসমূহে (রচনাকালে ১৯৮২-৮৮, প্রকাশ ১৯৮৮), যেখানে 'শ্বাসপ্রশ্বাসও ভাষা, গুপ্ত যোগাযোগের'। 'তার ভাষা নিচু আগুনের... না বলা কথার বিষে ভেজা'। যেন টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া কবি তাঁহার নিজস্ব এক মোর্স সংকেতে প্রাণের গহন বার্তাগুলি পাঠাইয়া দিতেছেন দূর-দূর দেশে —

অবাক পুকুর। তুমি জল ভরো। আমি
মন ধুই।
দেহে দেহে ভাগ। চোখে চোখে মাখি
ভস্ম।

দেহতত্ত্ব / গোপনে হিংসার কথা বলি

জলের ভিতর গড়াইয়া দেওয়া রঙিন পটাশের মতো, কবিতার উচ্চারণ এখানে অবলীলায় উচ্চারিতের ভিতর মিশিয়া যায়, তাহার চরিত্রবর্ণে লীন হইয়া যায়। অর্থাৎ এই 'নিচু যোগাযোগ'-এর ভাষার আড়ালটিও ভাষায় প্রকাশিতের অংশ হইয়া উঠে। কবি নিজেও থাকিয়া-থাকিয়া সাঁকোর তলায় পুঁতিয়া রাখা সেই 'গোপন গহনা'-র বিষয়ে তাঁহার মায়াভরা সচেতনতাটি আমাদের টের পাওয়ান —

১. ভাঙা অক্ষর, হরফের খাঁজে / আঁশ (*আমার কবিতার বই / গোপনে হিংসার কথা বলি*)

২. অন্ধের স্বপ্নের স্ফূর্তি মেলে ধরা আমার দায়িত্ব (*অন্ন* / ওই)

৩. তোমার দায়িত্ব শুধু আমাকে অচেনা ভাবা / দেশান্তরে, ভিন্ন ভাষায় (*স্পর্শ* / ওই)

৪. তর্জমার অতীত সেই বৃষ্টিভেজা চিঠি (*যোগাযোগ* / ওই)

৫. অন্ধকে শোনাই গান, / বধিরের জন্য আলো, ক্ষুধার্তের হাতে অস্ত্র দিই। হাওয়া দিই গোপনীয়তায় (*আঁচ* / ওই)

৬. এখন দর্পণে তুমি কথা বলো নিরর্থক বিদেশি ভাষায় (*ক্ষুধা* / ওই)

৭. অপেক্ষার অনির্দেশ তারাভাষা দিগন্তে আমার (*বনভোজন* / ওই)

৮. আমি ধুলো হয়ে / ফোয়ারার উপভাষা খুলে দিচ্ছি খাদে (*সংঘ* / ওই)

অধিকন্তু, ফোয়ারার সেই উপভাষায় *গোপনে হিংসার কথা বলি*-র ভিতর বাংলা কবিতায় একটি নতুন পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়, যাহার শিরোনাম *রান্নাঘর*। যে-অদম্য প্রেরণার বিস্তার ছড়াইয়া পড়ে *আরও রান্নাঘর*-এর নতুন কবিতাগুচ্ছে, এক দশক ছাপাইয়া অন্য এক দশকের দিকে, এক বহি ছাপাইয়া আরও এক নতুন বহিতে। বিশ শতকে রচিত ও প্রকাশিত মৃদুলের সেই শেষ পুস্তকটি হইল, *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* (রচনাকাল ১৯৮৮-৯৭, প্রকাশ ১৯৮৮)।

৪

দীর্ঘ সময় জুড়িয়া উৎসারিত হওয়া সত্ত্বেও, এক গূঢ় অন্তর্বয়নের নিবিষ্টতা *রান্নাঘর* পর্যায়ের কবিতাগুলিকে ঘিরিয়া এমন এক নিজস্ব বলয়প্রভার সৃষ্টি করিয়াছে, যে, বিগত শতকের অন্তিম কার্নিসে বাংলা কবিতার যে-পাঠকপ্রজন্মের কাব্যরুচির স্ফুরণ, তাঁহাদের কাছে মৃদুল দাশগুপ্ত বুঝিবা বহুদূর পর্যন্ত *রান্নাঘর*-এরই কবি। কিন্তু, একটি বেলুনের ত্বকে ফুঁ দিতে থাকিলে ক্রমে তাহা যেমন একটি পূর্বনির্ধারিত আকার লইতে থাকে, এবং অবশেষে একটি বেলন বা গোলক বা অন্য কিছু হইয়া যায়, কবিতার ভাবের বিস্তার তো ঠিক সেরূপ কোনো লাগসই ব্যাপার নহে। সে-উৎসার কিছুটা বা হয়তো জমাট এক বিস্ফোরণকেন্দ্র হইতে উচ্ছৃত শতধা আলোকছটার মতো। রান্নাঘরের ধারণাটিও সেইরূপ, একটি বিস্তীর্ণ কালপর্ব জুড়িয়া তাহা কবির মনে ঘাঁটি গাড়িয়া থাকিলেও, কোনো সরলরৈখিক বিস্তারের অবকাশ তাহার নাই। কল্পনার অনেকগুলি মাত্রা কখনো বিচ্ছিন্নভাবে, কখনো অংশত একত্রে, জট পাকাইয়া আছে তাহার ভিতর। নিখিল জীবনপ্রবাহের উত্থান-পতনের ঘূর্ণাবর্ত, নরনারীর শরীরী অন্বয়ের পর্বপরিচ্ছেদ, কবির একান্ত যৌনজীবনের নাটকীয়তা ও সৃষ্টিশীলতার সংকট ও আনন্দজটিল বিহ্বলতা, এই সবকিছুই মিশিয়া আছে রান্নাঘরের চিত্রকল্পটির বহুস্তর ভাঁজে।

কবিতার আস্বাদনে কবির নিজস্ব সাক্ষ্য নিরঙ্কুশ মান্যতায় গ্রাহ্য না হইলেও, তাহা আমাদের গম্যিতে কিছু নতুন কৌতূহল পয়দা করিতে পারে। এইভাবেই আমরা একবার দেখিয়া লইতে পারি, একদা এক সাক্ষাৎকারে *রান্নাঘর*-পর্যায়ের শুরুয়াত লইয়া মৃদুল নিজে কী বলিয়াছিলেন —

সাংবাদিকতার কাজে আমাকে নানা জায়গায় যেতে হয়। একবার বাংলাদেশ ও ভারতের বর্ডারের কাছাকাছি একটা জায়গা হঠাৎ লক্ষ করলাম, ফুটপাতে থাকে

যে পরিবারগুলো, তারা তিনদিকে তিনটি ইট দিয়ে চুলা বানিয়ে রান্না করছে। আমার মনে হলো, চুলোর এই মুখটাই পরিবারের প্রতীক। সারা পৃথিবী একটা রান্নাঘরের মতো। আমি যেন পৃথিবীটাকে একটা ক্ষুদ্র চুলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয়, সারা পৃথিবীই একটা রন্ধনশালা। 'রান্নাঘর সিরিজে'র কবিতাগুলোর উৎপত্তি ওখান থেকেই।

কালের কণ্ঠ, ঢাকা, ২১ কার্তিক ১৪১৭

এবং দেখিতে পাই, কবির দেওয়া এইসব তথ্য আমাদের সাহায্যই করে, যখন আমরা পড়ি — 'খিচুড়ি আশ্চর্য খাদ্য। এমন কি যে পাচক — সেও এই পরমান্নে / মিলে মিশে যায়' (*ঘ্রাণ* / *গোপনে হিংসার কথা বলি*)। 'সূর্য ও আগামীকাল সমার্থক। সেই সূত্রে / আমি এই সৌরপৃথিবীর ডাল ভাত ফুটিয়ে দিচ্ছি — / পথশ্রম শেষে আর কোনো পান্থ উপোসী থাকবে না' (*অন্ন* / ওই)। 'শুরু হোক উনুনের তুমুল হাঙ্গামা, ধোঁয়া ধুলো সরিয়ে সরিয়ে / দুপায়ের ফাঁক দিয়ে দেখেছি শোবার ঘর / বিছানায় উপমহাদেশ' (*তুক* / ওই)। 'সম্প্রদায় ধর্মভীরু, বংশে বংশে সতীদাহ, তারই মধ্যে / আমি এই তৃতীয় বিশ্বের কোণে হাঁড়ি বসিয়েছি' (*মশলা* / ওই)। 'হিংসা ও প্রতিহিংসা — এই দুইয়ে / মহাবিশ্ব রুটি ও মাংসের' (*পঙ্‌ক্তিভোজ* / ওই)।

আবার শিককাবাব, নৈশ উনুন, উনুনের অবতলে ক্ষতস্থান, রুটি ফুলানোর তুক, দেহকেন্দ্রে জাগা রান্নাঘর, মাংস রান্না, হাঁড়ি, চামচে নাড়িয়াচাড়িয়া দেখা, কৌশলে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করা, রসুনের এক লক্ষ কোয়া দিয়া লজ্জা ঢাকা, গোপন ঘাসের নিচে জল, ছিদ্র পাইয়া লোহারও তরল হইয়া যাওয়া, পর্বতঢাল, খাদের গভীর, গর্তে ঢোকা মোম, খাদ্যের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা, মুখ ধুইবার জলে ভাজা মাছের লাফ দেওয়া, পাটাতন কৌশলে সরাইয়া অন্ধকার জলে গিয়া পড়া, তিরতিরে কালোজলে ভূতের ডিঙির চলা, বেহুলার বাঁক, ক্ষতস্থান চিনিয়া সূচে সুতা ভরা — এইসব ছবির বঙ্কিম যৌনতাও পাঠকের কাছে কিছু অধরা থাকে না। বস্তুত মানবজীবনের এই দুইটিই তো প্রধান দিক, দুইপ্রকার খাদ্যের পাকপরিচর্যা। মানবিক সকল 'কাহিনীর তলদেশে জাগে রান্নাঘর'।

কিন্তু কাহিনি মাত্র এত দ্বিমাত্রিক নহে। মানুষী প্রয়োজনের পরেও থাকে কত না মায়াবী আয়োজন — 'মহামানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ে রান্নাঘরে, একটু কাঠের জন্য / মহাকাশে জঙ্গল বানাই' (*সংসার* / *গোপনে হিংসার কথা বলি*)। একই উচ্চারণের বিস্তারে রন্ধনপ্রণালীর সহিত কীভাবে যেন মিশিয়া যায় কবিরও আত্মবিস্তার —

আমি কবি, দিগন্ত প্রহরী। একদিন নিঃশ্বাস থামাবো, কিন্তু
ভ্রমণ থামবে না।
যাবো নুন ঝরিয়ে ঝরিয়ে... চতুর্দিকে মূর্তিলোভী, বণিক, বিপ্লবী

ওই / ওই

বা —

লবণের মধ্যে থেকে আমরা নিজেরা মিশি সমস্ত রান্নায়।

তোমার বয়স কতো মনে নেই। অর্ধেক রয়েছে চিহ্ন
অবিভক্ত বাংলা ভাষায়

আয়নায় অভিপ্রায়ে / *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*

বা —

অশ্রুচিহ্ন পুস্তিকায়, এই তবে মুখশ্রী তোমার;
আরও পৃষ্ঠা মেলে ধরি, অট্টহাসি ব্যর্থ পাচকের।

মুখশ্রী তোমার / ওই

বা —

মাথায় উনুন নিয়ে পৃথিবীতে বৈপ্লবিক পুস্তিকা ছড়াই...

আশা করি চন্দ্রোদয় / ওই

বা —

তাই বাক্য, গুপ্তবিদ্যা। পুস্তিকার প্রয়োজন সেইহেতু তোমাকে
বোঝাতে;

এই বাক্য, গুপ্তবিদ্যা / ওই

বা —

যেন ভাষা ধানক্ষেত, তবু বলো
আরও কী সামগ্রী চাই স্ত্রীলোক তোমার?

সূর্যাস্তের পর অন্ধ / ওই

বা —

শকটে নিদ্রিতা এক পুস্তিকার অপরূপ দেহস্পর্শ ক'রে
মৃদু তাপ টের পাই, বোধ করি সন্ধ্যা এই কিশোরীর একান্ত প্রচ্ছদ

পুস্তিকা / ওই

বা —

আমার নিকটে এসো, খোলো বই, পড়ো তো এবার দেখি
আখ্যানের দুই প্রান্ত থেকে।

গ্রন্থের সমান ভাবি / ওই

কবির পরামর্শ মোতাবেক এই মহা-আখ্যানকে দুই প্রান্ত হইতে পড়িবার কোশেশ নিয়া দেখি, শারীরিক অস্তিত্বের প্রগাঢ় আলিঙ্গনে জীবনকে জড়াইয়া থাকিতে থাকিতেও, কখন যেন তিনি সেই আখ্যান হইতে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নিয়াছেন। যেন তিনি নিজেই সেই দৃশ্যের দ্রষ্টা, সেই গ্রন্থের পাঠক একজন। দেখি, নিজেরই উদ্দেশে তিনি অস্ফুটে বলিতেছেন —

ক্ষতচিহ্ন স্মরণের, নিজেকে জিজ্ঞাসাবাদে নিদ্রা আসে নিদ্রা যায়
শয়ান গ্রন্থের প্রায় লাগে।
তাতে বহু দাগ-দেওয়া। তুমি পড়েছিলে কিছু?...

হলুদ পাতার নিচে / ওই

দেখি, সেই গ্রন্থ রচনার নানান আপৎকালীন উদ্বিগ্ন মুহূর্তে, অপরূপ নৈর্ব্যক্তিক মমতায় নিজেকেই তিনি আপন ভাইবন্ধুর মতো শুশ্রূষা জুগাইতেছেন —

নিজেকেও ভ্রাতৃস্নেহে যেন অশ্রু মুছিয়েছি বার বার
গণিতের ভ্রমে।
কতো না চিন্তার সঙ্গে সম্পর্ক দেখেছি তার, দুর্ঘটনাস্থলে
আহত ব্যথিত মুখ অশনাক্ত দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

নিজেকেও ভ্রাতৃস্নেহে / ওই

বা —

উদ্বেগে দর্পণে দেখে নিজেকে বান্ধবজ্ঞানে পরামর্শ ক'রে
অন্যত্র যাবার আগে যেন করস্পর্শ করি, আলিঙ্গনও ভাবি।
...
যখন আপৎকালে দিগন্ত অস্থির লাগে, অভিন্ন-হৃদয়ে —
তোমার পুস্তকে সখা, আমার করুণ রক্ত চলাচল করে।

নিজেকে বান্ধবজ্ঞানে / ওই

পাঠক হিসাবে আমরাও যেন এইসব মহামুহূর্তগুলির আশেপাশে ছায়াশরীরে গিয়া হাজির হই। এবং ফলত, কবির প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে সামান্য পুণ্য অর্জন করি।

৫

তাঁহার চব্বিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসব উপলক্ষে গীত হইবার জন্য তেইশটি গান রচনা করেন। তাহার ভিতর একটি হইল —

তব প্রেম সুধারসে মেতেছি,
ডুবেছে মন ডুবেছে।
কোথা কে আছে নাহি জানি
তোমার মাধুরীপানে মেতেছি, ডুবেছে মন মেতেছে।

(প্রকাশ ফাল্গুন-চৈত্র ১২৯২)

যেকোনো বিবেচনাতেই হউক, গানটি নিজ জীবদ্দশায় ঠাকুর *গীতবিতান*-এ সংকলিত করিয়া যান নাই। তাই মাঘোৎসবে গীত হইলেও ইহা পূজা-পর্যায়ে ঠাঁই পায় নাই। যাহা হউক, এই গান, কোন পর্যায়ে সংকলিত, তাহা আপাতত কোনো বড়ো সালিশির বিষয় নয়। বরং, কৌতূহলের সহিত আমরা যাহা লক্ষ করি, প্রেমের তীব্রতম পর্যায়ে তাহা যে এক প্রকার সর্বগ্রাসী পানীয়ে পর্যবসিত হয়, এমন এক অনুভবের অমলিন প্রকাশ ঘটিয়া গিয়াছে এই গানে। প্রেম এক 'সুধারস', প্রেমাস্পদের 'মাধুরীপানে' মত্ত হৃদয়ের ডুবিবার দশা।

সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ-এর কবিতার ভিতর দিয়া চলিতে-চলিতে, তাহার একেবারে অন্তিম পর্বে আসিয়া আমরা সহসা দেখি, মৃদুল দাশগুপ্তও কহিতেছেন যে, যে-হ্রদে তিনি গড়াইয়া পড়িয়াছেন, তাহার 'জল স্বয়ং মদিরা'। এবং এই আবিষ্কারে উৎফুল্ল তিনি ঘোষণা দিতেছেন — 'এখন প্রস্তাব করি, পান করো বন্ধুরা সকলে'। এবং পরবর্তী আর একটি কবিতায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন —

যেন সে জন্মেছে সুরা, বিন্দু বিন্দু ভিন্নতর রূপে।
অপেক্ষা করেছে যেন বর্ণ পেতে, আমিও দেখেছি
সে জীবিত, অপরূপা, ঘুরে ফিরে নিকটে এসেছে।

সুরা / *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*

আরও বলেন —

একা যে কৌশলে রাখি মনে সুরা, মস্তকে তোমাকে
সৃষ্টিতে বিন্দুর প্রায়, সে বিষয়ে, বিবেচনা জানাও বিশদ।
...
দ্বিধাপ্রকৃতির
লাগোয়া টেবিলে ঢালো আরও মদ, অস্পষ্টভাষিণী

বিবেচনা জানাও বিশদ / ওই

বুঝা যায়, দীর্ঘ অভ্যাসের আলোছায়ায় রন্ধনপ্রণালীর হালহকিকত কবির সব জানাবুঝা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার চূড়ান্ত নির্যাসটুকু লইয়া তৃষ্ণামোচনের নতুন তরিকায় পা বাড়াইবার সময় হইল। এখন পুরাতন ভ্রমণের 'সুধারস' ও 'মাধুরীপান' উপজীব্য করিয়া গড়িয়া তুলা হইবে নতুন সফরনামা। তাই 'অস্পষ্টভাষিণী'-কে টেবিলে আরও মদ ঢালিয়া দিবার আহ্বান। এইভাবে, *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-এর শেষের দিকের এই দু-টি কবিতাতেই মৃদুলের পরবর্তী ও এযাবৎ প্রকাশিত শেষতম কবিতাবহি *সোনার বুদ্বুদ*-এর (রচনাকাল ১৯৯৭-২০০৯, প্রকাশকাল ২০১০) মুখপাত বাজিয়া উঠিল যেন। যেখানে আসিয়া আমরা পাইতে থাকিলাম সরাসরি এইরকম সব পঙ্‌ক্তি — 'যদি বা ঝর্নার জল সুরাপ্রায় মনে হয়, আসক্তি ঘনায়, / সেই ঝর্না কিশোরী সমান', 'ছায়া বা গুঞ্জনধ্বনি জানালার কাচে / অথবা বুদ্বুদ, সুরা, ব্যর্থতার আনাচে কানাচে', 'সুরাজ্ঞানে সেবা করি, যে তরলে মন দিই, রূপ ধরে ঈষৎ নর্তকী', 'তখন সম্মত বৃদ্ধ, মহান প্রাচীন যাঁরা, ভাগ দেন / মুঘলের, য়ুরোপের মদ', 'নির্জন পথের বাঁকে ক্ষণিক ছায়াটি তার দেখা যায় / ভাবি তা দেখালো বুঝি বিলাতের সুরা', 'আমার করুণ মন দেখোনি কি তাও সাবলীল / আরেক পানের পাত্র হাতে নেয়, যখন নর্তকী তুমি / শুরু করো নাচ', 'শুধালো বিমানবালা, কোন্ যাত্রী কী কী সুরা নেবে', 'ভলগা নদীর চেয়ে ঢের বেশি স্রোত ভদকার', ইত্যাদি।

কিন্তু তাই বলিয়া, প্রিয় পাঠিকা-পাঠক, *সোনার বুদ্বুদ*-কে কোনো মদ্যপান প্রচারণী সভার পুস্তিকা ভাবিয়া বসিবার তুচ্ছতম ফুরসতও নাই। কারণ, কবির বহুবিজ্ঞাপিত এই সুরায় তারার কুচি মিশিয়া, সাধারণ্যে তাহা অপেয় হইয়া উঠাই স্বাভাবিক — 'তাও তো তারার কুচি মিশে যায় আমার সুরায় / আমাকে কাতর দেখে কখনও ঝলক দিয়ে/রূপ ধরে পুরো' (৩৩নং কবিতা / *সোনার বুদ্বুদ*)। বস্তুত, মৃদুলের সাধনা যেন এক অরূপ হইতে অপরূপে পৌঁছাইবার, কিছুই না হইতে কিছুতে পৌঁছাইবার — '...সে ছুটিতে আসা হাওয়া বাতাসের প্রায়, তুমি তাও / অবয়ব আশা করেছিলে ভ্রমে' (১নং কবিতা / ওই)। সেই ঐন্দ্রজালিক অবয়ব রচনার রহস্যময় পরিচর্যায় সুরা এক মায়াবী অনুপান মাত্র। সে-ও যেন কোনো বস্তুগত সুরা নয়, যেন এক রহস্যেরই ছদ্মনাম। কখনো সে-রহস্য হাতছানি দেয় নারীর শরীর-মনের অমোঘ আকর্ষণে —

...আমিও তো অতি কৌতূহলে
একাকী নিকটে গেছি, হাতে ম্যাপ, ডেভির লণ্ঠন
দেখেছি মদিরা শুয়ে চাপাশ্বাসভরা ওই জলে
কখনও উপলখণ্ড হাতে নিয়ে ভেবেছি তা স্তন

১২নং কবিতা / *সোনার বুদ্বুদ*

কখনো আবার কবিতাই স্বয়ং সেই রহস্য —

হাতের নাগালে এক ভাসমান সোনার বুদ্বুদ দেখে
তুমি টোকা দিলে
খুলে গেল নুড়ি-চাপা কবেকার সে এক ফোয়ারা
...
কতো না কবিতা-কণা, গুঁড়ো গুঁড়ো, তোমার মুখের আশেপাশে

২১নং কবিতা / ওই

কাজেই *সোনার বুদ্বুদ*-এর স্বর্ণাভা শুধুই মদিরাসঞ্জাত নহে। বা, তাহা মদিরারই ছটা বটে, কিন্তু সে মদিরা প্রাণের আরক। যে-প্রাণ সৃজন-উন্মুখ। যে-প্রাণ রহস্য-পিয়াসি। রহস্যপ্রিয় মানুষ রহস্য ছাড়া বাঁচিতে পারে না। এক রহস্য উন্মোচিত হইয়া গেলে তাই তাহাকে ছুটিতে হয় আর-এক রহস্যের পিছনে। *সোনার বুদ্বুদ*-এর কবিতা যেন সেই পশ্চাদ্ধাবনের ভ্রমণকাহিনি —

বিস্ময়ে সম্ভব ভেবে বাতাসের ছায়া দেখে অভ্যাসবশত
অনুসরণের ঝোঁকে গলি তস্য গলি শেষে প্রান্তরের মাঝে
ঘুরে সে বলেছে যেন, নতমুখে, সম্মত সম্মত

৫নং কবিতা / ওই

এ যেন কবিতাকে খুঁজিয়া চলারই নানান ছুট, নানা উড়াল, নানান কাহিনি —

সোনার বুদ্বুদ আসে উড়ে উড়ে, কাছে দূরে কে বলে অস্ফুট?
কলহাস্য হতে থাকে, একাকী নিভৃত মনে আবছায়া কাহিনী ঘনায়;
অপরূপ কথা জমে,...

২নং কবিতা / ওই

এইসব 'অপরূপ কথা'-র কিছু কৌতুককর (সিন্ধুজলে বিন্দুবৎ কৌতুকে মদিরা ঢেলে ভাবে মূর্খ / সমুদ্র মাতাল), কিছু বিস্ময়ের (নিশীথ আসলে এক / অতিকায় শ্বেতবর্ণ পাখি / কাছ থেকে কালো দেখি, আমিও তো আক্ষরিক অর্থে এক হাঁস), কিছু বা সারল্যের (অযথা হাওয়ার বাঁকে টলে গিয়ে, তদুপরি প্রেরণের ভুলে / ক্ষেপণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, হয়েছি নিক্ষেপকালে বিস্ফোরিত নিজে)। আবার কাহারো-কাহারো গূঢ় সাঁট ভেদ করা আরও বুজুর্গ পাঠকের আরব্ধ। কখনো-কখনো কবি নিজেই অবশ্য আমাদের ভালোবাসিয়া কিছু-কিছু কঠিন রহস্য খোলাসা করিয়া দিয়াছেন —

বিঁধেছে ঘড়ির কাঁটা, পৃষ্ঠদেশে, এরকম হত্যাদৃশ্য ভাবি,
নিজের, অতীতকালে; বা ঘটনা এই তো সেদিন —

এক তালাবদ্ধ ঘরে, গোয়েন্দা সকল তবে
খোঁজো সেই চাবি
পেলে হবে সমাধান, যতো হোক রহস্য কঠিন

ঢং ঢং! কে না জানে সময়ের কতো ছলা কলা
তাকে কি পুরুষ ভাবো? ও-ই গোল। সে যখন নাচে
দেখোনি সোনার ঘড়ি ভালো মুখে কেমন সচলা?
খুন হও, খুন হই আমি তুমি দুনিয়ার আনাচে কানাচে

২৬নং কবিতা / ওই

ওই বহির বিভাবকবিতায় বিনয়বশত মৃদুল চাহিয়াছেন, 'লেখো তো তেমন দেখি... কালক্রমে হবে রূপকথা'। *সোনার বুদ্বুদ* পাঠ সাঙ্গ হইলে আমরা টের পাই, গ্রন্থের পর গ্রন্থে সকল কবিতা মিলাইয়া মবলগে আমাদের কালক্রমের এক রূপকথাই রচনা করিয়াছেন মৃদুল। যাহাকে, এক জাদুকরের ভ্রমণকাহিনিও বলা যাইতে পারে।

৬

এক কাহিনির বর্ণনা দিয়া বর্তমান রচনাটি শুরু করিয়াছিলাম, আর-একটি লঘু উপাখ্যান দিয়াই ইহা শেষ করি বরং। গত শতকের ষাট দশকের শেষ দিক। আমরা তখন ইস্কুলছাত্র মাত্র। বোধ হয় নাইন-টেন হইবে। একবার কোনো একটি অনুষ্ঠানে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ইস্কুলে হাজির। তিনি যে সে-অনুষ্ঠানে কী বলিয়াছিলেন কী করিয়াছিলেন, তাহা কিছুই আজ আর স্মৃতিতে নাই। আর থাকিবেই বা কী করিয়া! তখন তো গুটিকয় ইঁচড়েপক্ব সলা করিতেছিল, কীভাবে অনুষ্ঠান শেষে কবিকে জব্দ করা যায়। শেষমেশ তাঁহার কাছে ভক্তবেশেই যাওয়া হইল, আর তাহা সেই বালকেরা ছিলও। প্রথমে প্রণাম, তাহার পর অটোগ্রাফ প্রার্থনা। অতঃপর বুক ঠুকিয়া এই সওয়াল ধাবিত হইল — আপনি তো একদা লিখিয়াছিলেন, আমি কবি যত কামারের আর কুমারের, তা এখনও কি নিজেকে ওইরূপ মেহনতি মানুষের কবি বলিয়াই মনে করেন। ভাবিয়াছিলাম, কবি খুব গোস্সা করিবেন। অন্য কেহ এ-প্রশ্ন করিলে যে রাগিয়া যাইতেন না, সেকথা হলফ করিয়া বলা যায় না। কিন্তু আমাদের তখনকার বয়স দেখিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। এবং বলিলেন, কেন মনে করিব না? আজও আমি কুলি-মজুরেরই কবি।

ভাবিতেছিলাম, ওইরূপ গুটিকয় ইস্কুলবালক আজ যদি ঘটনাচক্রে শ্রীরামপুর শহরের প্রান্তবর্তী গঙ্গার তীরে আধো গোধূলিছায়ায় কবি মৃদুল দাশগুপ্তকে ঘিরিয়া প্রশ্ন ছোঁড়ে — সেই যে পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে লিখিয়াছিলেন, 'আমি বাখরগঞ্জ, গৈলাগ্রামের, আমার পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে / লিখেছিলেন মনসামঙ্গল / গরলে আমি ডরাই না হে / বিষে আমি ভয় পাই না', তা আজ নিজের কবিতা লইয়া কী বলিবার আছে আপনার? নির্ঘাত জানি, মৃদুল স্নেহভরে তাহাদের কাছে টানিয়া লইয়া প্রায় ফিসফিস করিয়া বলিবেন —

আমার কবিতাখানি ওইরূপ, সতত পতনশীল, ভেঙে পড়া ঢেউ
সিন্ধুতে ফেরায় যাকে, স্রোতে ঠেলে কখনও বা আনে বালুচরে
পড়ে থাকে, রোদে শাদা, ভয়ে হিম, দুলে ওঠে বাতাসের স্বরে
কাছিম খোলের পাশে, ভেজা ভেজা, ভাবি তা কুড়িয়ে নেবে
একদিন কাছে এসে কেউ

৩৯নং কবিতা / *সোনার বুদ্বুদ*

আমাদের জানা মতে, তাঁহার কবিতা, উত্তরপ্রজন্ম শুধু কুড়াইয়াই লয় নাই, শিরোধার্যও করিয়া লইয়াছে।

বর্ণমালার সাঁকো অভিধানের মই : গন্তব্য ভবিষ্যৎ

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

মৃদুল দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়েছিল কলেজ স্ট্রিটের এক বেগানা। নাম একটা কিছু নিশ্চয়ই ছিল তার, মানে, যাকে ভালোনাম বলে। কিন্তু কলেজকালে 'ভেটকি' নামেই তাকে চিনতুম আপামর আমরা সকলে। কুলীন কলেজের প্রায় একবিঘে মাপের চাতালে কবিতাপাঠের আসর, আমার মতো অনেকেই এসব আসরে যেত শুধু সহপাঠিনীর কারণে। আমিও গেছিলাম। তখন মঞ্চ থেকে নামছেন মুখোপাধ্যায় সুভাষ, দাশগুপ্ত মৃদুল উঠছেন মঞ্চে। কৃশকায়, মুখ দেখে বোঝা যায় বহুদিন তরুণ আছেন, ভালো করে বসার আগেই ভেটকি চেঁচিয়ে উঠল — 'রান্নাঘর, রান্নাঘর'! মৃদুল তাকালেন, যেন জানতেন এমনটা হবেই। বসলেন। আমি আর তখন কবিকে দেখছি না, দেখছি ভেটকিকে। ভেটকির চোখে শুধু চশমা ছিল না, তার আস্ত একটা চশমার দোকান ছিল, এহেন ভেটকির দূরদৃষ্টি ছিল কিনা তা নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ মতবিরোধও ছিল। মতবিরোধ মানেই, বিষয়টার মধ্যে সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই ষোলোআনা থাক বা না-থাক, দুটোই থাকার অনিবার্য সম্ভাবনা আছে। তাই ভেটকি যখন আসরে আসীন মৃদুলকে দেখেই বলল 'রান্নাঘর', শব্দটা কর্কশ মনে হলেও উপেক্ষার যোগ্য মনে হল না। যেকোনো ভোরের আগেই দূর অথবা কাছ থেকে মুরগি ডাকে, সে স্বর কর্কশ, তবু ভোরের আগে মুরগির ডাক শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলে এখনও কখনো-কখনো শোনা যায়।

ধরো একদিন গেরিলা বাহিনী গড়ে
লুণ্ঠনে যাবো প্রাসাদ বাগিচা শ্রেষ্ঠীর

ভেটকির দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে কবিতার নামটা শুনতে পাইনি। অধোচেতনে দেখি, কবিতা পৌঁছে গেছে অন্তিম পঙ্‌ক্তিতে :

তুমিও মরবে, আমাদের কথা ভুলে যাবে এই দেশটি

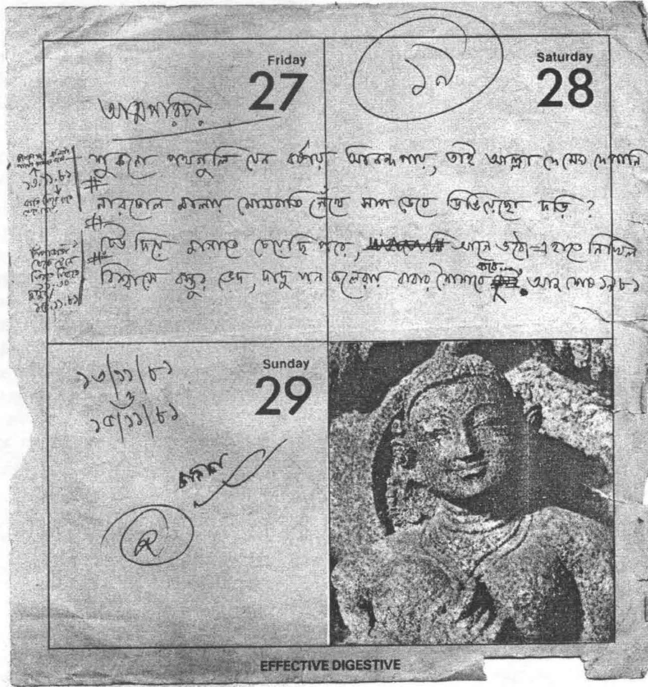
এবার অন্যত্র মনোযোগ না-দিয়ে চোখ ও কান পাতলাম কবির দিকে। মৃদুল দাশগুপ্তর স্বকণ্ঠেই, তাঁর একটিও কবিতা না-পড়ার পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়াই — প্রথম যে গোটা কবিতাটা শুনেছিলাম সেটি *আগামী*। আসর শেষে জেনেছিলাম কবিতাটা আছে *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এ।

আরও যেসব কবিতা পড়েছিলেন মৃদুল, তার প্রতিটি সম্পর্কেই কোনো না কোনো প্রতিক্রিয়া তো হয়েছিলই, সবগুলিই মিশ্র, নির্বিকল্পভাবে ভালো বা মন্দ নয়। কিন্তু একটা কবিতার কথা, অন্তত আর-একটা কবিতার কথা, আলাদাভাবে বলতে হবেই। আমার ধারণা ছিল, আগেই কবুল করেছি, মৃদুল দাশগুপ্তকে প্রথম শুনছি কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই, পূর্বপরিচয় পূর্বরাগ ছাড়াই, আর অজ্ঞতাই যেহেতু আমাকে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি দেয়, আমি বেশ নিশ্চিন্ত বিশুদ্ধ ছিলাম সেই শ্রবণে। হঠাৎ শুনলাম :

একটি মশাল ঘুরতে ঘুরতে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সহস্রকে
চৈত্র আসে রক্তদ্রোণের, পলাশ শিমুল আর অশোকের।

আরে! এটা তো জানা, মানে দেখা। কলেজেরই একটা সিঁড়ির জিরেনধাপের দেওয়ালে চমৎকার ক্যালিগ্রাফিতে লেখা আছে। বেশ পূর্ণতাই আছে বলে মনে হত ওই পঙ্‌ক্তিযুগলে, তাই, প্রতারিত মনে হল। অর্থাৎ এ-দুটি পঙ্‌ক্তির আগে আরও দশটি পঙ্‌ক্তি ছিল! কিন্তু অংশ যখন সমগ্রের ছদ্মবেশ নেয় তা বড়ো বিশ্রী মোহিনীমায়ায় অজ্ঞতার বলয়ে নির্বাসিত রাখে, ওই এক আরামদায়ক অজ্ঞতার বলয়ে। এক্ষেত্রেও তাই।

বারবার যাতায়াতে চোখস্থ, মনস্থ, মগজস্থ এবং মুখস্থ হয়ে গেছে ও-দুটি পঙ্‌ক্তি, ঠিক শীতল জানিয়া নয়, বেশ উত্তপ্ত বলেই বরাবর মনে হয়েছে তাদের। লিখনের ভার্টিকাল ভূখণ্ডের আশপাশে পোড়া দাগ দেখতে পেয়েছি। আর বোঝার

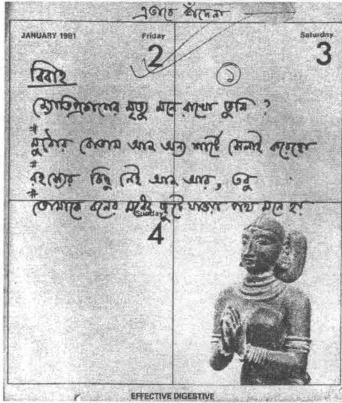


চেষ্টা করেছি, বুঝেও ছিলাম একরকম করে। নিজের সংস্কার ও তদবধি অর্জিত অনুষঙ্গ সমবায়ের সমর্থনে মনে হয়েছিল ওখানে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে অন্য চারটি পঙ্‌ক্তি, যে চারটেকে দুটোতেও ভেঙে অথবা গড়ে নেওয়া যায় :

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্র মাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।

শুধুমাত্র চৈত্র আর দু-রকমের লোহিতাভার সাযুজ্যে নয়, বেশ সর্বাত্মকভাবেই মনে হয়েছিল। তখন মনে হত শ্যামপদ চক্রবর্তী অতুল গুপ্ত সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। ওই যে পড়তে হত — পূর্ণোপমার মধ্যে থাকে চারটি অঙ্গ — উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম আর তুলনাবাচক শব্দ। 'তুলনাবাচক শব্দ' ব্যাপারটা নেহাতই এলেবেলে মনে হত, আর ওই তথাকথিত 'সাধারণ ধর্ম'-টাকে মনে হত বিজ্ঞানসম্মত ইমারতে সিঁড়ির পাশের ঢালে প্রতিবন্ধীর জন্য রেখে দেওয়া হুইলচেয়ারমাত্র। আমার নিজের যেটুকু তালিম ছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ বা কমলকুমার মজুমদার বা সুবিমল মিশ্র বা প্রবীর দাশগুপ্ত বা বুদ্ধদেব বসু — কাউকেই নির্বিকারভাবে ভরসা করার মতো নমুনা বলে মনে হত না। বলা যেতে পারে, বেশ সংস্কারমুক্তভাবেই পছন্দ-অপছন্দ পক্ষপাত ও নিরাশক্তি এবং বাতিল করার স্পর্ধা বহন করতাম। ওই পূর্ণোপমার গাইডবুক দেখে নয়, কবিতার পঙ্‌ক্তিকে উপমেয়-উপমান, বা প্রকৃত-পরাত্মার একটা অনিঃশেষ মোকাবিলা, একধরনের ঠান্ডা লড়াই, মানে গ্রাসনস্ত-পেরেস্ত্রৈকার পূর্বকালের কোল্ডওয়ার বলেই মনে হত। 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা'-র লোহিতবর্ণের চেয়ে মশাল-রক্তদ্রোণ-পলাশ শিমুল আর অশোকের লালটাকেই মনে হয়েছিল অনেক বেশি খুনখারাপিতে ভরা। মৃদুল দাশগুপ্তকে পড়ার আগে তো বটেই, শোনার আগেই, অজ্ঞাতে, মৃদুল দাশগুপ্তকে না-জেনেই, মৃদুল দাশগুপ্তের ওই খণ্ডিত পঙ্‌ক্তি দু-টি দেখেছিলাম, এবং প্রতিদিনই, হয়তো ঠিক কাব্যভোগের অভিপ্রায়ে নয়, মিশ্র একটা উত্তেজক ভালোবাসা নিয়ে দেখেই যেতাম। ভাগ্য এবং অহমিকাবশত কখনো কারো কাছে পঙ্‌ক্তি দু-টির উৎস বা মোহানা জানতে চাইনি, তাই প্রকরণভেদে আসল কথাটা স্বয়ং স্রষ্টার মুখেই প্রথম শুনলাম।

জলপাইকাঠের এসরাজ বইটা আমি প্রথমে হাতে পাইনি, পেয়েছিলাম *এভাবে কাঁদে না* বইটা; মৃদুল দাশগুপ্তের দ্বিতীয় বই জেনেই, 'হাতে চাঁদ পেলাম' — এমন কিছু অর্থাৎ এতদূর কিছু মনে না হলেও, অপেক্ষার অন্তেও হস্তগত করে বেশ ভালোই লেগেছিল। *বিবাহ, খাবার, হাসপাতাল, স্রোত* — এই অনুক্রমেই পড়ে যাচ্ছিলাম। আজ সম্পাদকের তৎপরতায় এবং স্বয়ং কবির অনুমোদনে বইটির পাণ্ডুলিপিতে দেখছি — কী আশ্চর্য — *বিবাহ* কবিতাটিই প্রথমে আছে এবং হয়তো কবির সচেতন অভিপ্রায় ছাড়াই ডায়েরির ছক ও ছবি মিলিয়ে এক অলৌকিক বিন্যাসে, সাংঘাতিক ভাইব্র্যান্ট তুলকালাম এক কম্পোজিশনের মধ্যে রিলিফের প্রগাঢ় ঘনত্ব নিয়ে স্থাপিত হয়ে আছে। দেখুন — জানুয়ারি ১৯৮১-র ২ তারিখ ছিল শুক্রবার, ৩-তো তাহলে অনিবার্যভাবেই শনি — কিন্তু ২ আর ৩-এর মধ্যে



এভাবে কাঁদে না-র খসড়ার শুরুর কবিতা, *বিবাহ*

কবি পুঁতেছেন একটি '১'-কে। এ হয়তো সমাপতন, কিন্তু এই উত্তরচল্লিশ অভিজ্ঞতায় সমাপতনকে শ্রদ্ধাই করি, নিয়তিনির্ধারিত ও মূল্যবান মনে হয়। তবে আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক নিয়তি নয়, সেই নিয়তি যা শিল্পমাত্রই বহন করে, বহন করতে বাধ্য — তার মূলে ভাস্করের ছেনি-হাতুড়ি বা কবির কলম, যাই থাকুক। আজ মৃদুলকাব্যজিজ্ঞাসা ও উৎকণ্ঠায় এই পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠাটি আমার প্রথম বন্দর — সন্ধানের সফেন, সমুদ্রে না হোক, এক তুমুল স্রোতে তো বটেই। আবার ওই ডায়েরির পাশেই রয়েছে *অফবিট*-এর চরম অযত্নে ছাপা *কবিতাসংগ্রহ* — পাতা উলটে পৌঁছে যাওয়া যায় *ধানখেত থেকে*-র ১, ৩, ৪, ৯ হয়ে *পরবর্তী পাণ্ডুলিপির কয়েকটি*-র আবার ১, ২, ৩, ৪ হয়ে ১৩ পর্যন্ত। কিন্তু *এভাবে কাঁদে না* আর এই *ধানখেত থেকে*-র মাঝখানে জেগে থাকে সিঙ্গুর-নেতাই-নন্দীগ্রাম-হলদিয়া-আরামবাগ-মুকুল রায়-অনিল বসু-অলিম্পিক ২০১২ — আরও অনেক কিছু যার মূল্যায়ন সিবিআইসিআইডিসংবিধানরাষ্ট্রক্যাবিনেটরাজ্যসভাসুশীলস্বজনপরিবর্তন-অপরিবর্তনের স্রোত ইত্যাদি দ্বন্দ্ব — দ্বন্দ্বময় সমাসসিরিজের অনিশ্চিত অপেক্ষায় বহমান। এরই মধ্যে আমাকে এনগেজড রেখেছেন মৃদুল দাশগুপ্ত ও তাঁর আনুষঙ্গিক।

'কাব্য আছে কিন্তু কাব্যতত্ত্ব নেই' এমন সময়সন্ধি বহুবার এসেছে-গেছে, আসাযাওয়া করেই চলেছে। বুদ্ধ বলছেন ওই যে অগ্নিশিখা তা পূর্বের অগ্নিশিখাটি নয়, হেরাক্লিটাস বলছেন এক নদীতে দু-বার নাওয়া এক দুরাশা, আর মৃদুল বলছেন :

> সূর্য ও আগামীকাল সমার্থক। সেই সূত্রে
> আমি এই সৌরপৃথিবীর ডাল ভাত ফুটিয়ে দিচ্ছি —
> পথশ্রম শেষ আর কোনো পান্থ উপোসী থাকবে না।
>
> একটি ধানের বীজে সমুদ্র আকাশ মাটি ব্যাখ্যা করা যায়।
> অন্ধের স্বপ্নের স্ফূর্তি মেলে ধরা আমার দায়িত্ব, আমি
> চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করি।
>
> বীজ ও আগামীকাল মিশে তাই অন্নব্যঞ্জন।

আমি জানি কীসের মধ্যে কী পাওয়া যায়, কী আমার দায়িত্ব, আমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করি না এবং আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি না। আমি খুব সঠিক সুনির্দিষ্টভাবে নব্য ন্যায় বা উপনিবেশ অধ্যয়নজ্ঞানে বলতে পারব না কেন, কিন্তু আমি মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতার মধ্যে একটি মৌলিক সূত্র আছে বলে অনুভব করেছি এবং ওই বিমূঢ় বিমূর্ত অনুভবের একটি অতি সামান্য অংশমাত্র প্রকাশ করতে পারি। একে 'পোয়েটিক্স' বলার মতো অপোগণ্ড আমি নই, আবার আত্মজ্ঞানকে তৃণাদপি সুনীচেন বলার মতো বিনয়ের অর্থহীন স্পর্ধাও আমার নেই। ওই সূত্রটির সন্ধানে আমি আপাতত যথাসাধ্য মনোযোগে খরচ করছি আমার কালিকলমমন।

আচ্ছা, হে চিরপ্রণম্য পাঠক, মৃদুলের কবিতায় এত শতবর্ষ-সহস্রবর্ষ কেন? যেমন, *গ্রাম চাঁপাডাঙা-৩০২০*। *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর রচনাকাল ১৯৭০-১৯৭৯, সেই তথ্যটাকা মেনে নিলে সমীকরণটা কেমন হবে?

১৯৭০ + ৫০ + হাজার বছর = গ্রাম চাঁপাডাঙ্গা ৩০২০

'১৯৭০'। আমরা জানি, হে, তুমি পড়িছ বসি বাচালতাখানি, তুই-তুমি-আপনিও নিশ্চয়ই জানেন। অনীক দত্ত জানেন, পরমব্রত জানেন বিপ্লব ভূত বা ভূতপূর্ব বিপ্লব সব্যসাচী জানেন। এ বরযপরে শীতের বেলা আসেনি, এই চারঅঙ্কের সংখ্যা চারঅক্ষরের যেকোনো শব্দের চেয়ে বেশি অর্থবহ, এই বছর সম্পর্কে শ্রদ্ধা-ঘৃণা-ভীতি প্রায় সবকিছুই অযৌক্তিকভাবে অতিরঞ্জিত বা অবচিত্রিত — তবু এ বছরটাকে এড়িয়ে যেতে, জাঁহাপনা, আপনি যদি ভোটাধিকার পাওয়া বাঙালি হন, আপনিও পারেন না। '১৯৭০' — কালসন্ধ্যা-কালবেলা-কালপুরুষ-কালপ্রমীলা সমাহার — একযুগ। একটি বছরমাত্র নয় — এবং উক্ত বছর সম্পর্কে আমার এই ব্যাখ্যা বা টিপ্পনি অনাবশ্যক, কিন্তু প্রাজ্ঞজন এবং মাষ্টারমশাই-এরা বলেছেন অধিকন্তু ন দোষায় — তাই আর কি — বিশ্বাস করুন, আমি হাত কচলাচ্ছি।

মৃদুল দাশগুপ্ত ১৯৭০-এর কথা *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এ লিখতে শুরু করেছেন সমকালেই (অনুগ্রহ করে মনে করবেন না *জলপাইকাঠের এসরাজ* ১৯৭০ নিয়ে লেখা কবিতার সংকলন, আমি বলে দিলাম, আমায় কিন্তু দায় রইল না!) — মৃদুল ভাবছেন হয়তো অনেক আগে থেকেই, অন্তত ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকেই, উক্ত সময়ে পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেরা ও মেয়েরা আওপাতালি নাবালক হত না, বাবার কাছে শুনেছি।

মৃদুল দেখছেন ১৯৭০ — মৃদুল ১৯৭৮-এ বাছছেন ৩০২০-র কল্পসাধআনন্দ-বিষাদ। তাঁর জন্মদিন ৩ এপ্রিল, ১৯৫৫। অর্থাৎ ১৯৭০-এ মৃদুল পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর। আর বলাবাহুল্য '১৯৭০' নামক ফেনোমেনা বাংলায় এসেছিল আরও কয়েক বছর আগেই; তবে কার কাছে কতটা আগে সেটা নিতান্তভাবেই ব্যক্তিচরিত্রসাপেক্ষ। মৃদুল কবে থেকে ১৯৭০ দেখতে পাচ্ছিলেন সঠিক জানা নেই — আর তা অতি সুনির্দিষ্টভাবে জানার চেষ্টা করে কবিকে সাক্ষাৎকার-বিড়ম্বিত বা তাঁর কবিতার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যকে সমারূঢ়সদৃশ আখকুটেপনায় ঘাঁটাঘাঁটি করাও অপ্রয়োজনীয় তো বটেই, হয়তো অবিধেয়। আঁচ যেমন উনুনের আশ্রয়বৃত্ত ছাড়িয়ে রান্নাঘরে ছড়িয়ে উষ্ণতার ভিগনেট তৈরি করে, এক্ষেত্রেও তাই। ততটা সুনির্দিষ্ট প্রত্নপ্রমাণপ্রত্যয়িত ১৯৭০ প্রয়োজনীয় নয় একেবারেই। কিন্তু মৃদুল একটা প্ররোচনা দিতে থাকেন। ক্যারামের লোহিতচক্রকে যেমন কেন্দ্রে রাখতে হয় প্রতিবার বোধনের কালে, অন্তত দু-টি কবিতার কথা বলা উচিত যেখানে অতি স্পষ্ট তরিকায় এভাবেই কেন্দ্রে রয়ে গেছে উক্ত আলোক অথবা তিমিরবর্ষের ঘটস্থাপনার ছাপ : *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর *২০৭০-এর তরুণ কবিকে* এবং *এভাবে কাঁদে না*-র ২০৭০-এ। বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের আনন্দ-অভিবাদন কেন পাঠালেন মৃদুল ২০৭০-এর তরুণ কবির করেই? রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শতবর্ষ পরের পাঠককে (ঠিক পাঠককে নয় অবশ্য, পাঠিকাকেই — 'খুলিয়া দক্ষিণদ্বার বসি বাতায়নে' ভঙ্গিমাটি পাঠকের তুলনায় ঈষৎ বেশি সমীচীন পাঠিকার পক্ষেই), চেয়েছিলেন সে পড়ুক তাঁর কবিতাখানি কৌতূহল ভরে। কিন্তু পাঠকের অন্তরালের এক সম্ভাব্য কবিও ছিল রবীন্দ্রনাথের বর্ষভেদী বাণের নিশানায়। স্বরূপত বোধহয় সে-কবি তাঁর পথরোধকারী না হোক, প্রতিদ্বন্দ্বী তো বটেই —

> আজি হতে শতবর্ষ পরে
> এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি

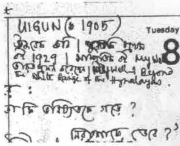
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।

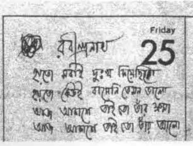
কিন্তু হে জনাব অথবা বেগম — ঈষৎ সহায় হোন সদয় অনুকম্পায়, একবার ভাবুন তো যদি কেউ দক্ষিণদ্বার খুলে বাতায়নে বসে সুদূর কল্পনায় চাহি কল্পনায় অবগাহি ভাবনা কাহারে বলে এই ভাবনায় মগ্ন — সে-সময় যদি কোনো কবি তার ঘরে বসে গান করে তাহলে সে হতভাগ্য আগামীর কবি কতটুকু মনোযোগ পাবে? তার মানে, শতবর্ষ পরে রবীন্দ্রনাথ একই ঘরে পাঠিকা এবং একজন কবিকে একসঙ্গে বসিয়ে দিচ্ছেন, একই ঠিকানায়? দক্ষিণদ্বারটা বোধহয় খোলা রাখা হয়েছিল ওই কারণেই — না জানি সে আসবে কবে গৃহে আমার — হয়তো যতন করে ধুতে ও মুছতেও হয়েছিল। যদি শুধু বসন্তগান ও বসন্তবায় প্রয়োজন হয় তাহলে তো বাতায়নপথই যথেষ্ট, দক্ষিণদ্বারটা খোলা রাখতে হল কেন? এটা কি রবীন্দ্রনাথের একধরনের প্রত্যয়ী অহমিকা? যদি সেই আগামী বর্তমানের অন্য কোনো কবি কানের পাশে নানান সুরে গান শোনায় ঘরের মধ্যে বসেই, তাহলেও বাতায়নে বসা কাব্যরসবিলাসিনী শুনতে চাইছেন শতবর্ষ আগের কবিকণ্ঠ? কোথাও জিততে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ একশো বছর পরের কবিগানের আসরেও।

বিশ্বাস করুন মাননীয়-মাননীয়া, রবীন্দ্রনাথ আমাকে প্রতিদিন তাঁর নামে আহ্নিক-আচমন-তর্পণের গুরুভার দিয়ে যাননি এবং আমিও বিশ্বভারতীর কাছে তেমন অনুমোদনের দরখাস্ত করিনি। বাঙালি রবীন্দ্রনাথ বিনে আজও কতটা অসহায় তা হয়তো কবীর সুমন জানেন, কিন্তু আমার প্রতিদিনের বাধ্যতামূলক জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথ নন। আমি সার্ধশতজন্মবর্ষের লালনেপালনে ক্লান্ত কবিগুরুর ধার দিয়েই যেতাম না, যদি না মৃদুল অকস্মাৎ 1981-এর Rallis India Limited-এর Doctor's Diary-টা খুঁজে না পেতেন এবং সেটি তাঁর হাত থেকে সম্পাদকের হাত ঘুরে আমার কাছে না এসে পৌঁছোত।

যেখানে *এভাবে কাঁদে না*-র কবিতা শেষ হয়ে গেছে তারপর একটা বিরতি নিয়ে, কয়েক পাতায় কিছু শূন্যতা রেখে হঠাৎ পরপর তিনটি কবিতা রেখেছেন মৃদুল। সেগুলি যথাক্রমে *মেঘদূত*-এর দু-টি পঙ্‌ক্তির অনুবাদ, উজবেক (রুশ) কবি Uigun Atakuziew-এর একটি কবিতার অনুবাদ এবং *রবীন্দ্রনাথ* নামে একটি ওড-গোত্রীয় চারপঙ্‌ক্তির কবিতা। প্রথম দু-টি হাতে রাখছি আপাতত, অনতিবিলম্বেই তাদের শরণাপন্ন হতে হবে। *রবীন্দ্রনাথ* শীর্ষক কবিতাটি অপরিসর :

হয়তো সবাই দুঃখ দিয়েছিল
হয়তো কেউই বলেনি তেমন ভাল
আজ আকাশে তাই তো তাঁর ক্ষমা
আজ আকাশে তাই তো তাঁর আলো





এ-পদ্যটি বোধহয় ফরমায়েসি, কোনো জয়ন্তী-উদ্‌যাপন আবদারে চরিত (১৯৮১-তে রবীন্দ্রনাথ একশো বিশ)। এ কারণেই, এই পদ্যের ভরসাতেই ওই শতবর্ষ প্রসঙ্গে খানিক রবীন্দ্রনাথ।

মৃদুল কিন্তু *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর কবিতাটিতে কোনো পাঠককে ঠিকানা করছেন না — তাঁর টার্গেট তরুণ কবি। এবং কবিমাত্রই পাঠক হলেও পাঠকমাত্রই কিছুতেই কস্মিনকালেও কোনো ভাবে-ভণিতাতেই কবি নয়, এমনকী সব পাঠকই কবি নয়, কোনো-কোনো পাঠক কবি — এ-জাতীয় আশ্বাসবচনে রসস্থ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

কী বলছেন ১৯৬৮-৭৮-এর মৃদুল শতবর্ষ পরের কবিকে? সেটা কবিতাতেই খুঁজে নেওয়া ভালো নিজ-নিজ রুচি মতো — আমার বলার বিষয়টা অন্য। তার আগে আমাদের অতি পরিচিত এবং অধিকাংশের কাছেই অসম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত একটি শ্লোক স্মরণ করতে চাই। ওই নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবী শ্লোকটির কথাই বলছি। সংস্কৃত ভাষা আমার তেমন জানা নেই — অতএব উত্তর রামচরিতের মূল শ্লোকটি না কপচিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়কৃত সরল বঙ্গানুবাদটিই ব্যবহার করছি :

> এই সংসারে যাঁরা আমাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে থাকেন, তাঁরা (নিশ্চয়ই) কিছু জানেন। তাঁদের প্রতি আমাদের এই প্রচেষ্টা (অর্থাৎ কাব্যপ্রয়াস) প্রবৃত্ত হচ্ছে না। আমারই সমান গুণের অধিকারী কোনো ব্যক্তি (নিশ্চয়ই) এই সংসারে আছেন বা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন। কেননা, এই কাল অনন্ত এবং এই পৃথিবী বিশাল।

এ 'সত্য' কবিমাত্রই জানেন এবং বোধহয় মানেন। কেবল আমাদের অতি সাম্প্রতিকে দেখা অতিপ্রতিভাপ্রভাধরদের কথা আলাদা, তাঁদের ক্ষেত্রে এক-এক ব্যক্তি এক-এক কাল্ট। তাঁরা আড়ালে এবং অনুকূল পরিস্থিতি থাকলে প্রকাশ্যে নিজের সম্বন্ধে যা বলেন তার মোটা মানেটা হল — 'এই এক পিস-ই এসেছিল — কেউ বুঝল না'। ভবভূতি এমন ভাবেননি। এ যেন কালের কাছে এক কাঙালের প্রার্থনা — অন্তত একবার কেউ জানতে চেয়ো আমাকে — 'এসেছিলে একবার, দিয়েছিলে একরাত্রি দিতে পারে যত' — অন্তত এটুকু প্রার্থনা করেন রসস্রষ্টারা। মৃদুল তাঁর কবিতায় শতবর্ষপারের ভবিষ্যতের যে কবির জন্য নৈবেদ্য রচনা করেছেন, সে কিন্তু ভবভূতির মতো সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত এবং সম্ভাব্য কেউ নয়, নয় 'কে তুমি পড়িছ বসি'-র মতো যে-কেউ — সে খুব সুনির্দিষ্টভাবে কবির পরিচিত। কবি তাকে ডাকনামে ডাকলে সে শিহরিত হয় —

— ও চোখ তো চেনা চেনা, ঐ নাক, শতাব্দী আগের গন্ধ হাসির পোশাকে...
সেই লোক তোমাকেই ডাকনাম ধরে ডাকলো, আর
অপ্রতিভভাবে বললো, 'ডেকেছো আমাকে?'

২০৭০-এর তরুণ কবিকে কবিতাকল্পমায়াযানে ভবিষ্যতে গিয়ে কবি অপ্রতিভভাবে বললেন 'ডেকেছো আমাকে?' মানে আহ্বানটা ছিল ওই ভবিষ্যতের তরুণ কবির তরফ থেকেই। তার ডাকে সাড়া দিতে বর্তমান থেকে শতবর্ষপারের পৃথিবীতে গেছেন মৃদুল। তার মানে একটা একতরফা ওর‍্যাকল নয় — একটা কথোপকথন!

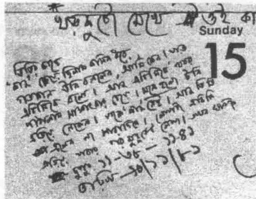
জবাবটা পাওয়া যায় *এভাবে কাঁদে না*-র ২০৭০ কবিতায় (আমার হাতে পাওয়া পাণ্ডুলিপিতে খুব আশ্চর্যভাবে এই কবিতাটির নামমাত্র নেই) —

আমরা দুজন চেনা, ঠিকানা জানি না ঠিকই — এতো যোগাযোগ

এটাই বোধহয় মৃদুলের কাব্যদর্শনের অন্যতম প্রত্যয়। কবি মাত্রেরই তো কোথাও পরমহংস হওয়ার কথা — ভেদজ্ঞান না থাকারই কথা দিতে চান কবি। মৃদুল অজাতশত্রু কিনা জানি না, তবে তাঁর পরিচিত তো বটেই, অপরিচিতরাও তাঁর 'অপর' নয়, আপন; আর কোনোভাবে না হোক, মৃদুলের কাব্যবিভূতি তাকে আপনপানে আপনজ্ঞানে আত্মস্থ করে নিতে প্রচেষ্ট, উদ্যত। এবং এ কারণে তাঁর একটি আপাত-ইউটোপিক দাবিকে যথার্থ ও সঙ্গত বলে স্বীকার করে নিতে হয় :

মুছে দিলে পড়ো তুমি যতো দাগ ফাটা ক্ষয়া
আমাদের জীবনে ঘটেছে, ঘটে; ঘটনাপ্রধান সেই বহমান নদীতীরে
একদা আমারই ছবি
দাঁড়িয়ে তাকাও যদি মনে কি হবে না এই জল-মাটি পুরুষ-রমণী
উৎপাদিত সমস্ত ফসল শস্য — সব আমাদের?

তাহলে, উটের গ্রীবার মতো অতি অস্বস্তিকর একটা সংশয় এসে ছায়া ফেলে যে। কাকে, গোপনে কোন হিংসার কথা বলেন মৃদুল?



গোপনে হিংসার কথা বলি মৃদুলের ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮-র মধ্যে লেখা কবিতা। তার ঠিক আগের পর্বে, ১৯৮১-র ওই Doctor's Diary-র দাক্ষিণ্যে জানি — সম্ভবত কোনো সমস্যায় উপযুক্ত কাজ না পেতে-পেতেই, নিয়ত কাজ খুঁজতে-খুঁজতে একাশি থেকে বিরাশিতে পৌঁছোচ্ছেন মৃদুল। অতঃপর হতাশা থেকে জিঘাংসা — এবং তারপর শিকারের পিছনে নিয়ত ধাবিত শিকারি, পিঠের তূণীর খসে যাওয়া — এবং গোপনে হিংসার কথা বলা — ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এত সরল নয়। আমি আদৌ কোনো সুসংগত জবাব দিতে সচেষ্ট হতে চাই না, শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই গোপনে হিংসার কথা বলা কবি যখন মৃদুল, তখনও সেই মৃদুল আগামীকালের কবির কাছ থেকে বাক্যের আশীর্বাদ ও শয্যার কৌশলের শিক্ষা প্রার্থনা করেন। 'হিংসার কথা গোপনে বলি' — যদি এভাবে সাজিয়ে নিই বাক্যটিকে? অর্থাৎ হিংসার কথা তাঁর কবিতার অন্দরমহলের বা রান্নাঘরের ব্যাপার — তাঁর কবিতা প্রকাশ্য হিংসার প্লাকার্ড বা লিফলেট হোক তা কি চান মৃদুল, আদৌ চান? কবিতার রান্নাঘরে কিন্তু কবির একাধিপত্য — অর্থাৎ যখনও পাঠকের কাছে পেশ করা হয়নি তখনও কবিতার টেক্সট, কনটেন্ট, স্টাইল — সবটাই সংশোধন, ধ্বংস ও নবনির্মাণে একমাত্র কবিরই অধিকার — এই গোপনে হিংসার কথা বলা — মশলার মরমী প্রয়োগের পর কবিতা যখন বাইরে এসে পাঠকের সামনে দাঁড়াল — তখন কিন্তু হিংসা কবিতার কপালে লেপা নেই, রাসায়নিক কৌশলে লীন হয়ে গেছে কবিতার সমগ্র অস্থিমজ্জায় — সেই মাইক্রোজমে হিংসার অণুর সঙ্গে একেবারে অতি ঘনিষ্ঠ থেকে হয়তো চিরকাল বোঝাপড়া করে চলতে থাকবে ভালবাসাও — কিন্তু সমগ্র কবিতা — সেই ভবিষ্যতগামী 'অনাগত আগামীর খাদ্য দাবী করে' — *গোপনে হিংসার কথা বলি*-র ক্রিয়াপদের ধরন ও নমুনা দিয়ে যদি ডেটাবেস তৈরি করা হয় — তাহলে একটা ভবিষ্যতের অ্যালগরিদম পাওয়া যাবেই।

সংখ্যা আমাদের বয়স, উচ্চতা, রক্তচাপ, শর্করা ইত্যাদি অন্তরঙ্গ ছাড়া যেসব বহিরঙ্গে অনিবার্যভাবেই ব্যবহার হয়ে থাকে, তার মধ্যে ঠিকানা, দূরভাষ-সংকেত এবং পুঁজিপুলকিত পৃথিবীতে বকেয়াবটুয়ার ষোড়শসংখ্যা ইত্যাদি আছে। এইসব বহিরঙ্গের মধ্যে ঠিকানার বয়স বোধহয় সবচেয়ে বেশি এবং এ কারণেই হয়তো আজও তাতে অনেকসহজঅচেতনঅভ্যাসে লগ্ন হয়ে আছি আমরা। 'কবিতাভবন' বলে একটি বাড়িই এককালে ছিল বৌদ্ধিক বাঙালির কবিতামন্দির গন্তব্য। কিন্তু গোয়ালা থেকে মধুবংশির গলি, নম্বর নেই বটে, তবে নাটোর স্থাননামটিই যেমন বনলতা সেনের ঠিকানা, সে-অর্থে ঠিকানা তো বটেই। ঠিকানা বিষয়ে ঘটনাচক্রে এক বিদ্বানবন্ধুর উদার দাক্ষিণ্যে বর্হেস-এর *আলেফ* গল্পটি পড়ে ফেলেছিলাম। আলেফ হিব্রু ও আরবি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ। এর অর্থ আদি, এবং অন্য সমস্ত হিব্রু অক্ষরের মতো এ-ও ঈশ্বরের আরেক নাম। ইহুদীয় অধ্যাত্মের আকর কাবালাহ্-মতে আলেফ মহাবিশ্বের সূচনাবিন্দু এবং অন্য সব অক্ষর ও সংখ্যার ধারক। বাঙালি পাঠককে বিনয়বশত কবিতা থেকে মাঝে-মাঝে গণিতের দিকে চোরা চোখে তাকাতেই হয় — অবশ্যই গণিতে আলফা অর্থে অসীম।

এ গল্পের শুরুতেই 'বিয়াত্রিস' নাম্নী একটি মেয়ের মৃত্যুসংবাদ। তার বাড়ির ঠিকানা আলেফ গ্যারে স্ট্রিট। বিয়াত্রিস যে দান্তের ঈশ্বরী, গায়ত্রী যেমন বিনয়ের, এ-কথা বাংলা কবিতার পাঠক জানেন। বর্হেস তাঁর রচনালীলায় এই নামের অনুষঙ্গে কবিতার একটা বিভ্রম এনে দেন কাহিনির মধ্যে। মাধবীবিতান? হ্যাঁ, শব্দটা পেয়েছি মৃদুলে। কবিপত্নীর নামও মাধবী এ-ও জেনেছি সাধুসঙ্গগুণে। আলেফ এই মহাবিশ্বের এমন এক পরমবিন্দু যার মধ্যে অন্য সব বিন্দু নিহিত।

মৃদুলের কবিতায় চেতনাচারণা করতে-করতে *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-র *শূন্যে যে কল্পনা করে* কবিতায় হঠাৎ '৬৫/১৩এ' সংখ্যাটির সম্মুখিন হই। ৬৫/১৩এ-তে সর্বস্ব উড়িয়ে ফিরে এসে উটপাখির কোলে নিদ্রা যায় কবিতাপুরুষ। এটি যে কোনো বাড়ি বা বাসার ঠিকানা, নিদ্রা কোল রন্ধন ইত্যাদির অনুষঙ্গে এ বিষয়ে প্রথমপাঠেই কোনো সংশয় হয়নি। তবে তাৎক্ষণিকভাবেই অকবিসুলভ জিজ্ঞাসার জন্মও হয়, অতএব সম্পাদকের শরণাপন্ন হতে হয়। তিনি জানান, শ্রীরামপুর থেকে বরাহনগরে স্থানান্তরিত হয়ে নয়-এর দশকে এ-বাড়িতে, আরও প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে গেলে এই ঠিকানায় ভাড়া আসেন মৃদুল। সম্পাদকের সূত্রেই সমাচার পাই, *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* শুধু কাব্যালঙ্কার চিত্রকল্প বা বাক্যবন্ধমাত্র নয়। অনুকূলতার সুবাতাস পেয়ে ঘর শ্রীরামপুরে ফিরে এসে আক্ষরিকভাবেই তিল-তিল করে কবিতাকে কবালারূপে বাঁধা দিয়ে ও বিতরণ করে আঠেরো বছর ধরে কোনো নিয়মতান্ত্রিক ঋণগ্রহণ ব্যতিরেকেই নিজস্ব বাসগৃহ গড়ে তোলেন মৃদুল — 'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ' কবিকৃত সেই বাসগৃহের শুভনাম।

কবিতার নেপথ্য কবিতার প্রকাশ্যর সঙ্গে কোনো সিগনিফায়ার-সিগনিফায়েড সম্পর্ক এক্ষেত্রে আছে কিনা ও থাকলে কীভাবে আছে, সে-তালাশের তেমন যোগ্য নই বলেই বোধহয় এ-সমাচারের মায়ায় মনে পড়ে গেল মৃদুলের *বিবাহপ্রস্তাব* —

> বাড়িটি থাকবে নদীর কিনারে, চৌকো,

বরাহনগরের ভাড়াবাড়ির ছিল নামহীন সংখ্যা আর শ্রীরামপুরের আপনবাড়ির নাম 'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ', এর একটা কোনো নম্বর পুরসভা অবশ্যই ধার্য করে থাকবে। *একজন ভারতীয় নিগ্রোর কবিতা* তো এই মৃদুলেরই লেখা। উদ্বাস্তু হয়ে যাবার উত্তরাধিকার ওই কবিতায় স্পষ্ট। *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-এ একটি বিভাব কবিতা আছে, আর *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* — এ-নামের একটি কবিতাও আছে। এবং সে-কবিতায় নিশীথের বিকলনের প্রসঙ্গ আছে। আছে চতুর্দিকে লাস্যময়ী বিবিধ রমণী এবং আছে একটা এলিমিনেশনের নিয়ম। মূলত ভাষা ও ছন্দের ঈষৎ স্খলনের পর ওই বিবিধ থেকে একজনকে বেছে নেওয়া। সে-ই পত্নী হবে, পত্নী একজন হবে। আচ্ছা, আরেকভাবেও তো দেখা যায়। বিবিধ থেকে একজন — এই নির্বাচন মানেই কি বিয়োগফলপ্রত্যাশা? বিবিধকেও তো এক করে নেওয়া যায়। আসলে বিবিধ এবং এক — দু-টিকে যদি দু-টি রাশি মনে করে থাকেন কবি? এসব গুহ্য কথা, হে কবিতাপ্রবীণ, খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে বলছি, বিভ্রান্তি



'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ', শ্রীরামপুরের নতুন বাড়ি

কবুল করাটাকে ভুলেও আত্মসমালোচনা ভাববেন না। আমার ভিত্তি বিভ্রান্তি, অর্থাৎ ভিত্তি একটা আছে। মৃদুলের কবিতার এই ব্যক্তিগত বোঝাপড়ায় প্রায়ই বিভ্রম তৈরি হয়। ওই যে বিবিধ থেকে এক — ওই বিষয়কে ওভাবে দেখতে তাড়িত করেছে অনেক কবিতাই। যেমন *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-র *এই বাক্য, গুপ্তবিদ্যা* কবিতাটি। বাক্য ও গুপ্তবিদ্যা — কবিতার নামে এই শব্দযুগল তো কবিতার প্রকরণের কথাই বলতে চায়। কিন্তু বিবিধ আর এক — এ-দুই-এর — এবং এমত রাশিসমূহের ব্যঞ্জনা মৃদুলের কবিতায় খুব অবোধপাঠ্য রৈখিক নিয়মে নেই —

তুমি তো গ্রাহিকা মাত্র সারল্যের, ভাবো, যদি
লোহার গণিত এসে ভিন্নতর বাগিচা সাজায়!

বারবার বর্ষগণনা, ঠিকানা, মরমিয়াবাদী ইশারার অনুষঙ্গে সংখ্যা ও গণিতের একটা ক্ষেত্র তৈরি করেন মৃদুল, এবং সেই ক্ষেত্র নিরপেক্ষ নয়, আবেগের আধানে বিদ্যুৎপ্রভ। একটা কুণ্ঠিত অনুমান পেশ করি (এটা কিন্তু সবিনয় আত্মসমালোচনাই), বর্ণমালা দিয়েই কেন? এই যুগকে ডিজিটাল বলে আমরা প্রায় মেনে নিয়েছি। কবিতা কি স্বরূপত ডিজিটাল, অ্যানালগতাও আছে কবিতায়? কবিতা কি লিনিয়ার, না নন-লিনিয়ার? যদি কেউ সংখ্যাকেও কবিতার মাত্রায় আত্মস্থ করে আগামীর কোনো প্রকরণ খুঁজে চলেন গোপনে? মনে হয় মৃদুল ভবিষ্যতের কবিতার একটা সুশৃঙ্খল ভাষা খুঁজেছেন, খুঁজে চলেছেন, তাই বর্ণমালা তাঁর লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছোনোর উপায় — **সাঁকোটাই তৈরি বর্ণমালা** দিয়ে, একইভাবে অভিধান তাঁর — **মই** : কোনো ভার্টিকাল পাথেয়র উপলক্ষ।

আসল লক্ষ্য বোধহয় এক নিজস্ব ধারণায় সুস্থিত পরমতায় পৌঁছে যাওয়া। জগতের সবচেয়ে পরিচিত, প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য পরমতা ঈশ্বর। সম্প্রদায়ের ঈশ্বর নয়, ভাবের ঈশ্বর, কিন্তু পরমতায় বিশ্বাসী মৃদুল ঈশ্বরবিশ্বাসী নন, আপোশহীন নাস্তিক। তাঁর পরমতা হয়তো লীন কবিতার অন্তর্গত বিশ্লেষণের পরিসরের বাইরের কোনো নিভৃত বিন্দুতে। কবিতা বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর তিনি, সঙ্গতভাবেই, তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধের প্রেরণায়, এই বিশ্বাসকেও, মৃদুলের অন্তর্জগৎ বিষয়ে অজ্ঞতা স্বীকার করেও একধরনের আস্তিক্য মনে হয় আমার। এই অবধি কোনো সমস্যা ছিল না, মসৃণই ছিল আমার বক্তব্য। কিন্তু মৃদুলেই সব সমাধান না পেয়ে, হঠাৎ একধরনের সাম্প্রদায়িকতারও যেন আকস্মিক চোখ মটকানি দেখতে পেয়ে বড়ো বিপন্ন। এ হয়তো প্রবল অজ্ঞতা, সংবেদনশীলতার নিদারুণ দৈন্য, তবু মনে হল যে! মার্জনা পাওয়ার প্রশ্রয় আছে, আমার ভ্রান্তির এরকম একটা সুপ্রত্যাশা আছে বলেই অকপট হচ্ছি।

২০০১ থেকে ২০০৮-এর মধ্যে নানা প্রসঙ্গে ও অনুষঙ্গে লিখে ফেলা টুকরো গদ্য নিয়ে তাঁর মিতায়তনু গদ্যসংগ্রহ *সাত পাঁচ*-এর প্রথম লেখাটির নাম *স্বয়মাগতা*। এটি পড়ার পর মনে হয়েছে, এক অর্থে এটি বিভাবগদ্য।

> জন্মায়। তৈরি হয় না। কবিতা স্বয়মাগতা। আমার এইরকমই বিশ্বাস। আমি তত্ত্ব, জ্ঞান — এসব থেকে অনেক দূরের এক সাধারণ কবিতা প্রয়াসী। কবিতার নির্মাণ বিষয়টিতে আমার মন সায় দেয় না। কবিতা আকাশ থেকে পড়ে, ধারণা আমার, ওই যে আগে বলেছি, বিশ্বাসেই দাঁড়িয়ে গেছে।
>
> এই কলমটি যেরকম, কবিতা রচনাকালে আমি, আমার দেহ, মন, সেইরকমই। তবে জড় নয়। প্রাপ্তির আশায় ব্যাকুল, আকাঙ্ক্ষায় শিরশির।
>
> ...কাকে বলে কবিতা? কীভাবে হয়ে ওঠে একটি কবিতা? আমি জানি না। শুধু বিশ্বাসটুকু ধরে থাকি, প্রয়াসীরা কেউ কেউ প্রাপ্ত হন। বিশাল এই বঙ্গদেশে তাঁদের কাউকে কাউকে আমি দেখেছি। দেখেছি তাঁরা উড়ন্ত, আলো বের হচ্ছে তাঁদের গা থেকে।
>
> ...এসব যতই বলছি, ততই বোঝাতে চাইছি কবিতার নির্মাণ বিষয়ে কিছু লিখতে আমি সক্ষম নই। নির্মিত যা কিছু তার একটি মীমাংসা আছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক আমাদের মুগ্ধ করে ওই একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছে। রচনা সমাপ্ত করে পূর্ণতার একটা বোধ নিশ্চয় জাগে লেখক, নাট্যকারদের। আরও কী, ইঞ্জিনিয়ার সেতু নির্মাণের সাফল্য অনুভব করেন, ভাস্কর পাথর কুঁদে কুঁদে রূপসৃষ্টির সিদ্ধি টের পান, নচেৎ ভেঙে ফেলেন, কাঠের কারিগর নকশি পালঙ্ক গড়ে বিভোর হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু কবি সংশয়ে দোলেন। এক অনিশ্চয়তার সাধনাই তাঁর।
>
> ...গোপনে তাঁরা সকল কিছুরই নিয়ন্ত্রক। আমি নাস্তিক বলেই, তাঁদের, কবিদের ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলছি না। নচেৎ খোদার ওপর খোদকারির ক্ষমতা তাঁদেরই।

উপন্যাস, নাটক, সেতুনির্মাতা ইঞ্জিনিয়ার, লেখক, নাট্যকার, এমনকী ভাস্কর ও কাঠের কারিগর — এঁরা কি অন্য সম্প্রদায়? যাঁরা শুধুই নির্মাণ করেন, সৃষ্টি নয়? কারণ তাঁরা সৃজনলীলার শেষে সকলেই তৃপ্তি বা সমাপ্তির আত্মপ্রসাদ পেয়ে থাকেন? আদৌ পান কি? ভাস্কর তো সবচেয়ে অসহায়! তাঁকে কঠোরকে কেটে কাজ করতে হয়। ছেনির আঘাত সংশোধনে ফিরে যেতে দেয় না তাকে, বড়ো অকরুণভাবে। তাঁর কি অনিশ্চয়তা থাকে না? তাঁরা কি তাঁদের নির্মিত ত্রিমাত্রিকতার সামনে দাঁড়িয়ে চরম অপরিতৃপ্ত হয়ে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন না? চিত্রশিল্পী কি দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দেন না বহু শ্রমে সাধা ক্যানভাস? কবি হিসেবে মৃদুল কি এঁদের ঈষৎ হীনতর ভেবে ফেলছেন না? কবিদের এ-জাতীয় একটা অসহিষ্ণু অহমিকা থাকে। থাকা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত হয়তো, কিন্তু বাকি প্রকরণসমূহকে এতটা অবজ্ঞামিশ্রিত করুণা কেন? লিখন, ভাস্কর্য ইত্যাদি প্রকরণের কথা বলে একবারও মৃদুল বললেন না সঙ্গীতের কথা! সঙ্গীতকার কি কবির মতোই অনিশ্চয়তার সাধনাই করেন না? অপূর্ণতার বেদনা কি তাঁরও অপরিহার্য নিয়তি নয়? আমার সানুনয় প্রশ্ন রইল। সেই মালার্মে-দেগা সম্বাদই বা কেন মনে পড়ে যাচ্ছে! কবিতালিখনে প্রয়াসী দেগা যখন বিমূর্ত ভাবের সন্ধানে আর্ত হয়ে মালার্মে সকাশে এলেন, মালার্মে তাঁকে চেতিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ভাব-টাব নয় বাছা, শব্দের সাধনা করো, কবিতা শব্দ দিয়ে লেখা (বা রচিত বা নির্মিত বা সৃষ্ট) হয়। মনে পড়ছে, *কেন আমি মৃত্যুর বিষয়ে লিখছি না* গদ্যটিতে মৃদুলের ঘোষণা : 'শেষ ট্রেন ধরে রাতদুপুরে ঠান্ডা কনকনে বাড়ি ফেরার রাস্তায় এখন আমি নিজেকে শোনাই : তোমার মহাবিশ্বে মৃদুল (মার্জনীয়), হারায় না তো কিছু...।' স্বাগত এই পবিত্র ও ব্যক্তিগত অহমিকা — কিন্তু অহমিকা শুধু কবিরই, এমন অহমিকা কেন কবির?

জবাবও পাই। দু-টি গদ্যে মৃদুলের অভিব্যক্তি যোগ করে নিয়ে :

> সবিনয়ে জানাই, আপন রচনার পাঠক হিসেবে আমি কেঁপে কেঁপে টের পাই অক্ষরে অক্ষরে রয়েছে আমি, আমিই। ক্ষমাপ্রার্থনাসহ বলি, অমি এ শিহরণের কোনও ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম।
>
> *একটি কবিতা, তার আবির্ভাব-২ / কবিতা সহায়*

এবং

> কিন্তু মনের ভাবটি কোথায়? তোমার কবিতায়, তুমি?
>
> *বাদামখোলায় হালফিল / কবিতা সহায়*

আরও অবিনয় আরও স্পষ্ট ও কমিটেড হয়ে ওঠে এই দু-টি গদ্যে এবং অন্যত্রও, এ-দুটি দৃষ্টান্তমাত্র:

> ধর্মগ্রন্থের কোনও সমালোচনা হয় না।
>
> *তাঁর স্পেস হেলমেটে অন্য গ্রহের ছত্রাক / কবিতা সহায়*
> *(প্রতিভাস প্রকাশিত উৎপলকুমার বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা)*

> সহর্ষে 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থখানি দুহাতে উঁচু করে ধরে আমার বাবা ফের আমার হাতেই ফেরত দিয়েছেন। যেন ধর্মগ্রন্থ, এই বিবেচনায় বলেছেন, যত্ন কইরা রাহিস। পিতৃআজ্ঞা অমান্য করিনি আমি।
>
> *আমাদের জীবনানন্দ / কবিতা সহায়*

কবিতাই কি পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থের উপকরণ? কবিতা কি উপকরণ? উপকরণ, তা যদি কবিতাও হয়, তা দিয়ে কি ধর্মগ্রন্থ রচিত হতে পারে? বলুন, মৃদুল — আমি অসহায় জিজ্ঞাসুমাত্র।

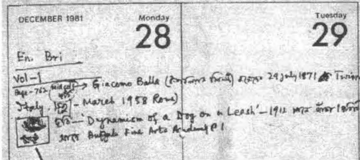
তবে এত সংশয় থেকে গলায় জোরই আসে। কবি মৃদুল দাশগুপ্তকে একই সঙ্গে যোগবিভোর ও সংগ্রামী পরমতাপ্রার্থী অক্ষরশ্রমিক বলতে আর বাধা থাকে না।

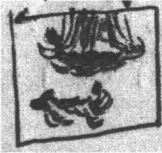
'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ' নামক গৃহটির ভিত্তিমূলে স্বরচিত কবিতা রেখেছিলেন মৃদুল। 'আস্তানা শব্দটির সঙ্গে সম্ভবত অস্থায়ী শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে। বাড়ি নয়, বাসা।' কিন্তু, বাড়িটি যারা বানাল, যারা কারিগর, তারা কি খুব উদ্গার-তোলা প্রশান্তি নিয়ে ফিরেছিল? ফিরে-ফিরে দেখতে থাকেনি আপনার জন্য তাদের হাতে গড়া 'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ'-র দিকে?

তবে এসব ইশারা মৃদুলের গদ্য থেকে পাওয়া। যখন কবিকে পাই তখন তত্ত্বজিজ্ঞাসা থেমে যায়, আনন্দ জাগে। সূর্যাস্ত — এই মহাবৈশ্বিকতায় নিষ্প্রাণ গৃহটি কি বর্হেস-এর ওই আলেফ-এর মতোই এক চিরন্তন বিন্দু? আর তার ভিতে যদি কবিতা রাখা থাকে, তা কি হয়ে ওঠে না পরমবিন্দুর অন্তর্গত আরেক পরমতা?

> আমার নিকটে এসো, খোলো বই, পড়ো তো এবার দেখি
> আখ্যানের দুই প্রান্ত থেকে।

এই সংকেতের পাঠোদ্ধারের জন্য আমাকে আবার নিয়ে যেতে হবে ১৯৮১-র Doctor's Diary-তে। যেখানে *এভাবে কাঁদে না*-র পাণ্ডুলিপি শেষ হয়েছে — তারপর — ওই ডায়েরির সারপ্লাস ফাঁকা পৃষ্ঠায় একটি কবিতা অনুবাদ করেছেন মৃদুল। উজবেক কবির ওই কবিতার প্রসঙ্গ আগেই এনেছি। উক্ত কবিতার বিস্তারে যাবার আগে আর একটি ছোট্ট উল্লেখের কথা বলি। যে-পাতায় ওই অনুবাদ আছে, তার ঠিক পরের জোড় সংখ্যক অর্থাৎ পাঠকের সাপেক্ষে বাঁদিকের পৃষ্ঠায়, যাকে গ্রন্থবিন্যাসবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'ভার্সো' বলা হয়, Giacomo Balla নামক এক ইতালীয় চিত্রকরের সম্পর্কে এবং তাঁর একটি বিশেষ ছবি সম্পর্কে কিছুটা নোট নেওয়া আছে। নোটটির ওই অংশের অবিকল আলোকচিত্র পাঠক দেখছেন — তবু একটা ট্রান্সক্রিপশন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।





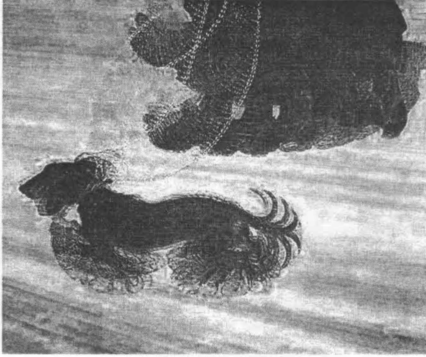
জিয়াকোমো বাল্লা-র আঁকা ছবির
কবি-চিত্রিত থাম্বনেল

En. Bri [অর্থাৎ Encyclopedia Britanica] / Vol-1 / Page-762 / Mid-Col [Mid Column-ই বোধহয়] / ছবি / Giacomo Balla (ইতালিয়ান শিল্পী জন্মেছেন 24 July 1871 Turin Italy. মৃত্যু-March 1958 Rome) / ছবি — 'Dynamism of a Dog on a Leash' — 1912 সালে আঁকা। ছবিটি আছে Buffalo Fine Arts Academy-তে [নিউ ইয়র্কের Albrigh-Knox Art Gallery-র স্থায়ী প্রদর্শনকক্ষে]।

উজবেক কবি Uigun এবং চিত্রী Balla দু-জনের যোগসূত্রটা হচ্ছে 'ভবিষ্যবাদ' নামে এক শিল্পপ্রকরণ আন্দোলন, যার ম্যানিফেস্টো লিখেছিলেন ইতালির কবি মারিনেত্তি (Filippo Tommaso Marinetti), ১৯০৯ সালে। তাঁর প্রস্তাবিত একাদশ কম্যান্ডমেন্ট-এর তৃতীয় সূত্রটিতে হেঁড়ে-মাথা নিশ্চল সাহিত্যকে ভেঙে এক আগ্রাসী আক্রমণাত্মক, বিনিদ্র, মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঘাতে দু-ধাপ লাফিয়ে বলা কুচকাওয়াজের কথা বলেছিলেন।

MANIFESTO OF FUTURISM

1. We intend to sing the love of danger, the habit of energy and fearlessness.
2. Courage, audacity, and revolt will be essential elements of our poetry.
3. Up to now literature has exalted a pensive immobility, ecstasy, and sleep. We intend to exalt aggresive action, a feverish insomnia, the racer's stride, the mortal leap, the punch and the slap.
4. We affirm that the world's magnificence has been enriched by a new beauty: the beauty of speed. A racing car whose hood is adorned with great pipes, like serpents of explosive breath—a roaring car that seems to ride on grapeshot is more beautiful than the Victory of Samothrace.
5. We want to hymn the man at the wheel, who hurls the lance of his spirit across the Earth, along the circle of its orbit.
6. The poet must spend himself with ardor, splendor, and generosity, to swell the enthusiastic fervor of the primordial elements.
7. Except in struggle, there is no more beauty. No work without an aggressive character can be a masterpiece. Poetry must be conceived as a violent attack on unknown forces, to reduce and prostrate them before man.
8. We stand on the last promontory of the centuries!... Why should we look back, when what we want is to break down the mysterious doors of the Impossible? Time and Space died yesterday. We already live in the absolute, because we have created eternal, omnipresent speed.
9. We will glorify war—the world's only hygiene—militarism, patriotism, the destructive gesture of freedom-bringers, beautiful ideas worth dying for, and scorn for woman.
10. We will destroy the museums, libraries, academies of every kind, will fight moralism, feminism, every opportunistic or utilitarian cowardice.
11. We will sing of great crowds excited by work, by pleasure, and by riot; we will sing of the multicolored, polyphonic tides of revolution in the modern capitals; we will sing of the vibrant nightly fervor of arsenals and shipyards blazing with violent electric moons; greedy railway stations that devour smoke-plumed serpents; factories hung on clouds by the crooked lines of their smoke; bridges that stride the rivers like giant gymnasts, flashing in the sun with a glitter of knives; adventurous steamers that sniff the horizon; deep-chested locomotives whose wheels paw the tracks like the hooves of enormous steel horses bridled by tubing; and the sleek flight of planes whose propellers chatter in the wind like banners and seem to cheer like an enthusiastic crowd.

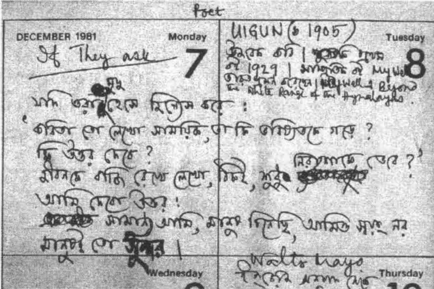


জিয়াকোমো বাল্লা-র আঁকা *ডায়নামিজম অফ আ ডগ অন আ লিশ*

মারিনেত্তি ও মৃদুলের মিল দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। পাণ্ডুলিপির দৈবনির্দেশে আমি বাধ্য হচ্ছি এই ইতিহাস ছুঁয়ে যেতে। উজবেক কবির মৃদুলকৃত অনুবাদটিও মারিনেত্তি-স্মরণে প্ররোচিত করেছে আমাকে :

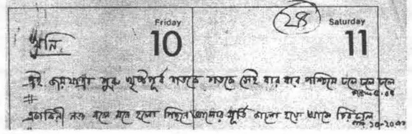
If They ask

যদি ওরা মৃদু হেসে জিগ্যেস করে :
'কবিতা তো লেখো সাময়িক, তা কি ভবিষ্যতকে গড়ে?
কি উত্তর দেবে?
জীবনকে বাজি রেখে লেখো, ঠিকই, শুধু নিরাশাকে ভেবে?'
আমি দেবো উত্তর :
সামান্য আমি, মানুষ চিনেছি, আমিও স্বয়ং নর
মানুষই তো সুন্দর।



উজবেক কবির কবিতার মৃদুল দাশগুপ্তের করা অনুবাদ

আমি এ-কবিতাকে ব্যাখ্যা করব না। কবিতাটি সবিনয়ে পড়ে ফিরে যেতে চাইব মৃদুলের সংখ্যা চিহ্নিত কবিতাগুলির কোনো-কোনোটিতে, তবে তার কোনোটিই উদ্ধৃত করব না। পাঠক, খোদাবন্দ, আপনি যদি চান আর-একবার কবিতাগুলি ফিরে পড়তে পারেন। আমি শুধু এক কোলাজ এনে দেব *এভাবে কাঁদে না*-র বিভাব কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি, আর ওই গ্রন্থের *খনি* কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে।



(পাণ্ডুলিপিতে খনি কবিতার ক্রমসংখ্যা ২৪, প্রথম পঙ্‌ক্তি লেখা ৫.০৫-এ অফিসে, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি লেখা বাড়িতে, রাত ১০.২০-তে, তবে আমার প্রয়োজন শুধু প্রথম পঙ্‌ক্তি, যেটি পাণ্ডুলিপিতে ভাঙা হয়নি, টানা এক লাইনে আছে।)

শুধু অপেক্ষায় থাকো

এই জয়যাত্রা শুরু খৃষ্টপূর্ব শতকে শতকে সেই
বারবার পশ্চিমে ঢলে ঢলে ঢলে

অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত কবিতাপাঠের ফলে, পুণ্যফলে কিনা জানি না, কারণ কবিতার খুব নিবেদিতপ্রাণ পাঠক আমি আদৌ নই, মনে হয়েছিল মৃদুলের কবিতায় আমার সময়ের, মদীয় জন্ম ১৯৭০-এ, একটা 'তত্ত্ব'-র আভাস পাচ্ছি — 'তত্ত্ব' বলতে, আমি বলতে চাইছি একটা প্রোটোকল — ফরম্যাট নয়; 'কীভাবে', কিন্তু 'কী' নয়। একটা নির্দেশ, বোধহয় এরকম বলা যায়। বর্তমানকে ভবিষ্যতের সঙ্গে আলাপ করানো এবং প্রয়োজন হলে লড়াই করানো — জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এই নিয়তির সাফল্য, বিফলতা নিয়ে মধ্যবিত্তমদিরজগতে আছি আমরা — বেদনাহীন-অন্তহীন বেদনার পথে। মৃদুল শতাব্দ-সহস্রাব্দ এসব কালব্যবধানের দিকে যেতে চান কখনো-কখনো, আবার এই ব্যবধানের ভবিষ্যৎ থেকে ওই ভবিষ্যৎকে টেনে আনতে চান নিজের সময়ে; মনে হয় গুরুবাক্য বীজমন্ত্র জপ করছেন মৃদুল যা সেই কবির দেওয়া — যিনি বোধহয়, রবীন্দ্রনাথের পর একমাত্র কবিতাবিজ্ঞানী, যিনি একটা কাব্যতত্ত্বের প্রয়োজন আছে বলে ভেবেছিলেন এবং অনেকটাই পেশ করতে পেরেছিলেন :

> আমি গণিতাবিষ্কর্তা, আমার নিজের আবিষ্কৃত ঘনমূল নির্ণয়ের পদ্ধতিটি বিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক গণিতে অর্ন্তভুক্ত আর পাঠ্য হয়ে গেছে, সেটি ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সব বিদ্যালয়ে পাঠ্য হবে।

Giacomo Balla-র *Dynamism of a Dog on a Leash* ছবিটি ১৯৮১-৮২-র সংযোগের নিকট কোনো কালে কেন স্মরণ করেছিলেন মৃদুল? এই শিল্পীকে বলা যেতে পারে গ্রাফিতি নামক মাধ্যমের প্রথম সফল প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ভয়াবহভাবে ফিউচারিস্ট বা ভবিষ্যবাদী। ইনি মুসোলিনির অন্তরঙ্গ পার্ষদ। কিন্তু এর সাধনা ছিল গতিময়তার চিত্রায়ন। 'গতি' এক এমন বাস্তবতা, যার কোনো বর্তমান নেই, বর্তমান না-থাকাটাই গতির অমোঘ নিয়তি। কোনো সনাতন চরৈবেতি মেনে নয়, তার কবিতাসমগ্রের মধ্যে দিয়ে মৃদুল যেন আনক্ষত্রপ্রসারিত এক ভবিতব্যের আহ্বানের অপেক্ষায় থাকা — আর শুধুমাত্র অপেক্ষায় না-থেকে সেদিকে সবেগে ধেয়ে যাওয়া কবি — এমনটাই মনে হল আমার।

উত্তরলেখ

যখন ভেটকি আমাদের কলেজে যাতায়াত করত, তখন কলেজের ছেলেমেয়েদের একটা বড়ো অংশ যে গানগুলো অনেকে মিলে প্রায়ই গাইত, তার মধ্যে একটা গান ছিল — 'চারটি নদীর গল্প শোনো'। লিরিকের একটা অংশে আছে — 'ভারতের গঙ্গা, চিনের ইয়াংসি, মিসিসিপি, ভিয়েতনামের মেকং'। *এভাবে কাঁদে না*-র *আরব্য উপন্যাস* কবিতাটি ওই ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে আমাকে এই আলোচনার সাহস যুগিয়েছে। আমার ধারণা *গোপনে হিংসার কথা বলি*-র *অহঙ্কার* আর *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-র *গ্রন্থের সমান ভাবি* — এ-দুটি কবিতায় মৃদুলের কাব্যতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা খুব স্পষ্ট — তাই ও-দুটি কবিতাকে এড়িয়ে গেছি। ওখানে মৃদুল যথেষ্ট মুখর — তাই বিরক্ত করিনি, যেমন ঢুকিনি *রান্নাঘর*-এও।

একটি অমরত্বের রূপকথা অথবা গূহ্য সাধন প্রণালী

অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়

প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো, এ লেখা লিখতে বসলে প্রস্তাবনা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়ে যাবে বলেই মনে হয়েছিল। একটি খসড়া সম্পূর্ণ করে আনার পরেও তাকে বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুন মুসাবিদা শুরু করতেই হয় এ কারণেই যে, মৃদুল দাশগুপ্ত সম্পর্কে এই প্রথম আমার কলম ধরা নয়। এর আগে ২০০৪ সালের মে মাসে *পরিকথা* পত্রিকার *বিশ শতকের বাংলা কবিতা* বিশেষ সংখ্যায় অনুরুদ্ধ হই এই কবির যেকোনো একটি কবিতার 'নিবিড় পাঠ' রচনার জন্য। সে-সময় তাঁর *জলপাইকাঠের এসরাজ* গ্রন্থভুক্ত *কলকাতা* কবিতাটি বেছে নিই এবং *ক্রমান্বয়ী ইতিহাস ও নির্ধারিত নন্দনসীমা* শীর্ষক একটি নিবন্ধ রচনার প্রয়াস নিই (প্রকাশিত হলে সে রচনা সম্পর্কে কোনো উচ্চ অথবা বাচ্য আমার কর্ণগোচর হয়নি। অবশ্য বাংলা কাব্যজগতে এমনটাই হওয়ার কথা।)। 'নিবিড়' অথবা 'পাঠ' কোনটা সে রচনার ক্ষেত্রে ডমিনেট করেছিল, জানা নেই, তবে, আজ আটবছর অতিক্রম করে যখন সে লেখার দিকে ফিরে তাকালাম, মনে হল মৃদুল দাশগুপ্তের প্রাথমিকপর্বের কবিকৃতি সম্পর্কে এই সময়ান্তরাল আমার পাঠকৃতিকে কোনোভাবেই বদলায়নি। সুতরাং বর্তমান রচনাটির মধ্যে যদি কেউ সেই রচনাটির ছায়া লক্ষ করেন, তাহলে কোনোভাবেই আত্ম-পূর্বানুবৃত্তির দোষ চাপিয়ে ক্যাওস সৃষ্টি করার মহড়া নেবেন না দয়া করে। কারণ, এবার গুরুদায়িত্ব, মৃদুল দাশগুপ্ত নামক ফেনোমেননটির সামগ্রিক কবিকৃতির এক সার্বিক আলোচনা।

এক্ষেত্রেও সমস্যা বর্তমান। 'সমগ্র' বিষয়টি এই সমস্যার মূলে। কতটাকে 'সমগ্র' বলা যায়, একজন জীবিত ও সক্রিয় কবির ক্ষেত্রে, তা কোনোভাবে কোনো নির্ধারণ-কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসাটাই দুরূহ, এবং সমস্যা যেখানে আরও বেশি, সেই বিন্দুটি কবি নিজে। মৃদুল এমনই একজন কবি, যাঁর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত, ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার সুবাদে এটুকু নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করেছি যে, বইমেলা প্রাঙ্গণে তাঁর প্রবেশমাত্রই কী পরিমাণ উল্লাস তরুণবয়স্কদের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে। এই হাভাতেবেলায় লবণাম্বু মিশ্রিত কবিতাবাজারে বহু প্রকার তন্বিতমালতালিবনরাজিনীলার সমারোহে এমন একজন কবি, যাঁর প্রথম দু-টি গ্রন্থ বাদ দিলে বাকি সব ক-টিই যাকে 'পপুলার পোয়েট্রি' বলে গণ্য করা যায়, তার সহস্র আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করে, তাঁকে নিয়ে এপ্রকার হিল্লোলতরঙ্গ বেশ সন্দেহজনক ঠেকে। মৃদুলের প্রথম গ্রন্থ *জলপাইকাঠের এসরাজ* এবং দ্বিতীয় বই *এভাবে কাঁদে না*-র স্পেল কি আজও কার্যকর, নাকি, এসবের পরবর্তী কবিতাপ্রয়াসের পাকে-পাকে বিজড়িত বিমূর্তি ও পরিচিত রসায়ন-সূত্রহীনতাই তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ, এ ভাবনা অবশ্যই বর্তমান রচনাটিকে তাড়িত করবে।

এ রচনায় যদি কেউ সাহিত্য সমালোচনার গন্ধ পান, তবে ধরে নিতে হবে তিনি বেপথু। মৃদুল দাশগুপ্ত নামক এক সময়বুদ্বুদকে বোঝা ও জানার প্রয়াসই এ রচনার উপজীব্য। এখানে মৃদুলের ব্যক্তিগত সময় এবং তাঁকে ঘিরে থাকা রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংসারিক বৃহৎ সময়ের টানাপোড়েনটুকুই বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে তাঁর কাব্যজিজ্ঞাসা অন্য কোনো সময়মাত্রার দিকে ইঙ্গিত করে কিনা, সেই বিষয়টি অনুধাবনেরও প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। এ রচনার মধ্যে সর্বদা যে ইতিবাচক বা স্তুতিবাচক ইডিয়ম থাকবে, এমনটা ধরে নেওয়াও সমীচীন নয়। বরং এ রচনাকে এক খোলামাঠ বলে ভাবা যেতে পারে, চোরাগলি বলেও ভাবা যেতে পারে। সে ভাবনার দায় এ মুসাবিদার পাঠকের, লেখকের কদাচ নয়।

মৃদুল ও তাঁর কাব্যনন্দন সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী রচনাটিতে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, তাঁর কাব্যের, অর্থাৎ *জলপাইকাঠের এসরাজ* নামক গ্রন্থটির স্ফুরণ, জারণ এবং নন্দন এক বিশেষ সময়ের গর্ভজাত। এই বিশেষ সময়টি সত্তর দশক। যাকে বঙ্গেতিহাসে 'মুক্তির দশক' বলে চিহ্নিত করে আজও আনন্দ-উদগার তোলেন এক বড়ো সংখ্যক মানুষ। সত্তরের কবিদের সামগ্রিক প্রবণতা এই তথাকথিত 'মুক্তি'-কে সত্যিই ব্যক্ত করে কিনা, এবং মৃদুল তার মধ্যে বিরাজ করেন কিনা, সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন বলেই মনে করি। *জলপাইকাঠের এসরাজ* গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৭০-১৯৭৯। ধরা যেতে পারে, একটা গোটা দশক এই গ্রন্থে নিহিত হয়ে রয়েছে। এই গ্রন্থ মৃদুলের সেই সময়কার ভাবাদর্শ ও বাস্তবতার, স্বপ্ন ও প্রতিরোধের, সময়-সংবেদ ও কারুদক্ষতার এক জটিল সমাহার।

> আকাশ কালো ঈগল পাখা, এবং নদী তুমুল তিস্তা
> পথ টেনেছে ভুচুস্বকে, এল্ পার্টিডো কমিউনিস্তা

উপরের উদ্ধৃতিটি এই মুহূর্তে যেসব পাঠকের স্মৃতি উদ্বেল করতে পারে, তাঁরা হয় সত্তরের কঠিনতম দিনগুলি সশরীরে পেরিয়ে এসেছেন, না-হয় দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকে ঘটে যাওয়া ছাত্র-যুব বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন, অথবা একান্ত তরুণ কেউ, যাঁদের স্মৃতিরেখায় চুঁইয়ে নেমেছে উত্তাল সত্তরের অসমাপ্ত বিপ্লবের কথা ও অতিকথা। এর বাইরে এর নন্দনকে ছুঁতে পারেন কি এই সময়ের তরুণেরা? যদি পারেন, তবে স্পর্শ করেন এই পঙক্তিগুলো দিয়েই —

> সাতটি ভাইয়ের বুকের জবা আজ চম্পার মিশলো চোখে
> চৈত্র আসে রক্তদ্রোণের, পলাশ শিমুল আর অশোকের;

অথবা

> তারা ঘুমায়, বুকের ক্ষতে এদেশ ভারতবর্ষ আঁকা
> জাগে হাজার, জানে কোথায় রাক্ষস-প্রাণ-ভ্রমর রাখা;

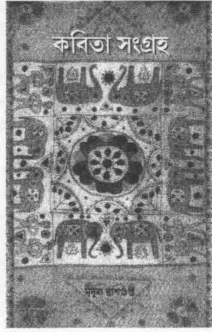
অথবা

> একটি মশাল ঘুরতে ঘুরতে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সহস্রকে
> চৈত্র আসে রক্তদ্রোণের, পলাশ শিমুল আর অশোকের।

কমিউনিস্ট পার্টি, রক্তদ্রোণ, পলাশ, শিমুল, অশোকের রক্তিমতার সোজাসাপটা প্রতীক যদি আজ, এই উত্তর-নন্দীগ্রাম পর্বের পশ্চিমবঙ্গে, কোনো দ্যোতনা না-ও বহন করে, তবু অস্বীকার করা যাবে না এর অন্তর্নিহিত 'vigour'-কে। এই প্রাণোচ্ছলতা যদি বিপ্লবের না-ও হয়ে থাকে, এর অস্তিত্বে কোথাও একটা সর্বজনীনতা আছে। এই সর্বজনীনতা চিরায়ত রোম্যান্টিকতা। মৃদুলের গোড়ার পর্বে এই রোম্যান্টিকতারই জয়জয়কার ছিল। এখানে সহৃদয় পাঠক প্রশ্ন তুলতেই পারেন, সত্তরের কোন কবির রচনায় এই 'মরা গাঙে জোয়ার'-এর উচ্চারণ ছিল না? প্রশ্ন উঠতেই পারে, কবিতার সীমিত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে গদ্য-গল্প-উপন্যাস, চিত্রকলা, সিনেমা — কোথায় ছিল না এই 'vigour'? বৃহত্তর ভারতবর্ষ যদি নকশালপন্থী আন্দোলনে না-ও দুলে থাকে, তবু একথা অস্বীকার করা যাবে না, সত্তরের জনপ্রিয়তম সংস্কৃতির আনাচ-কানাচও আন্দোলিত ছিল ওই রোম্যান্টিকতায়। মৃদুল কখনোই এখানে ব্যতিক্রম নন।

পরিকথা-এ প্রকাশিত আমার নিবন্ধে দেখাতে চেয়েছিলাম, মৃদুলের প্রাথমিকপর্বের কাব্যচর্চা এবং সমকালীন জনপ্রিয় ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে একটা নিবিড় সেতুবন্ধ ছিল (এই সেতুবন্ধ একা মৃদুলের নয়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বালি ও তরমুজ*, গৌতম চৌধুরীর *কলম্বাসের জাহাজ* ইত্যাদির মধ্যেও বর্তমান ছিল)। বাংলা কবিতার আঁতেল পাঠক যদি আজ উচ্চনাসা আরও উচ্চে তুলে এই সেতুময়তাকে অস্বীকার করেন, তাহলে তা হবে ইতিহাসকে অস্বীকারের শামিল। জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার ইডিয়ম থেকে মুক্ত ছিল না বাংলা কবিতা। রঞ্জি, রাধা, জ্যোতি-র অন্ধকারে ডুবে সত্তরের দর্শক যে নন্দনকে লাভ করেছেন *দিওয়ার*-এ, *জঞ্জির*-এ, সেই নন্দনের উলটো পিঠই ছিল *আগামী, একজন ভারতীয় নিগ্রোর কবিতা, কলকাতা* ইত্যাদির মধ্যে। এক বিদ্বিষ্ট পরিস্থিতি। সেখানে এক আগন্তুকপ্রতিম প্রবেশ এবং সেই পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিস্পর্ধা জানানো — একরৈখিক প্রগতিতে যেন অনুসৃত হয়েছে এইসব কবিতার নন্দন। 'আমি রেগে গেলে ভোরের আকাশে / লেপে দেবো আলকাতরা' — পঙক্তিটির ঠিক আগে মৃদুল





লিখেছিলেন — 'ছুরি দিয়ে, সব শাল গাছে গাছে / লিখে দিই এই ইচ্ছে', এই লিখনের চরিত্র ছিল 'ভুল ছন্দে মাত্রায়'। এইসব খোদিত অভিজ্ঞানকে অন্যভাবে, অন্য মোড়কে কি পাওয়া যায়নি *দিওয়ার*-এর নায়কের হাতে ছুরি দিয়ে লিখে দেওয়া অপমানচিহ্নের মধ্যে, *জঞ্জির*-এর স্বপ্ন-প্রত্নলেখয় ঝনকে ওঠা শিকলচিহ্নের মধ্যে?

একটা সুবিশাল লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড স্টোরি। মহাভারতীয় পরিসর। কর্ণের মিথ বারবার পুনরুৎপাদিত শিল্পে, সাহিত্যে। কী এর প্রেক্ষিত, কী এর প্রণোদন, তা জানার জন্য বিস্তারিত লিখেছেন আশিস নন্দী তাঁর *An Ambiguous Journey to the City* গ্রন্থে। আরও সাম্প্রতিক সময়ে এই মহাকাহিনির ভিন্নতর যবনিকা উত্তোলন করেছেন বিনয় লাল তাঁর *Deewaar: The Footpath, the City, and the Angry Young Man* বইতে। নন্দী অথবা লাল উভয়েই একমত যে, সত্তরের এই অভিজ্ঞানঋদ্ধ অভিযাত্রা মহাভারতীয় — মহাকাব্যিক। এই মহাকাব্যেরই একটা অংশ যদি রচিত হয়ে থাকে যশ চোপড়ার ১৯৭৫-এর ছবি *দিওয়ার*-এ, তাহলে তার অন্য অংশ সম্পূর্ণ অন্য পরিসরে রচনা করছিলেন মৃদুল দাশগুপ্তর মতো কবিরাও।

যদি এই সব গবেষণার আলোকে মৃদুলের প্রাথমিক কবিকৃতিকে দেখা যায়, তো বোঝা যাবে যে, *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর প্রোটাগনিস্ট, *দিওয়ার*-এর অমিতাভ বচ্চন এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বয়ানে রূপায়িত কর্ণ — এদের মধ্যে এক নিবিড় আত্মীয়তা বিদ্যমান। রাধেয়-অধিরথসুত পরিচয় নিয়ে কর্ণের যাত্রারম্ভ, হস্তিনাপুরের যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যেমন মিলে যায় গ্রাম থেকে উচ্ছিন্ন নায়কের (*দিওয়ার*) শহর অভিযান ও প্রতিকূলতা প্রতিরোধের সঙ্গে, তেমনই কি এই বয়ান সাযুজ্য রাখে না *কলকাতা* কবিতার হারান সাপুই-এর সঙ্গেও? যে হারান তার কানা চোখ, নুলো হাত নিয়েও প্রতিরোধের ডাক দেয় কলকাতাকে। মৃদুলের *কবিতা সংগ্রহ* গ্রন্থের শেষ মলাটে উৎকীর্ণ গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতিটি এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।

এই 'কবি পরিচিতি'-র বয়ানটিকে একটু দেখা যাক —

> সত্তর দশকের এক সদ্যতরুণ মফস্বল শহর শ্রীরামপুর থেকে চকিতে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি'। ...ইতিহাস তাঁকেই গ্রহণ করে, যিনি নিজেও ইতিহাসকে গ্রহণ করতে জানেন। ...মৃদুল ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন...

দু-টি বিষয় এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, 'মফস্বল শহর', এবং দ্বিতীয়ত 'ইতিহাস'। কোনো সন্দেহ নেই, মৃদুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থটি, যাকে 'ইতিহাস' বলে সাধারণভাবে বোঝা হয়, তার সঙ্গে সংলাপঋদ্ধ। কিন্তু সমস্যা প্রথম বিষয়, অর্থাৎ 'মফস্বল'-কে ঘিরেই। প্রশ্ন জাগে — মৃদুলের এই 'মফস্বল' আত্মপরিচয়টি কি তাঁর 'জার্নি'-কেই সূচিত করে? মফস্‌সল শহর শ্রীরামপুর থেকে আরব গেরিলাদের সমর্থন জানানো কি কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা? যদি সেই সত্তর দশকে ব্যাপারটি ব্যতিক্রম বলে মনে হয়ে থাকে, তবে তার পিছনে কোন রসায়ন কাজ করেছিল? রসায়নটি একান্তভাবেই সামাজিক বলে মনে হয় এতদিন পরে। সত্তরের ওই সময় শিল্প-সাহিত্যে যেভাবে সমকাল তার ছায়া বিস্তার করেছিল, পরবর্তীকালে আর সেরকমটা দেখা যায়নি। বিনয় লাল তাঁর *দিওয়ার* সংক্রান্ত গবেষণায় সানুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছেন যে, সেই ছবি, বা তার নায়ক, এক বিশেষ সময়ের ফসল, যে সময়ে নেহরুর ভারত গড়ার স্বপ্ন উদ্বায়িত, বেকারত্বের চাপ বাড়ছে, বাড়ছে গ্রাম থেকে শহরে আগন্তুকের সংখ্যাও। এই আগন্তুকত্বের মধ্যে রয়েছে আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের তাগিদ। শিকড়ের সন্ধান নয়; নতুন পরিবেশে, নতুন পরিস্থিতিতে সবাই এখানে খুঁজে পেতে চাইছেন নতুন আত্মপরিচয়। আশিস নন্দী বিষয়টির সঙ্গে তুলনা এনেছেন *মহাভারত*-এর। এক অবস্কিওর অতীত নিয়ে কর্ণের হস্তিনাপুর আগমন এবং সেখানে ক্রমে 'অঙ্গরাজ' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার পিছনে কাজ করেছিল এক নতুন আত্মপরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষা। রাধেয়-অধিরথসুত এক গ্রাম্য যুবকের নাগরিক হয়ে ওঠার পিছনে কাজ করছে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডের চিরায়ত গল্প। মফস্‌সল শ্রীরামপুর থেকে মৃদুলের কবিতার প্রোটাগনিস্ট যদি 'হুই কলকাতা' বলে চেঁচিয়ে মানুষ ডাকে? তবে ধরে নিতে হবে সেই ডাক প্রতিকূল নগরালিকে প্রতিস্পর্ধা জানানোর সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে খুঁজে পাওয়ারও ডাক। ঘোলাজল, হেতালের গরাণের বন সহ কংক্রিটের শহরে নিজেকে প্রোথিত-প্রতিষ্ঠিত করার ঘোষণা। এই ঘোষণার সঙ্গে যদি এসে মেশে এল্ পার্টিডো কমিউনিস্তা অথবা বিপ্লবের ইডিয়মস্, তাহলে সেগুলো কবচ ও কুণ্ডলের মতোই অভিজ্ঞানচিহ্ন, সময়ের, 'ইতিহাস'-এর।

জলপাইকাঠের এসরাজ থেকে এভাবে কাঁদে না — মৃদুল 'ইতিহাস'-এর ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে চাননি। নিজেকে স্থিত রেখেছেন এমন কাব্যভাষায়, যাকে 'সামাজিক' বলেই চিহ্নিত করা যায়। প্রথম বইতে দু-রকম বয়ান বারবার ফিরে এসেছিল — ডিসটোপিক এক জগতের এবং হুংকারে প্রতিস্পর্ধা জ্ঞাপনের। ডিসটোপিয়ার এই উদাহরণ অন্যভাবে অন্য চেহারায় পাওয়া যাবে জয় গোস্বামীর *প্রত্নজীব* বা *আলেয়া হ্রদ*-এ। প্রতিস্পর্ধার চমৎকার উচ্চারণ ছড়িয়ে রয়েছে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বালি ও তরমুজ*-এ। এমন বলতে চাইছি না যে, মৃদুল এই দুই বয়ানকে একত্র করেছিলেন। তবে, এটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, স্বপ্নভঙ্গ (মৃদুল তার সঙ্গে জুড়ে নিয়েছেন তাঁর নিজস্ব 'ইতিহাস' দর্শন) এবং প্রতিস্পর্ধা জ্ঞাপন (যেখানে রয়েছে ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত অঙ্গীকার) একই মুদ্রার দুইদিক। মৃদুল এই দুইকে নিয়ে এসেছিলেন দুই মলাটের মধ্যে।

মূলধারার ভারতীয় ছবিতে 'কর্ণ' চরিত্রের বারংবার পুনরুৎপাদন ও পুনরূপস্থাপনের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের এই যুগপৎ সহাবস্থানটিও বারংবার লক্ষ্যণীয়। কিন্তু 'ভবিষ্যৎ' ব্যাপারটা কখনোই খুব শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নেই এইসব শিল্পে। এর কারণ অবশ্যই 'কর্ণ' চরিত্রের ট্র্যাজিক উপসংহারকে সম্পন্ন করে তোলার জন্যই হোক, অথবা সমসময় থেকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাতে অনচ্ছতা থাকার দরুনই হোক, এল্ পার্টিডো কমিউনিস্তার সমর্থক যখন আরব গেরিলাদের সমর্থন করে বসেন, তখন ধরে নিতেই হবে যে, তিনি মূলত একজন স্বপ্নদর্শক, রাজনৈতিক ইডিওলজির দাস নন, এক মুক্ত ভ্রমণকারী, যাঁর রথের চাকা মাটিতে বসে গেলে তিনি যেমন মৃত্যুকে চুপচাপ মেনে নিতে জানেন, তেমনই জানেন, এমন এক অমরত্বের সন্ধান, যা মহিমাময় নয়, যার মধ্যে আত্মপ্রচার নেই।

এখান থেকে মৃদুলের যাত্রাপথটিকে যদি দেখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে যে, সত্তরের টিপিক্যাল আদিপ্রতিমাটিকে মৃদুল গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয় বইতেই। *এভাবে কাঁদে না* কি আসলে এক প্রলম্বিত মৃত্যুসন্দর্ভ যেখানে 'মৃত্যু'-র অছিলায় কবি প্রবেশ করছিলেন এক ধূসর ও ছায়াচ্ছন্ন অমরত্বের জগতে?

(ক) জ্যোতিপ্রকাশের মৃত্যু মনে রাখো, তুমি?

মুঠোর বোতাম আজ অন্য শার্টে সেলাই করেছো

বিবাহ

(খ) শাদা ও হলুদ চর্বি থাকে থাকে শ্যাওলা সাজানো
বাইরে মৃত্যুকে ছুঁয়ে শ্বাস নিই...

তিমি

এইসব পঙ্ক্তির গভীরে সম্ভবত কাজ করছিল *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এরই অন্য একটি কবিতা — 'আছি বাতাসের মতো, ও আমার মিষ্টি মা-মণি / আছি তোমার দুচোখে আজও কঠিন শীতল / মানো না যে মরে গেছি, বোকা মেয়ে, এখনও মানোনি / তাই জেগে বসে থাকো, ভাবো এলো পলাশের দল'। এরপর এক অশরীরী অভিমানে ছেয়ে যায় জগৎ। যে জগতে ভাষার অন্দরমহল আর খুব বেশি ঘনসংবদ্ধ থাকে না, বরং কিছুটা প্রলাপ-ভঙ্গিমায় উৎসৃত হয় এক-একটা সম্পূর্ণ কাব্য। কিন্তু, পরবর্তী উচ্চারণটির সঙ্গে যার পারম্পর্যরক্ষার কোনো দায় নেই।

দুদিকে কামড় লাগা যে ফল, কখনও তা গড়িয়ে যাবে না

পিছনের পথে আজ মোরগের পালক ছড়ানো

বলোনি স্বামীকে তবু ওষুধ খেয়েছো, কিন্তু শোনো —

এতোদিন পরে কেউ এভাবে কাঁদে না।

এই প্রলাপ অবশ্যই কোনো জ্বরগ্রস্তের নয়, বরং এই প্রলাপ এক ঝিমিয়ে আসা সত্তার। যেন তীব্র নেশা থেকে বেরিয়ে আসার উইথড্রয়াল। গোটা *এভাবে কাঁদে না* জুড়েই রয়েছে এক খাঁ-খাঁ শূন্যতা। মুখে জল কাটছে, বুকের খাঁচায় পাখির ঝাপট যেন ম্রিয়মান, দু-চোখ ভরে নেমে আসছে ঘুম। উচ্চারণে মৃদুল এখানে অসম্ভব নরম। অসম্ভব সাবলীল। এক স্বপ্নিল ইনারশিয়ায় যেন লিখিত হচ্ছে গ্রন্থটি। যেন এক নিরালা মুনওয়াক। ভয় নেই, ফেরার তাগিদ নেই। অথবা এমনও হতে পারে, এই বই ছিল এক সন্ন্যাসের প্রস্তুতি। এরপরের পর্বে যা প্রধান ভূমিকা নেবে মৃদুলের রচনায়।

(ক) ...যাই ভবিষ্যতে। কিন্তু আগে মধুর আদেশ শোনো :
এই... এই, এমন সন্তান দিও যেন পারি অস্ত যেতে

প্রেমিকা

(খ) বাঁচি বলে ব'লে যাই, একদিন ভাসবো না ভাসাবো না এই ভাষা
পড়ে নিতে নাম নাও টুকে

তিমি

এইসব পঙ্ক্তিকেই সেই সন্ন্যাসের প্রস্তুতি বলে বোধহয়, যে সন্ন্যাস 'কর্ণ' চরিত্রের পরিণতি হলেও হতে পারত। কর্ণের ট্র্যাজিক পরিণতি সেই সন্ন্যাসকে সম্ভব করে তোলেনি। বরং সেই সন্ন্যাস নেমে এসেছিল আর এক অভিযাত্রীর জীবনে। তিনি অশ্বত্থামা। তিনি এমনই এক যোদ্ধা, যাঁর বীরত্বের স্বীকৃতি থেকেও নেই। গোটা মহাকাব্যেই তাঁর ভূমিকা আগন্তুকের। কৃতকর্মের চাপ তাঁকে তাঁর অমরত্বেও স্বস্তি দেয়নি। তিনি আছেন, বাতাসের মতো। তাঁর অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠার কোনো পরিণতি নেই। মৃদুলের যাত্রারেখা 'কর্ণত্ব' থেকে 'অশ্বত্থামাত্ব'-এ বাঁক নিয়েছিল *এভাবে কাঁদে না*-তে। এবং এর পরবর্তী গ্রন্থ *গোপনে হিংসার কথা বলি*-র বিভাব কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য — 'ছুটছে শিকারি আজও শিকারের পিছনে পিছনে / পিঠের তূণীর গেছে খসে...'। অস্ত্রের গৌরবহীন, একার এই দৌড় কি শিরোরত্নহীন এক অভিশপ্ত অ-মৃতের জবানবন্দি? এই গ্রন্থটিতে মৃদুল ভাষাগতভাবে যেন এক নবতর নিরীক্ষায় রত হচ্ছেন। *এভাবে কাঁদে না*-র চাইতেও সম্পর্কহীন, বন্ধনহীন বাক্যপরম্পরা। ইমেজের পর ইমেজ নির্মাণ, অথচ কোথাও দু-দণ্ড থামার অবকাশ নেই, নিরলসভাবে হেঁটে চলা গন্তব্যের দিকে, যদিও 'গন্তব্য' বলে স্পষ্ট কোনো কিছুকেই বোঝা যায় না এই পর্বে। এ পর্বের বেশ কিছু কবিতায় এসেছে চিঠির প্রসঙ্গ ['একটা পোস্টকার্ড পারে জীবনের মানে বদলে দিতে' (*দূরত্ব*), '...ক্রমে অনর্গল চিঠিপত্রে ঢেকে যাবো আমি' (*অহঙ্কার*), 'তর্জমার অতীত সেই বৃষ্টিভেজা, চিঠি' (*যোগাযোগ*)]। 'চিঠি' — যা আসে অতীত থেকে। 'অতীত' এখানে আত্মন-বিচ্ছিন্ন কিছু কি? ভূতপূর্ব আত্মপরিচয়ই কি আসে 'চিঠি'-র চেহারা নিয়ে? এইসব সন্দেহ যখন ঘন হতে থাকে, তখনই আশ্চর্যজনকভাবে এই পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। *গোপনে হিংসার কথা বলি* পড়তে-পড়তে শেষ যে দু-টি পঙ্ক্তিতে গিয়ে পাঠ থমকে যায়, তা হল — 'তার দেশ বিবর্ণ, অতীত / অশ্রুর ওপরে সে সাঁকো' (*বিষ*)। 'বিবর্ণ' ও 'অতীত' দেশটিকে কেউ অতিক্রম করছে, অতিক্রমের পথ এক সাঁকো, যে সাঁকো আসলে সে নিজেই। এক অত্যন্ত জটিল ছবি ফেলে রেখে মৃদুল এরপরেই প্রবেশ করবেন এমন এক পর্বে, যার সঙ্গে তাঁর পূর্বতন কবিকৃতির প্রায় কোনো যোগাযোগ নেই বললেই চলে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, এই দু-টি চরণই সেই সন্ন্যাসের মুহূর্ত, সেই বিরজা হোম, যেখানে বিসর্জন দিতে হয় যাবতীয় কিছুকে, এমনকী শরীরও? যদিও শরীর পড়ে থাকে 'সাঁকো' হয়ে, অতীতের সঙ্গে যোগবাহী হয়ে।

এরপরের পর্বটি *রান্নাঘর*। এই পর্বটি একদিক থেকে দেখলে মৃদুলের এক নতুন ভূমিতে প্রবেশবিন্দু। 'ভূমি' কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হবে না এক্ষেত্রে। বরং বলা ভালো, এরপর থেকে যাকে 'ভূমি' বা 'মৃত্তিকা' বলে সাধারণভাবে বোঝানো হয়, মৃদুল ত্যাগ করছেন তাকে, এবং শুরু হচ্ছে তাঁর এক মহাজাগতিক ভ্রমণ।

(ক) সূর্য ও আগামীকাল সমার্থক। সেই সূত্রে
আমি এই সৌরপৃথিবীর ডাল ভাত ফুটিয়ে দিচ্ছি —

অন্ন

(খ) মহাকাশে কিছু নেই? প্রতিবেশীদের আলো
হঠাৎ কখনো লাগে, স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে, বিন্দু ঘামে রোহিনী, কৃত্তিকা;

তাপ

(গ) মহামানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ে রান্নাঘরে, একটু কাঠের জন্য
মহাকাশে জঙ্গল বানাই।

সংসার

(ঘ) আবার অনন্তকাল শুরু হলো এইমাত্র, তুমি ফের জল হয়ে গেছো।

জল

(ঙ) সূর্যের ঘড়িতে দাগ মশলার। সুষুপ্তির তল থেকে তুলে আনা
মাংসের করুণা প্রস্তুত।

প্রীতিভোজ

এইসব পঙ্ক্তি পড়তে-পড়তে মনে হতে পারে, মৃদুল সম্পূর্ণরূপে এক ভিন্নতর রূপান্তরে নবীকৃত। 'হিন্দুর বিবেকে... গোমাংসের ভাব এনে বর্ণোদ্ধার' — এভাবেই বর্ণনা রেখেছেন মৃদুল, যা তাঁর মতে 'ক্ষুধা'। এই ক্ষুধা আন্তরিক এবং এ ক্ষুধার অবসান যে পাকক্রিয়ায়, তার ঋত্বিক তিনি নিজেই। পাকক্রিয়ার চরিত্রও অত্যন্ত জটিল। একটি স্তরে মনে হতে পারে এই পাকক্রিয়া গ্রহ-তারকার অতীত মহাশূন্যে পরমের নিজস্ব রান্নাঘরের। কিন্তু অসংখ্য 'ট্রিভিয়া' একে জাগতিকতার সঙ্গে বেঁধে রাখছে অনর্গল। একটু আগে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিগুলিকে স্মরণে রেখে যদি এগুলিকে দেখা যায়, তো বোঝা যাবে সে-কথা —

(ক) ভোর ভোর অল্প আঁচে পাত্র বসিয়েছি / হাওয়া দিই। / শেয়াল তাড়াই। / তবু, নিন্দা রটে। (*আঁচ*)

(খ) উনুনের পাশে ঘুমে হয়তো বা শ্রোতাদের ঘন্টা বেজে যাবে... (*অতিথি*)

(গ) বসেছে বন্ধুরা, তারা উল্টো পায়ে এসেছে এখানে। / অর্ধেক দিনের নাচে অন্য জামা সরু প্যান্ট নিরপেক্ষ আজ। (*বনভোজন*)

(ঘ) আমিও পাতার আঠা পা-ফোলা বামন ঠিক ফাঁক বুঝে / মিনিবাসে রাত্তিরে ঘুমোবো। (*প্রীতিভোজ*)

শেয়াল তাড়ানো, ঘন্টা বাজা, অন্য জামা সরুপ্যান্ট, মিনিবাসে ঘুমোনো ইত্যাদি গল্পগুলিই কি সেই সাঁকো, যাকে অতিক্রম করেছিলেন মৃদুল? অথচ এরা অতিক্রান্ত হয়েও থেকে যায়। এরা মনে হয় সেই ক্ষত, যা শ্রীকৃষ্ণ-অভিসম্পাতে অশ্বত্থামার গায়ে স্থায়ী হয়েছিল। এরা সেই সব অভিজ্ঞানচিহ্ন, যা অসমাপ্ত বিপ্লব থেকে জাত রক্তস্নানের কথা বলে, যা বস্তুত গোপন ও হিংসার, যাকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বত্থামা-অমরত্ব হেঁটে যায় যুগান্তের দিকে। শিরোরত্ন হারানোয় তার চারপাশে নৃত্যপর হয়ে ওঠে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক। এ নাচ শুধু 'ড্যান্স অফ ডেথ' মাত্র নয়। এ নাচে যূথবদ্ধ জীবন ও মৃত্যু, মৃত্যুত্তীর্ণ মহাজগৎ ও তদূর্ধ্ব অতিকল্পনা। কোনো মানবিক ভাষায় একে বাঁধা সম্ভব নয়, মৃদুল জানতেন। আর, জানতেন বলেই এক চূড়ান্ত বিমূর্তির আশ্রয়ে নিয়ে যান কবিতাকে। *রান্নাঘর*-এর অন্তিম কবিতাটি আকারে দীর্ঘ। এ কবিতার (*সংঘ*) মধ্যে মৃদুল নিহিত রেখেছেন তাঁর অনন্ত যাত্রার সূত্রকে (এ কবিতা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে)। ক্রমাগত রূপান্তর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে যায় পাঠককে, কোনো সরল 'ইতিহাস'-কে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বারবার ছবি গড়ে ওঠে, ছবি ভেঙে যায়। অনভ্যস্ত পাঠকের পক্ষে এ কবিতা বিড়ম্বনা। কিন্তু, যদি অভ্যাসে আনা যায় এর পাঠকে, তাহলে হয়তো সন্ধান মিলতে পারে পাঠকেরও উত্তরণের। কিন্তু বঙ্গীয় পরিসরে সেরকম পাঠকও কি সুলভ? *সংঘ* কবিতাটি পড়তে-পড়তে মনে হতে পারে, মৃদুলের যে সেলিব্রেশন দু-বঙ্গেই চলিত রয়েছে, তা কি তাঁর এইসব কবিতা সম্যক পাঠের ফলে জাত? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে কোথাও সেভাবে এ নিয়ে কোনো আলোচনা গোচরে আসে না কেন? নাকি, এক আলো-আঁধারির মধ্যেই পাঠক দেখছেন মৃদুলকে? মৃদুলের কাব্যের সৌন্দর্য ও রহস্যময়তাতেই নির্বাপিত হচ্ছে পাঠকৃতি? এবং এই নির্বাপণেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাঁর কবিতার নন্দন। সেলিব্রেটেড অথচ অনালোচিত কবির ক্ষেত্রে এই বিড়ম্বনা অনিবার্য। দুঃখের বিষয় মৃদুলের ক্ষেত্রে, সত্য হলেও, ব্যাপারটা ঘটমান।

পরবর্তী গ্রন্থ *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-তে *রান্নাঘর* অব্যাহত থেকেছে। *আরও রান্নাঘর* উপনামে বিধৃত হয়েছে এই বই-এর কবিতা। বিষয়-বৈচিত্র্য বেড়েছে এখানে, পাককক্ষের ব্যাপ্তিও ঘটে গিয়েছে সঙ্গে-সঙ্গে, 'নিখিলের এককণা পেয়েছি রান্নায় ধ'রে আকাশছাদের' (*রান্নায় এককণা*), অথবা 'নক্ষত্রে রচিত এই সন্ধ্যাভাষা পাঠোদ্ধার ক'রে / লিখলাম সংখ্যার মধ্যে শূন্য, আর শূন্যের ভিতরে যতো খাবার দাবার।' (*সন্ধ্যাভাষা*) — এইসব পঙ্‌ক্তি জানিয়ে দেয় কবির পরিক্রমা অব্যাহত। এই পর্যায়ে এসে এক অন্য চিহ্ন উঁকি দেয়। মাঝে-মাঝে মনে হয়, ঘোষিত নিরীশ্বরবাদী মৃদুল কি *রান্নাঘর* পেরিয়ে *আরও রান্নাঘর*-এ এসে তটস্থ? মহাজাগতিক কোনো পাকপ্রণালীর সন্ধান এখানে স্পষ্ট। এই রন্ধনকার্যে মুহুর্মুহু রূপান্তর — 'কেবলই উন্মেষবাক্য, মুহূর্তের বর্তমানে, তারপর নেই; / থাকে না শাশ্বতে স্বপ্ন, স্পন্দনে সাম্প্রতিকে নারীমূর্তি ধরে'। এ রূপান্তর পূর্ববর্তী পর্যায়ে ছিল, কিন্তু আগের পর্যায়ে মৃদুল যে জাগতিকতাকে ('ট্রিভিয়া') ব্যবহার করেছিলেন, ভাষাগতভাবে তার আমূল বদল ঘটে গিয়েছে। মৃদুল এই সিরিজে অতিরিক্ত মাত্রায় ধ্রুপদী। এই ক্ল্যাসিসিজমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে প্রেম। *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*, এক হিসেবে দেখলে আদ্যন্ত একটি দীর্ঘ প্রেমের কবিতা, যেখানে 'নারী' কোনো বিশেষ আধারে নিহিতা নয়, সে নৈর্ব্যক্তিক। এমনও মনে হতে পারে যে, সাংখ্যবর্ণিত পুরুষ তার নির্ধারিত অ-ক্রিয়ভাব ত্যাগ করে সন্ধান করছেন 'প্রকৃতি'-কে। প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে সদা চঞ্চলা, ক্রমাগত রূপ থেকে রূপান্তরে সে বিবর্তিত হতে থাকে। এ বিবর্তনও প্যাটার্নহীন। একটু দীর্ঘ সময় ধরে যদি পাঠ করা যায় এই গ্রন্থ, তবে এলএসডি বা ওই জাতীয় কিছু সাইকোডেলিক নেশার জগতের সন্ধান পাওয়াও অসম্ভব নয়। ধর্মাধর্মের জটিল বিন্যাস বারবার ফিরে এসেছে এই সব কবিতায় 'মোটিফ' হিসেবে। কিন্তু তারা আঁশের মতো, রক্ত ও মাংসে কোন রসায়ন ক্রিয়া ও বিক্রিয়ারত, তার হদিশ কোথাও রাখেননি মৃদুল। কখনো-কখনো মনে হতে পারে, এসব কবিতা নবতর সন্ধ্যাভাষায় লিখিত কোনো গুহ্য সাধনমার্গের নিভৃত আচারের বর্ণনা। 'শকটে নিদ্রিতা এক পুস্তিকার অপরূপ দেহস্পর্শ ক'রে / মৃদু তাপ টের পাই, বোধ করি সন্ধ্যা এই কিশোরীর একান্ত প্রচ্ছদ' (*পুস্তিকা*) — এই কল্পনাকে কী বলা যায়? সালভাদোর দালির ছবির সঙ্গে যদি আঁতাত ঘটে ওয়াল্ট ডিজনির (একবার সত্যিই ঘটেছিল!), তাহলে যে রস উৎপন্ন হয়, মৃদুল বোধহয় সেই রসের গূঢ় পাককে এনে ফেলেছেন হাতের মুঠোয়। এই পাকপ্রণালীর উপর মাস্টারি করার এক বিপদও অবশ্য আছে। এ কল্পনা (মহাকল্পনা)-সূত্র যদি আয়ত্তে আসে, তাহলে 'কবিতা' হিসেবে বিবেচিত শিল্পটির এস্তেকাল ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয় (বিনয় মজুমদারের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছিল বলে মনে করি)। কোনটি কবিতা আর কোনটি তার মহড়া — এ নির্ণয় করার জন্য কোনো স্পেস পাঠকের জন্য নির্ধারিত হয় না আর। মৃদুলের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেছে বলা যাবে না, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* থেকে মৃদুল আর পাঠকের তোয়াক্কা করেননি। তাঁর এই আচরণ কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে, জানি না। এবং আমার ব্যক্তিগত মত, তিনি বেশ করেছেন। জাল ও মেকি পাঠকৃতিতে আকীর্ণ বাংলা বাজারে এ এক অন্তর্ঘাত। যদি কেউ মনে করেন যে, এই পর্ব থেকে মৃদুল শুধুমাত্র রহস্য নির্মাণ করে সরে যাচ্ছেন, তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না। আবার এইসব কবিতাপ্রয়াসের এমন পাঠকৃতিও সম্ভব, যেখানে এই ক্রমাগত রূপান্তর পেয়ে যাওয়া রন্ধনক্রিয়ার মধ্যে পাঠকেরও উত্তরণ-অবতরণ ঘটে যেতে পারে। এইসব কবিতার কোনোরকম 'অর্থায়ন' সম্ভব নয়। আবার যেকোনো রকমেরই 'অর্থ' এগুলির থেকে নিঙড়ে বার করা যায়। এই সিদ্ধিতে পৌঁছোনো সহজ কথা নয়। বিশেষ করে, *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর মধ্যে নিহিত 'ইতিহাস' থেকে এই কায়হীন, অবয়বহীন, নিরালম্ব মহাশূন্যতায় পৌঁছোনোর কাহিনিটিকেই অধিবাস্তব বলে বোধ হতে পারে। সম্ভবত 'কর্ণ' থেকে 'অশ্বত্থামা'-র রূপান্তরই এর অন্তর্নিহিত ম্যাজিক (অ্যালকেমি)। এর বেশি ব্যাখ্যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এইসব রচনার কালে মৃদুল তাঁর চারুসিদ্ধ হাতে অবিশ্বাস্য সব ছড়া লিখেছেন, *কবিতা সহায়*-এর মতো গদ্য লিখেছেন, *ধানখেত থেকে*-র মতো গ্রন্থে রাজনৈতিক তাৎক্ষণিকতাকে কবিতায় রূপান্তর দিয়েছেন। সুতরাং, তিনি জাগতিকতা থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষতম বই *সোনার বুদ্বুদ*-এ এসেও মনে হয়, গোপনে, অতি গোপনে তিনি পেয়ে গিয়েছেন 'কবিতা' নামক শিল্পমস্করাটির অন্তর্নিহিত চোরাকুঠুরির চাবির সন্ধান। এই সন্ধান পেলে কবির স্বাধীনতা অবাধ দশায় উপনীত হয়। খণ্ডচিত্রের সঙ্গে খণ্ডচিত্র জুড়ে তৈরি

করা যায় রচনার অবয়ব। তাকে পূর্ণ অবয়ব বলা যায় না। সে যেন অর্ধেক ছায়ানির্মিত এক দেবতা। মুঠোর মধ্যে তাকে পেতে গেলে হাতে তাপ বা শীতলতা অনুভূত হয়, কিন্তু কিছুতেই তাকে মুঠোবন্দি করা যায় না।

'সোনার বুদ্বুদ আসে উড়ে উড়ে, কাছে দূরে কে বলে অস্ফুট!' — এইখান থেকে সোনার বুদ্বুদের এই উড়ান যদি ঝিনুকের ঢাকনা-খোলা ভাবনায় এসে 'টুপ' করে ডুবে যায়, তাহলে কী এসে যায় সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রামের? কী এসে যায় শপিংমল আর সাহিত্য অকাডেমির বারোয়ারি পঙ্‌ক্তিভোজনের? তাদের যেমন কিছু এসে যায় না, কবিরও কিছু যায়-আসে না। মৃদুল এই বইতে বলেছেন 'প্রায় কথা বলা'। এই বই জুড়ে থাকা কথা সকল 'প্রায় কথা'। এরা 'কথা'-র পূর্ণতায় নেই। যাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না।

পূর্ণতায় পৌঁছোনোর কোনো দায় থাকবে না নিবিষ্ট পাঠকেরও। মৃদুলের *কবিতা সংগ্রহ* ও *সোনার বুদ্বুদ* পাঠ করতে-করতে পাঠক এটুকু বোধে পৌঁছোবেন নিশ্চিতভাবে যে, একদা আরব গেরিলাদের সমর্থন জানানো মফস্সল-তরুণটি তাঁর পরিণতিতে পরিণামশূন্যতার দর্শনকে আয়ত্ত করেছেন। মৃদুলের নিরীশ্বর বিশ্বাসকে সেলাম জানিয়েও বলা যায়, এ সমস্ত কাব্যপ্রয়াসই আধ্যাত্মিক। অরূপও যে রূপেরই নামান্তর, আকার যে বস্তুত নিরাকার। ব্রহ্ম যে সর্বত্র খল্লিদ্বং হতে-হতে 'সর্বত্র'-কেই বিন্দুতে একীভূত করে পুনরায় ছিটকে দেয় ব্রহ্মাণ্ড নামক ডিমের খোলাটির ভিতরে, তা মৃদুল জেনে গিয়েছেন। এ-ও একপ্রকার ঈশ্বর-সাধনা। 'ঈশ্বর' নামটি না-ই বা থাকল। 'বিশাল', 'পরম', 'মহৎ' — ইত্যাদি যেকোনো নামেই তিনি সম্ভব হন এধরনের সাধনায়। এখানেও সেই অশ্বত্থামা-অমরত্বের কথাই মনে পড়ে। কেমন এই অমরত্ব? এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি এক অগ্রজ কবির রচনায় —

...ভেতরে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির, কিঞ্জলে স্থিত, নিত্য সেবা হয়।
রোগা কালো দীর্ঘকায় পূজারী দাঁড়িয়ে থাকে
গগনমণ্ডলে হাত রেখে।
কোটরের এত তলে চোখদুটো, যেন ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ,
গায়ের চামড়া পুরনো বাকল।
পূজারীর মাথায় জ্বলছে অহর্নিশ লাল বাতি,
বাদুলে পোকার ভিড়ে বাতি কষ্টে মাথা নাড়া দেয়।
সঙ্গে সঙ্গে সবুজ জঙ্গল চমকে লাল হয়ে
মুহূর্তে আবার যে কে সেই :
অশ্বত্থামা!

কালমাধবের অভিশাপে লক্ষ বছর ত্রিপুরাসুন্দরী অশ্বত্থামার
নিত্য সেবা পায়।
প্রতিমাঝরাতে নিজ হাতে বলি দেয়
একসঙ্গে পাঁচটি কিশোর কেন্দু গাছ।
গাছের শরীর থেকে নররক্ত :ঃ
তাতে ত্রিপুরাসুন্দরীর মধ্যযামিনীর স্নান।
দৃশ্যের আড়ালে অতীন্দ্রিয় কলরব।

রঞ্জিত সিংহ / *অভিশাপ : এক* / *নিয়ে চলো তিসিফুলের আশ্বিনে*

দৃশ্যের অন্তরালে অতীন্দ্রিয় কলরবকেই লিখছেন মৃদুল। একে দেখার চোখ সকলের থাকে না জেনেও লিখছেন। এদিক থেকে দেখলে বাংলা কবিতার এক নিভৃত সুসময় তাঁর হাতে সৃজিত হয়ে চলেছে সদাসর্বদা। এ অবশ্যই আমাদের সমসময়ের সৌভাগ্য। কিন্তু এহেন নিরবচ্ছিন্ন নিভৃতিতে যদি যুক্তবঙ্গের ভক্তহিল্লোল এসে তরঙ্গ তোলে, তখন ভয় হয়, যাকে নিভৃতি ভাবছি, তা সত্যিই নিভৃতি তো? নাকি, এসব কিছুরই অন্যতর পাঠ ঘটে চলেছে অন্যত্র, যাকে আমি স্পর্শ করতে পারছি না! অনির্দেশ্য এক বিন্দুতে নিয়ে যান মৃদুল। অনায়াসে। যখন-তখন। পাঠক হিসেবে বাধ্য হই সম্মোহিতের মতো তাঁর সঙ্গ নিতে। ভুলে যাই, কালমাধবের অভিশাপে তিনি ত্রিপুরাসুন্দরীর নিত্য সেবা করে চলেছেন কল্পান্ত পর্যন্ত। মন্ত্রমুগ্ধতায় টের পাই না কল্পান্তও কোনো 'অন্ত' কি না! অমরত্বের বল্কল গায়ে অশ্বত্থামা তাঁর গূঢ়াচার জারি রাখেন। মৃত্যু হয় না পাঠকেরও। কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়।

বিস্ফোরণ ছাড়া কোনও ঘটনা সম্ভব?

অভীক মজুমদার

তার ভাষা নিচু আগুনের

সরাসরি প্রশ্নটা তুলে দেওয়াই ভালো। এই যে পঙ্‌ক্তিটি মৃদুল দাশগুপ্তের *বাতাস গণনা করে* কবিতা থেকে উদ্ধৃত 'বিস্ফোরণ ছাড়া কোনও ঘটনা সম্ভব?' একে কি রাজনৈতিক এক বিবৃতি হিসেবে দেখা উচিত? উলটো করে বলা যায়, একে কি 'রাজনৈতিক' পঙ্‌ক্তি হিসেবেই পড়ব না আমরা? কবিতার মধ্যে 'রাজনীতি' কি শুধু দল, দলীয়তা আর দলতান্ত্রিক স্লোগান-কর্মসূচি-র প্রতিফলন? নাকি কবিতার 'রাজনীতি' অনেক বড়ো বিষয়? অনেক বিস্তৃত তার পরিসর?

মধ্যকৈশোরে একটি কবিতার কয়েকলাইন রোমাঞ্চিত করেছিল।

আমি বাখরগঞ্জ, গৈলাগ্রামের, আমার পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশে
লিখেছিলেন মনসামঙ্গল,
গরল আমি ডরাই না হে
বিষে আমি ভয় পাই না
আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি

আত্মকথন, মনসামঙ্গল, মৃদুল দাশগুপ্ত পেরিয়ে হঠাৎ কীভাবে ঢুকে পড়তে পারেন কোনো কবি 'আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি' এই ঘোষণায়, রোমাঞ্চ ছিল সেটাই। সনাতন কোনো কাব্যতাত্ত্বিক আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, এই পঙ্‌ক্তির মাধ্যমেই মৃদুল হয়ে ওঠেন 'রাজনৈতিক' কবি। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসটি যখন *প্রতিক্ষণ*-এ প্রকাশিত হয়, সেই শারদীয় মুদ্রণের শেষে মৃদুল দাশগুপ্তের প্রতি একটি স্বীকৃতিবাক্য ছিল। পরে, গ্রন্থাকারে বা আরও পরে, সংকলনে, সেই স্বীকৃতিবাক্যটি নেই। জানি না, সন্দীপন নিজে নাকি প্রকাশক, এই বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য দায়ী...) আমার অবশ্য তেমন মনে হয়নি। লক্ষ করুন, পুরো উদ্ধৃতাংশটিই। মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেক্ষাপট আর তার পশ্চাৎভূমির কথা মনে রাখলে শেষ পঙ্‌ক্তিটি কেবল 'রাজনৈতিক' একথা বোধহয় গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। অব্রাহ্মণ কবিদের হাতে (কানা হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, কেতকাদাস) লেখা হচ্ছিল *মনসামঙ্গল*, যেখানে কেন্দ্রীয় বিষয় অনার্য দেবীর বন্দনা। পুরো প্রক্রিয়াটিকে নিম্নবর্গের নিরিখে বিচার করলে, প্রতিদ্বন্দ্বের সংগ্রামকে মনে রাখলে খুব স্বাভাবিক মসৃণতায় পৌঁছে যাওয়া যায় 'আরব গেরিলা'-দের কাছাকাছি। কবি মৃদুল ঠিক সেই অনুষঙ্গমূলক বিদ্যুৎকেই তুলে আনতে চেয়েছেন এখানে। আমার অন্তত তেমনই মনে হয়। এই 'প্রতিবাদ', 'প্রতিস্পর্ধা', 'অভ্যুত্থান'-এর নানা ইতিহাস, পুরাণকে সমকালের পাশে এনে চমকপ্রদ এক সংঘাতমূলক আগুনদীপ্তি তৈরি করেন মৃদুল। বড়ো অর্থে অথবা বলা ভালো, প্রকৃত অর্থে এখানেই তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে 'রাজনৈতিক'।

একটু ভাবলে সহজেই বোঝা যাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম যুগের অরুণ মিত্র বা এ-যুগের জয়দেব বসুর সঙ্গে মৃদুলের সান্নিধ্য প্রতিমুহূর্তেই এই কারণে গড়ে তোলে স্পষ্ট ভিন্নতার নকশা। কোনো বিশেষ দল, দলীয়তা নয়, একধরনের 'মানুষের আন্দোলন' বারংবার মৃদুলকে আলোড়িত করে, তাঁকে নাড়িয়ে দেয়। তাঁর লেখনীতে 'বামপন্থী' আবেশের চিহ্ন রয়েছে বটে, তবে দরবারি দলমতকে ছাপিয়ে তা বহুস্তরিক বিস্তারে পৌঁছে যাবার হিম্মতও সযত্নে বহন করে।

ফিরে আসি পুরোনো প্রসঙ্গটিতে। তিন পর্বের তিনটি উচ্চারণকে পাশাপাশি রেখে আমরা বিচার করব মৃদুল দাশগুপ্তের প্রবণতাকে —

১) ধরো, সেদিনও এমনই রাত, জালিয়ানওয়ালাবাগে
ডায়ারের বন্দুক নিয়েছে কেড়ে সোনার টুকরো ছেলে
দ্রোণাচার্য ঘোষ!
ভাবো, ভাবো সেদিনের উৎসব! বরানগরের গঙ্গার জল থেকে
আবার এসেছে উঠে
তিনশো তরুণ

আগামী

২) আমরা গরিব বলে ওসব বুঝি না। দেখি শুধু নৌকা যায়
রবি ঠাকুরের নায়ে লালন ফকির বসে গান গায় ভবসংসারের —
আমরা সমস্ত দেখি শরবনে কাদা মেখে। ভীতু চোখে শুনি গান
ভোরবেলা ফাঁসি যায় ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে।

কুবাতাস

৩) সাহেবের ফৌজ, তার বিপরীতে
চাষিদের লাঠিসোটা
ডাকাতে কালীর মন্দিরে দেখি
লড়াইয়ের টেরাকোটা।

আরও ছবি আছে সিঙুরের সেই
মহাকালী মন্দিরে
ভূপতিত গোরা, উল্লাসরত
চাষিরা রয়েছে ঘিরে।

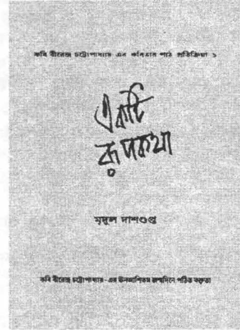
ডাকাতে কালী মন্দির, সিঙুর

তিনটি ক্ষেত্রেই মৃদুল তীব্র রাজনৈতিক। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সমকালীন দেশীয় লড়াকু ঐতিহ্য, সংকল্প বা প্রতিরোধ প্রতিবাদকে তিনি বড়ো কালাভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা করতে জানেন। এখানেই মৃদুলের পথ একটু আলাদা হয়ে যায়। তিনটি কবিতাংশেই লক্ষ করা যেতে পারে মৃদুল প্রতিষঙ্গ হিসেবে নিয়ে আসছেন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের চালচিত্র। আমাদের সময়ের 'রাজনৈতিক' কবিতা বহুলাংশে দল, দলাদর্শ এবং 'শ্রেণিচেতনা' নির্ভর কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত। 'বামপন্থী' আন্দোলনকে তাঁর মতো মুনশিয়ানায় কোনো কবিই প্রায় দেশাত্মবোধক সংগ্রামের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেননি। একটু ঝুঁকি নিয়েই বলি, দেশ আর মাটি, স্বভূমি আর স্বজনের প্রতি মৃদুলের এই টান সম্ভবত তাঁর 'শ্রেণিচেতনা' অতিক্রম করে অধিক পরাক্রমশালী। সে-কারণেই তিনি সিঙুর আন্দোলনে আলোড়িত হন, দরবারি 'মার্কসবাদী' ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। *ধানখেত থেকে* কাব্যগ্রন্থের (২০১১) ভূমিকায় অমলিন তীক্ষ্ণতায় বলে ফেলতে পারেন, 'ওসব গ্রামে আমাদের বন্ধুরা, সহপাঠীরা আছেন। ২০০৬-এর ওই হেমন্তের দুপুরে বাজেমেলিয়ার উদ্ভাসিত ধানখেতের দিকে তাকিয়ে উদ্বেগের পর মনে আসে ক্রোধ। হুগলির এই জমিকে 'ওঁরা' বলেছেন, একফসলি, অনাবাদী। এতে সুফলা হুগলি জেলার অপমান হয়েছে। হুগলিতে একফসলি জমি নেই। মাতৃহত্যার সমতুল অপরাধ করেছে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার।'

মাতৃভূমি আর কৃষিক্ষেত্রের জন্য এই হাহাকার মৃদুলকে যান্ত্রিক 'মার্কসবাদী' সমীকরণ থেকে সরিয়ে নেয় মানুষের দিকে। তাঁর নিশান পুথিবাণী পেরিয়ে সবীজ শস্যসম্ভবা ঘাসমাটিতে খুঁজে পায় শিকড়। খুঁজে পায় আত্মপরিচয়।

গরিব দেশের ম্লান আকাশে উড্ডীন হয়ে

এই প্রবণতা মৃদুলের প্রায় সব পর্বের কবিতায় প্রধান প্রবাহ হয়ে থাকে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, 'উনুন', 'আগুন', 'স্বপ্ন', 'লন্ঠন', 'মোম' — এইসব প্রতীকে ভরে থাকে তাঁর কবিতার দুর্গপরিখা। একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন তিনি, 'কেন একাকার হলাম না, কেন মিললাম না, এসব নিয়ে এই বজরং দল-ভি এইচ পি এবং জেহদি মুজাহিদিনদের হিংসায় ক্ষতবিক্ষত দেশের পূর্ব অংশে চিলেকোঠার সেপাই আমি বিস্তর ভেবেছি। ভেবে ভেবে একটা, অন্তত অন্যতম মীমাংসায়ও উপনীত হয়েছি। সে কারণ বাংলার বিভাজন। এবং সে বিভাজন আদৌ রাজনৈতিক বিভাজন নয়, ধর্মীয় একেবারে সাম্প্রদায়িক বিভাজন। এ কারণে আমরা আমাদের পরস্পরের ধর্মীয় বিষয়গুলিতে কৌতূহলী হইনি, ধর্মীয় আচারগুলি জানি না।' (*ইদের চাঁদ, ১৯৬৫*) এই দেশচিন্তা, অসাম্প্রদায়িক যৌথজীবনের আত্মপরিচয় সন্ধান, মৃদুলের 'রাজনীতি'-ভাবনাকে ব্যাপ্তি দিয়েছে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতি তাঁর অসীম আবেগ মিলেমিশে গেছে বারংবার স্বদেশ-অনুভূতিতে। এই প্রবণতার বিষয়টি মাথায় রেখেই তাকানো যাক তাঁর দু-টি কাব্য-উচ্চারণের দিকে।



আছি বাতাসের মতো, ও আমার মিষ্টি মা-মণি
আছি তোমার দুচোখে আজও কঠিন শীতল
মানো না যে মরে গেছি, বোকা মেয়ে, এখনও মানোনি
তাই জেগে বসে থাকো, ভাবো এলো পলাশের দল

কোনো শহিদের মা-কে

এই শহিদ কি নকশাল আন্দোলনের? খুবই সম্ভব। কিন্তু কবিতাটিকে ইচ্ছে করলে কেউ অগ্নিযুগের বীর শহিদ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ক্ষেত্রেও অনায়াসে প্রয়োগ করতে পারেন। কিংবা সিঙুর-নন্দীগ্রাম? লক্ষণীয় তাঁর *জলপাইকাঠের এসরাজ* (১৯৮০) কাব্যগ্রন্থে রয়েছে *ভারতবর্ষ*, *গোপন ভারতবর্ষ*, *একজন ভারতীয় নিগ্রোর কবিতা*, কিংবা, *এভাবে কাঁদে না*-এ (১৯৮৬) *জাতীয় সংগীত* বা *আত্মপরিচয়* ধরনের কাব্যনাম। এসব মিলে যায় তাঁর প্রবণতায় —

আকাশ কালো ঈগল পাখা, এবং নদী তুমুল তিস্তা
পথ টেনেছে ভুচুস্বকে, এল্ পার্টিডো কমিউনিস্তা

এল্ পার্টিডো কমিউনিস্তা

আর তার পরেই আসে দেশপ্রেমিক মানুষের জন্য চমক — 'তারা ঘুমায়, বুকের ক্ষতে এদেশ ভারতবর্ষ আঁকা। এভাবেই কবি বারংবার ফিরে যেতে চান, স্বদেশ-স্বজনের পরিচিত ঐতিহ্যবৃত্তে। তাঁর ছড়ার মধ্যে সেই টানেই মাথা তোলে 'প্যান্টে ফুটো জামার কলার ফাঁসা' বালক য্যাকে গরিব বলে স্কুলে ভর্তি করা হয় না। উড়ালপুলের নীচে এই বালক 'পথ কুড়োনো বই' পড়ে বড়ো হচ্ছে। তার বাবা 'উধাও পুলিশ ভ্যানে' আর মা মারা গেছেন। কেউ একে বলবেন 'শ্রেণিঘৃণা'। কিন্তু, স্থান-কালের যে নির্দিষ্ট স্পষ্টতায় তাকে স্থাপন করেন তাতে 'তোমার সঙ্গে আজকে না-হয় কালকে তো খেলবই' অনেক বড়ো মানবিক পটভূমি অর্জন করে।

সূক্ষ্ম কিছু মানব অধিকারে

মানবিকতা। শব্দটি কি 'রাজনৈতিকতা' শব্দের চেয়ে কম জোরালো? কবি কি 'রাজনৈতিক' হতে চান নাকি 'মানবিক'? মানবিক আর্তি কি শুধু রাজনৈতিক দর্শন বা রাজনৈতিক কেতাব-শাস্ত্র থেকেই গ্রহণীয়? এসব গূঢ় প্রশ্নের মুখোমুখি হই যখন মৃদুল লেখেন এসব পঙ্ক্তি —

ফলে রক্তাপ্লুত পড়ে ধানখেতে, অল্প অল্প শ্বাস...
ওড়াতে সচেষ্ট তাও হাত ধরে দুজন বাতাস

প্রকৃতপক্ষে 'রাজনৈতিক' এই অভিধাটি খুব সন্তর্পণে বিচার করাই সংগত। মার্কিন কবি কার্ল স্যান্ডবার্গ ব্যবহার করেছিলেন একটি চমৎকার শব্দবন্ধ, নিজের

কবিসত্তার পরিচয় দিতে — 'a historian of current events'। সেক্ষেত্রে আমরা এগোতে পারি বৃহত্তর পরিচয়ের দিকে। সমকাল আর সমকালীন ঘটনাবলি, এমনকী নিকট অতীত যখন অহরহ ছায়া ফেলতে থাকে কবিতায়, তখনই সেই কবি আর তাঁর কবিতাকে 'রাজনৈতিক' বিশেষণে ভূষিত করা সহজতর হয়ে ওঠে। বাস্তবের সঙ্গে 'রাজনৈতিক' বাস্তবের সংযোগকারী লছমনঝুলাটিকে শনাক্ত করতে-করতে এগোতে থাকেন পাঠক। *Political Verse and Song from Britain and Ireland* (১৯৭৫) বই-এর ভূমিকায় মেরি আশরাফ রাজনৈতিক কবিতার দশটি বিষয়-তালিকা তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে অন্তত তিন-চারটি হয়তো মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতার প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে —

1) Protest and complaint, direct or indirect against exploitation and oppression.
2) Aspiration towards a better life, a juster society.
3) The commemorium of popular struggles past and present.
4) Tributes to heros and martyrs in the popular cause.

আশ্চর্যের কথা হল, এই বিস্তৃত-ব্যাপক পরিসর সব কবির ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। অনুষঙ্গের গভীর ব্যাখ্যা যেকোনো পঙ্‌ক্তিকেই শ্রীমতী আশরফের 'রাজনৈতিক' তালিকাভুক্ত করে তুলতে পারে। প্রখ্যাত মরাঠি দলিত কবি নামদেও ধসাল একবার বলেছিলেন, 'কবিতাই তো রাজনীতি'। সেকথা মনে রাখলে অবশ্য এত যুক্তি-তর্ক অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

তবু দু-একটা সংশয় ভাসতে থাকে মনে। কোনো-কোনো কবি খুব ঘোষিতভাবেই থাকতে চান সমকাল সাম্প্রতিকতা থেকে দূরবর্তী। কারো-কারো প্রবণতার মধ্যেই থাকে আত্মগত মরমিয়া অনুভূতি উদ্‌ঘাটনের প্রতি একনিষ্ঠ দায়বদ্ধতা। 'শুধু তাই পবিত্র যা ব্যক্তিগত'। এই দুই বিপরীত (যুযুধান?) অবস্থানের মধ্যে নিরন্তর যাতায়াতই প্রকৃতপক্ষে আজকের কবির নিয়তি। মৃদুলের কবিতার দিকে তাকালে সেই বহমানতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় যেন। একদিকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর অন্যদিকে বিনয় মজুমদার — উভয়কেই তিনি জাপটে ধরার অশ্রান্ত প্রয়াস চালিয়ে যান। *জলপাইকাঠের এসরাজ* থেকে *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ* ঘুরে তিনি *ধানখেত থেকে*-তে সরে আসতে থাকেন। প্রশ্ন ওঠে নীচের কবিতাটিকে নিয়ে আমার মনেই, কীভাবে পড়ব একে?

সম্প্রদায় ধর্মভীরু, বংশে বংশে সতীদাহ, তারই মধ্যে
আমি এই তৃতীয় বিশ্বের কোণে হাঁড়ি বসিয়েছি।
আমার দরকার হাতা, কড়া, খুন্তি, ছুরি, বঁটি, শিক, শূল,
কামান-বিমান...
তেলে জলে বর্ণভেদ, আলু-মাংসে ধর্মভেদ — আমি তাই
নুন লঙ্কা মশলা মাখাই।
মনে করো এ মশলার, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবো... ততোক্ষণে
তেজপাতা সহযোগে ঘন ঝোল লাল করে তুলি।
যদি খিদে — হাত লাগাও, একটু পেঁয়াজ কাটো —
এই বাংলাভাষা যদি না বোঝো আমার ক্ষতি বিন্দুমাত্র নয়।

মশলা

কার্ল স্যান্ডবার্গ অথবা মেরি আশরাফ কি একে বলবেন 'রাজনৈতিক' কবিতা? উলটোদিকে এ কি 'রাজনৈতিক' কবিতা নয়?

শেষপর্যন্ত তাই মৃদুল যে কথা বলেছিলেন আরেক অশ্বত্থপ্রতিম প্রদীপ্ত কবি সম্পর্কে সে কথাই তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য মনে হয় —

উনি রাজনৈতিক কবি, বটেই তো। বামপন্থী কবি, নিশ্চিত-ই তাই। কিন্তু ঐ দুটি অভিধাই তার দুটি ফুটো গেঞ্জির মতো, তার ধূলিধূসরিত পাঞ্জাবিতে কেবল 'কবি' পরিচয়টিই ফুটে আছে।

এক রূপকথা

অলজ্জ আত্মকথা

আমার মনে হয়, পাঠান্তে, মৃদুল দাশগুপ্ত একধরনের আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে তাঁর গদ্যে-পদ্যে প্রাধান্য দিতে চান। কী বস্তু সেটি? সে এক সন্ধান যার কেন্দ্রে থাকে ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, দেশ...।

আমিও শিরাধমনীতে খানিক বহন করি বরিশালের গৈলাগ্রামের (শুধু বাঁশি শুনেছি, মায়ের কাছে) শোণিতপ্রবাহ। বাবা আবার হুগলির। মৃদুল দাশগুপ্তের গদ্যপদ্যের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অনেক কথাবার্তা এসব কারণে গড়াতে থাকে। 'আত্মপরিচয়' শব্দটি সারা বিশ্বজুড়ে বর্তমানে এক গভীর অনুসন্ধান আর আবেগানুভূতির বিষয়। সেই খোঁজ, 'রাজনৈতিক' শব্দকেই সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে দেশকালের সীমানা পেরোনো বিরাট প্রান্তরের মাঝখানে। বিষয়টি কেবল প্রকট-প্রচ্ছন্ন, বিবৃতি-রহস্যময়তার নয়; মৃদুলের ভাষায়, 'কাহিনীর তলদেশে জাগে রান্নাঘর।'

অতঃপর, 'রান্নাঘর' শব্দটির সামনে আমি 'রাজনৈতিক' আতশকাচ বা তুলাদণ্ড হাতে এক পা এগোই, দু-পা পেছোই। 'বীজ ও আগামীকাল মিশে তাই অন্নব্যঞ্জন।'

নারীর সঙ্গে প্রকাশ্যেও পুণ্যলাভ হয়

বাসবী চক্রবর্তী

কে জানে সত্যিই সম্ভব কিনা? আমার মতো একজন সামান্য কবিতা-পাঠকের পক্ষে মৃদুল দাশগুপ্তর মতো কবির সম্পর্কে কিছু লেখা! হ্যাঁ, যদি হত ব্যক্তি মৃদুল, বন্ধু মৃদুল সম্পর্কে লেখা, তাহলে হয়তো ঠিক ছিল। পাতার পর পাতা ভরিয়ে দেওয়া যেত। সেই ১৯৮০ সাল থেকে ২০১২ সাল — এই বত্রিশ বছরে মৃদুলের সঙ্গে বন্ধুত্বের কাহিনি বুনে ভরিয়ে তোলা যেত সম্পর্কের নকশিকাঁথা। কিন্তু উপায় কী? *বোধশব্দ*-র সম্পাদক সুস্নাতর কেন যে মনে হয়েছে — আমি পারি, কবি মৃদুলের মূল্যায়ন করতে — তা আমি জানি না। হয়তো, না — নিশ্চিতভাবেই, এই লেখা হতাশ করবে সম্পাদক ও পাঠককে। তবু সুস্নাত আমাকে ছাড়ছে না। অগত্যা কী করা যায়? চেষ্টা করা যেতে পারে, কারণ একথা তো একশো ভাগ সত্যি আমি মৃদুল দাশগুপ্তর কবিতার একজন অনুরাগী পাঠক।

কুসুম, কবে যে তুমি ব্রত
ভেঙে চলে গেছো, আর হাওয়া
আমাকে টুকরো করে, ভাঙে
বলে, কে গো, তুমি কার মতো?
জানি আমি আলো আঁধারের
ভিতরে প্রস্তুত নই আজো —
পুড়ি, ক্ষই, হাওয়ার হাওয়ায়
যতোখানি, তুমিও কি ততো?

১৯৮০ সালে প্রকাশিত মৃদুল দাশগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *জলপাইকাঠের এসরাজ*-এর বিভাব কবিতা এটি। চমৎকার এই কবিতাটিতে মুগ্ধ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুবান্ধবদের কাছে স্মৃতি থেকে বলতাম। তখনও মৃদুল পাঠকদের কাছে আজকের মতো এত পরিচিত নাম নয়। ফলে তাদের কৌতূহল নিরসন করতে কাঁধঝোলা থেকে বের করে এনেছিলাম বইটি। উল্লেখ্য, যে বইটি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন কবিবন্ধু জয় গোস্বামী। পরে অবশ্য টিউশনের উপার্জনে আমি কাব্যগ্রন্থটিতে নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। যাই হোক, সেই সময় জয়ের কল্যাণেই তাঁর বাড়িতে আসা অসংখ্য ছোটো পত্রিকা পড়ার সুযোগ ছিল আমার। তাই মৃদুল দাশগুপ্ত আমার কাছে কোনো অপরিচিত কবি ছিলেন না। তবে একটা আস্ত কাব্যগ্রন্থ হাতে পাওয়ার আনন্দময় অভিজ্ঞতাই আলাদা। বিশেষ করে, এত চমৎকার একটা কাব্যগ্রন্থের নাম! *জলপাইকাঠের এসরাজ*! আর কী সব আকর্ষণীয় কবিতা।

বাড়িটি থাকবে নদীর কিনারে, চৌকো,
থাকবে শ্যাওলা রাঙানো একটি নৌকো,

ফিরে এসে খুব আলতো ডাকবো, বউ কই...
রাজি?

বিবাহপ্রস্তাব

শুনেছি, আমার এক বন্ধু তার প্রণয়পর্বে এক ফাল্গুনের বিকেলে তার প্রেমিকাকে এই কবিতাটির মাধ্যমে বিবাহ-প্রস্তাব দিয়েছিল।

মৃদুলের পঁচিশ বছর বয়সে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থে যেসব কবিতা অন্তর্ভুক্ত — তা মৃদুল লিখেছেন পনেরো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে। তাই স্বাভাবিকভাবেই কম-বয়সি তরুণের মুগ্ধতা, আবেগ, রোম্যান্স ধরা পড়েছে কবিতায় —

তোমার গোপন তিল জানি না কোথায়, তবু তার নাম আমি
রেখেছি মমতা;
ধরে আছো সমুদ্র, আকাশ; দূরে কোন্‌খানে নাবিকের পরিত্রাণ, দূরবীনে
ছোট্ট, কালো, রুটিফল গাছে ভরা এক্সমাস দ্বীপ?

তবে শুধু আবেগ বা মুগ্ধতা নয়, লক্ষ করার মতো তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব ছবিও প্রতিফলিত মৃদুলের কবিতায় —

আছি বাতাসের মতো, ও আমার মিষ্টি মা-মণি
আছি তোমার দুচোখে আজও কঠিন শীতল
মানো না যে মরে গেছি, বোকা মেয়ে, এখনও মানোনি
তাই জেগে বসে থাকো, ভাবো এলো পলাশের দল

কোনো শহিদের মা-কে

এরপর মৃদুলের সৃষ্টিশীল কলম থেকে উৎসারিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একের পর এক কাব্যগ্রন্থ। ফলে ১৯৮০ থেকে ২০১২ — এই বত্রিশ বছরে জাত কবির সৃজন-প্রক্রিয়াকে কোনো সমান্তরাল ভাবনা বা দৃষ্টিকোণ দিয়ে মূল্যায়ন করা সহজ কাজ নয়। প্রতিটি গ্রন্থে মৃদুলের কবিতায় শোনা গেছে নতুন স্বর, দৃশ্যমান হয়েছে নতুন-নতুন বাঁক।

আমার মনে হয়, তিনিই সার্থক কবি, যিনি জনপ্রিয়তার ফাঁদে পা না-দিয়ে এবং অতি বিখ্যাত হবার কলাকৌশল রপ্ত না করে আজীবন মগ্ন থাকেন কেবল কবিতায়, কবিতায় আর কবিতায়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে, মৃদুল দাশগুপ্ত কোনোদিন তথাকথিত 'জনপ্রিয়' হতে চাননি। কর্মসূত্রে প্রাতিষ্ঠানিক হলেও, 'প্রতিষ্ঠানের কবি' হতে চাননি। আবৃত্তিকারের ঠোঁটের 'ল্যাঙ্গুয়েজ' বা কণ্ঠের মডুলেশন মনে করে মঞ্চালোড়িত কবিতা লেখেননি। লেখা শুরু করেছিলেন বাংলা কবিতার প্রাণ 'ছোটো' পত্রিকায় — লিখে চলেছেন আজও। তবে শুধু কবিতা নয়, মৃদুলের চমৎকার স্বাদু গদ্যও আমার খুব প্রিয়। তবে কবির অভিজ্ঞান তো তাঁর কবিতা — যেখানে মেধা আর হৃদয়ের মিশেলে ফুটে ওঠে কথাবিশ্বের ছবি —

সকলে আলোকপ্রাপ্ত — আমিও তো নিয়তই এই কথা ভাবি।
সকল রান্নাই শিল্প — যিশুর নিকটে বলি, মোহম্মদ লবণ জোগান।
খাবেন শঙ্করাচার্য? স্মিত প্রভু মুখে দুটি গ্রাম তুলে নিতে
থালাবাসনের ঝড়ে কোথা খাদ্য! দাঙ্গা শুরু!
স্ত্রীলোক আমাকে বলে, গাত্রোত্থান করো।

আশা করি চন্দ্রোদয়

মৃদুলের কবিতার আরও একটি বিষয়, যা পাঠক হিসাবে আমাকে আকৃষ্ট করেছে — তা হল, মৃদুল কোথাও হতাশা, ব্যর্থতার কথা বলেননি, বরং দেখেছি একধরনের সুপ্ত আশাবাদ ফল্গুর মতো বহমান মৃদুলের কবিতার শরীরে। তার কবিতার মুখ ফেরানো রয়েছে জীবনের সাঁকোর দিকে —

আঁকড়ে ধরে উড়ে যাচ্ছি। যাতে
খোকা আসে।
এবার ছড়াও তুমি ডালপালা — তাকে বলি,
তার হাসি দিগন্তে ছড়ায়।

চাদর বিছিয়ে দেওয়া ছায়াপথ, মুহূর্তের ঘোরে
নিচে আমি দেখলাম, অস্ত্রবিক্রেতার
হাতের উল্কিতে আঁকা বুদ্ধবাণী

মর্গের উল্টোদিকে প্রসূতিসদন

জন্ম

এই লেখা শুরু করার আগে সম্পাদক সুস্নাতর অনুরোধ ছিল — যদি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মৃদুল দাশগুপ্তর কবিতার মূল্যায়ন করা যায়! সত্যি বলতে — নারীবাদ নিয়ে চর্চা করি, দু-একটি বইও সম্পাদনা করেছি — কিন্তু সেই প্রেক্ষিতে থেকে কবিতার মূল্যায়ন! সত্যিই কি সম্ভব? সত্যিই কোনো 'ইজ্‌ম' বা 'বাদ'-এর আতসকাচ দিয়ে কবিতাকে বিচার করা যায়? আমি বিশ্বাস করি না। তাই সেই পথে হাঁটছি না। তবে মৃদুলের কবিতায় অসংখ্যবার নারী-প্রসঙ্গ এসেছে। একটা কথা বলা, মনে হয়, এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মাসখানেক আগে এক সকালে দূরভাষে নানা কথার মাঝে মৃদুল বলেছিলেন — 'মেয়েরা নিঃশব্দে যে বিপ্লব ঘটিয়েছে, তার তুলনা নেই। আজকের মেয়েরা কোথায় পৌঁছেছে, ভাবলেই অবাক লাগে।' সেই সকালে মৃদুলের এই কথা, বলা বাহুল্য, আমাকে আলোড়িত করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোয় মেয়েরা আজ যে স্ব-শক্তি অর্জন করেছে, তা তো একধরনের বিপ্লবই। কিন্তু আজকের সমাজে এখনও পর্যন্ত কিন্তু নারী-পুরুষের বৈষম্য শেষ হয়ে যায়নি। মনে রাখা দরকার যে, এই সম্পর্কে বৈরিতা নেই, সুস্থ সমাজ, সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন নারী ও পুরুষ — দু-জনকেই। আর, পুরুষের জীবনে নারীর অস্তিত্ব মিশে থাকে নানাভাবে, নানা রূপে — কখনো প্রত্যক্ষে, কখনো পরোক্ষে। মৃদুলের কবিতায় অনেকবার এসেছে 'নারী'-র অনুষঙ্গ —

নরম মনের কথা বলি কাটে না কুহেলি।
যতোই স্মরণে আনি শিক্ষালয়... গুরুকুল..., মন বলে
সাধনা স্ত্রীলোক।
...
থালাবাসনের ঝড়ে কোথা খাদ্য! দাঙ্গা শুরু!
স্ত্রীলোক আমাকে বলে, গাত্রোত্থান করো।
...
যেন ভাষা ধানক্ষেত, তবু বলো
আরও কী সামগ্রী চাই স্ত্রীলোক তোমার?
...
সন্দেহ জেগেছে কোনো স্ত্রীলোকের আগমনহেতু
...
তবু আমি বাতি জ্বেলে দেখেছি স্ত্রীলোক
বর্ণিত হবার লোভে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় ম্লান দীপশিখা
...
...দোলাচল দ্বিধাদ্বন্দ্ব মেখে
স্ত্রীলোকের তালু থেকে ফুঁয়ে উড়ে বলি না কি, ও বন্ধু বাঁচাও?
...
শূন্যে যে কল্পনা করে গৃহ, পাশে পুষ্করিণী, মাধবীবিতানে
ছায়া এক স্ত্রীলোকেরই,...
...
বর্ণনাকারীর প্রায় বাষ্প ধ'রে আচম্বিতে লৌহপুষ্প ছুঁয়ে
ধাতুসবুজের ঘোরে স্ত্রীলোক তোমার রং বেগনী ভেবেছি।

এছাড়াও আছে তাপসীর কথা, হেনাদির কথা, শিক্ষয়িত্রী বা অধ্যাপিকার কথা, আছে পত্নী মাধবীর কথা। দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনার পরিধি দীর্ঘায়িত করে পাঠকের

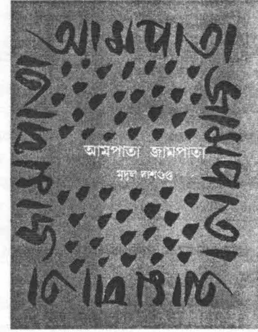
ধৈর্যচ্যুতি করতে চাই না। মৃদুল কবিতায় নারীকে এনেছেন নানা উপমায়, রূপকে — কখনো তার জাগতিক প্রতিমা পেরিয়ে উত্তরণ ঘটেছে অনির্বচনীয়তায়। মৃদুল বলেছেন — 'আসলে দেখিনি, শুধু, নিরাপদ বাক্যালাপে অনুমান করে / বুঝেছি নারীর সঙ্গে প্রকাশ্যেও পুণ্যলাভ হয়'। 'নারী' সম্পর্কে মৃদুলের মনোভঙ্গি স্পষ্টতই ভাষাময় হয়ে উঠেছে উদ্ধৃত এই পঙ্ক্তি দু-টিতে। তবে একটা কথা — 'স্ত্রীলোক' কথাটি আমার অপছন্দের। পুরুষতন্ত্রের উৎসারিত মানসিকতায় জারিত, মনে হয়। 'স্ত্রীলোক'-এর বিপরীতে আমরা কি 'পুরুষলোক' ব্যবহার করে থাকি? তাহলে কেন এমন শব্দের ব্যবহার — যার মধ্যে কেমন যেন 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'-এর ব্যঞ্জনা।

জলপাইকাঠের এসরাজ থেকে *কবিতা সংগ্রহ* — এই দীর্ঘ পরিক্রমা জুড়ে 'চারপাশে সোনালি রেখার কারুকাজ' সমেত যেসব কবিতা মৃদুল আমাদের উপহার দিয়েছেন — তা আমাদের তৃপ্ত করেছে। মননের গভীর খাদ থেকে, হৃদয়ের উষ্ণ উপত্যকা ছুঁয়ে ছন্দের মোড়কে যেসব 'শব্দ' চয়ন করে মৃদুল কবিতায় স্থাপন করেছেন — তা অনেক বছর ধরে বাংলা কবিতার পাঠক মনে রাখবেন। কামনা করি — মৃদুল আরও লিখুন, তাঁর মৌলিক কণ্ঠস্বর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সৃজনশীল থাকুন। 'হলুদ-সবুজ' বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করুক মৃদুল দাশগুপ্তের কবিতা।

ছড়াসাহিত্যিক মৃদুল

দীপ মুখোপাধ্যায়

মৃদুল দাশগুপ্ত একজন বিরলপ্রজ ছড়াসাহিত্যিক। তাঁর ছড়া কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কিনা সে-কথা আগাম জানান দেওয়া অসম্ভব। সে-জবাব নিহিত আছে মহাকালের গভীরে। আমরা শুধু পারি বর্তমানের আলোয় তাঁর ছড়াসম্ভার বিচার করতে এবং আস্বাদ নিতে। কবি হিসেবে মৃদুলের পাঠকপ্রিয়তা আজ স্বীকৃত। সব খ্যাতনামা কবি ছড়া লিখলেও কবিমাত্রই ছড়ালেখক নন। মৃদুল অবশ্যই এর ব্যতিক্রম। ছবির বিষয়বস্তু দেখে ছন্দোবদ্ধ অন্ত্যমিল সমৃদ্ধ পঙ্ক্তি রচনা করে স্কুল ম্যাগাজিনে মৃদুলের ছড়াক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ। তারপর শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা, *ছোটোদের কাগজ*-এ তাঁর ছড়াশিল্প পাখির ডানা হয়ে ভাসতে-ভাসতে পলকেই মেঘ হয়ে গেছে। ক্রমে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। এই নিখুঁত ছড়াকারিগরের কলমে ছন্দ খেলা করতে দেখেছি বলিষ্ঠ ও সাবলীল কবিভাষায়। অনুপ্রাসে-অলংকারে কিংবা প্রান্তমিলে-অন্ত্যমিলে। যার অন্তর্গূঢ়বোধ আমাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। পরিশিলিত ছড়া শিল্প-সৌন্দর্যে কবিতার রূপ নেয়। নতুন সংজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয় সমকালীন ছড়া। স্মরণে রাখেন ছড়ার নিজস্ব অস্তিত্বের কথা এবং খুদে পাঠকদের সেই জগত-পরিধিতে উত্তীর্ণ করানোর মূল লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। মুক্ত বাতাসের স্বাদ পায় পাঠ্যপুস্তকের ভারে জর্জরিত শিশু-কিশোর। বিষয়বস্তুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও নব আঙ্গিকে সমৃদ্ধ হয় আধুনিক ছড়া। প্রত্যেক ছড়ালেখকই কোনো না কোনো পূর্বসূরির আদর্শ অনুসারী হয়ে থাকেন। অজান্তেই ছড়া সৃষ্টিকর্মে আদর্শগত সাজুয্যের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এখানেও মৃদুল স্বতন্ত্র এবং সেই বৃত্তাবদ্ধ নন। বৈচিত্র্য ও বৈভবে ছড়া তাঁর কাছে গুণের সম্ভার, গুনতির নয়। তাই রচিত ছড়াসংখ্যা সাকুল্যে একশোর গণ্ডি ছুঁয়েছে। ছড়াগ্রন্থ মাত্র চারটি। *ঝিকিমিকি ঝিরিঝিরি*, *ছড়া ৫০*, *রঙিন ছড়া* এবং *আমপাতা জামপাতা*। এমনকী একটি গ্রন্থের ছড়া অন্য গ্রন্থেও অনায়াসে ঢুকে পড়েছে। তবুও এই যৎসামান্য সৃজনপুঁজিকে আমি কেন অসামান্যের শিরোপা দিচ্ছি, এই নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। একটু বিস্তৃত করে কৈফিয়ৎ দিতে চাই। মৃদুলের ছড়া এমন এক ছন্দিত শিল্পসংরূপ যার শক্তি এর মিতায়নে, মিতকথনে, লঘুভার জীবনভাষ্যে এবং উপস্থাপনের তীক্ষ্ণতায়। সেই সঙ্গে গভীর দার্শনিকতা ও উজ্জ্বল কল্পনাশক্তির মিশেলে ছড়াগুলো অনেক মহার্ঘ হয়ে ওঠে। এইসব বৈশিষ্ট্য-মানদণ্ডে মৃদুলের ছড়াকে যথার্থ ছড়া বলে মনে হয়। অবশ্য একসময় *যুগান্তর*



দৈনিকের রোজনামচায় মৃদুলকে মনে হয়েছিল সাম্প্রতিককে ছড়ায় ধারণ করার ব্যাপারে বেশ তৎপর। মিতায়তন ছন্দিত তীক্ষ্ণভাষ্যমাত্রকেই ছড়াজ্ঞান করছিলেন যেন। সেই কারণে চটুল ছন্দের অপ্রত্যাশিত অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ অনেক ছড়া তাঁর কলম-নিঃসৃত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে তাঁর এই বিভ্রান্তি কেটে গেছে। এমনকী সেই ছড়াগুলি কোনো গ্রন্থেও স্থান পায়নি। তবুও মৃদুলকে আধুনিক ছড়া লিখিয়েই বলব। লোকায়ত অতীতের ভিত্তির উপর তিনি ক্রমে লাগিয়ে গেছেন আধুনিক চেতনার পলেস্তারা। বিশ্বায়নপুঁজি মানুষের মধ্যে লোকায়তিক সংস্কৃতিকে দানা বাঁধতে দিচ্ছে না। ছড়ারও আধুনিক না হয়ে তাই উপায় নেই। মৃদুল হৃদয় দিয়ে ছড়াকে জীবনের বৃহত্তর অনুভবের মাধ্যম-এ পরিণত করতে চান। বিশ্বায়নের আগ্রাসনের মধ্যে থেকেই জীবনসামগ্র্যকে অনুভব করার জন্য তাঁর চোখ-কান খোলা। সামর্থ্য দেখিয়ে সৃষ্টি করছেন ছড়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভিমুখ। এটাই প্রচল ভাঙার প্রচেষ্টা।

মৃদুলের ছড়া আপাতভাবে ব্যপ্ত হয়েছে শিশুদের মনোজগতকে আশ্রয় করে। যে কারণে সেগুলিকে শিশুসাহিত্যের সীমানায় রেখে দেওয়া যায়। কিন্তু শক্তিমত্তার প্রয়োগে তিনি নানা গুরু বিষয়েও চলে গেছেন। শিশুর যাতায়াত যেখানে অনভিপ্রেত, সেই অঙ্গনেও তিনি অবলীলায় ছড়ার গাড়ি চালিয়ে দিয়েছেন। এটাও তাঁর ছড়ার স্পষ্ট চারিত্র্যলক্ষণ। এমনকী শব্দের ছুঁৎমার্গিতা নেই ছড়া সম্ভারে। দৈনন্দিন আটপৌরে শব্দ, আঞ্চলিক শব্দ, তৎসম শব্দ থেকে বিদেশি শব্দ হাত ধরাধরি করে তাঁর ছড়ায় এক প্রসন্ন আবহ তৈরি করে। শিশুদের মনে যেমন আনন্দের ভুবন সৃষ্টি হয় তেমনি বয়স্কজনের রসনাও তুষ্ট হয়। এটাই তাঁর ছড়ালিখিয়ে হিসেবে অবিসংবাদিতা প্রতিষ্ঠার রহস্য। শক্তিমান কবির কল্পনাশক্তিতে সমৃদ্ধ ছড়া যেন বর্ণিল হয়ে ওঠে। চিরকালীন আশ্রয় খোঁজে মনের গভীরে। যা ছড়ার সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে মিলে গিয়ে প্রকৃত অর্থে সম্পন্নতা পায়। কিন্তু কবি মৃদুল আর ছড়ালিখিয়ে মৃদুলকে তখন ভিন্ন লাগে। ছড়ার সপ্রতিভতা এমন চকিতে পাঠককে বশ করে ফেলে যে অন্যকিছু ভেবে ওঠার আগেই ছড়ার সেরিব্রাল স্বভাববৈশিষ্ট্যগুলো পাঠক মনে ক্রিয়া করতে শুরু করে দেয়। একেই বলে ছড়ার ছড়াত্ব।

শিশুর ভেতরে একটা ছন্দময় আনন্দ ছড়িয়ে দিতে মৃদুল লিখলেন *রঙিন ছড়া*। চার লাইনের চব্বিশটি ছড়া। পাতা জুড়ে সুমন কবিরাজের রঙিন কোলাজ। মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানি গানের আধুনিক কথামালা। ছেলেবলার প্রথম পাঠের অনুভূতি গুনগুন করে ওঠে। তবে এখানে কথক কিন্তু মা নন। ছেলেমেয়েরা নিজে-নিজেই নিজেদের কথা বলছে। আমাদের অতিপরিচিত শব্দগুলো আক্ষরিক অর্থের খোলস থেকে বেরিয়ে এমন ছবি হাজির করছে যা আমরা চোখ বন্ধ করলেও দেখতে পাই। তাই মৃদুল সহজেই বলতে পারেন, 'জল ভরা

মেঘগুলো / গায়ে রোদ মেখে / আকাশের গায়ে দিল রামধনু এঁকে'। কিংবা, 'এই তো কত জল ঝরেছে / জিটি রোডেও কাদা / এখন কালো মেঘগুলো সব সাবান মেখে সাদা'। শব্দ যেন বয়ে আনছে ভাবনা-নদীর জলীয়বাষ্প। শব্দের নিবিড় বন্ধনে সেই বাষ্প জমে হচ্ছে কথার বরফ। শিশুমনে ছবি ও অর্থের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে দিচ্ছে অপূর্ব মুগ্ধতা। একটা পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। সঙ্গে নিরেট অন্ত্যমিল ও নিপুণ ছন্দ। আবেগ জড়িয়ে রাখছে ছড়ার কণ্ঠস্বর। দৃঢ়বদ্ধ এবং সংক্ষিপ্ত।

একই গ্রন্থে পারিবারিক প্রসঙ্গে মৃদুলের আঙ্গিক অনেক আলগা। 'বাবা পড়ছে খবর কাগজ, / মা দেখছে টিভি, / দিদি চাখছে আমের আচার, / আমি বলছি, দিবি?' অথবা, 'মামা গেছেন আমেরিকায় / দেশের এত টান / পকেট ভরে নিয়ে গেছেন / হুগলি জেলার ধান'। মৃদুল ভুলতে পারেন না তিনিও হুগলি জেলার। এখানে ধান একটি রূপক-প্রয়োগ, না-বলা কথাটির মধ্যেই ছড়া লুকিয়ে আছে। ছড়ার কল্পনাবিলাসে আমেরিকাপ্রবাসী মামা মনে হয় সেই স্মৃতিজড়িত ধান খাবেন না। বরং নস্টালজিয়ার শো-কেসে সাজিয়ে রাখবেন। এটাও যেন একধরনের বাস্তবতা। ছড়ার এই যে ফাঁক, এটি যেন দালানের এক অপরূপ চিলেকোঠা। আমাদের ভাবনার জোনাকি এখানেই উঁকি দেয়। ছড়াটি একবার পড়া হয়ে গেলেই ফুরিয়ে যায় না। উপস্থাপিত হয় এক-এক সময়ে এক-একভাবে। তাই *রঙিন ছড়া*-র শিশু অনুসন্ধিৎসা ও সারল্য নদীতরঙ্গের মতোই নীল, আকাশের মতোই পরিবর্তনশীল এবং অবশ্যই শিশুমনের পরিপূরক হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে দৈনন্দিনতায় একাত্ম কিছু উপদেশ ছবি হয়ে যায়। বোধ হয় না ছড়ালিখিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন। তাই দাদা কানমলা দিলে ছেলেটার কিল দিতে ইচ্ছে করে। তবু সে জেনে ফেলেছে দেওয়ালে আঁকিবুকি কাটলে অফিস থেকে ফিরে বাবা রেগে যাবেন। এগুলি মৃদুলের ছেলেজাগানো ছড়া। মোটেই ছেলেভোলানো নয়।

সেদিক থেকে *আমপাতা জামপাতা* পাঁচমিশেলি কিশোর ছড়াগ্রন্থ। যদিও ছড়াগুলো শব্দচয়নের সৌকর্যে ও ছন্দের সৌকুমার্যে সবস্তরের পাঠককে আন্দোলিত করে। তার লেখনি মুখে নিঃসৃত হয়, 'অমনি আমার মন গলে যায় / ভাগ দিতে চাই আইসক্রিমের / কিন্তু সেসব চায় না তো সে / সে খোঁজ করে ঘোড়ার ডিমের'। একদিকে ঘোড়ার ডিমের আজগুবি কল্পলোক আর অন্যদিকে আইসক্রিমের বস্তুলোকের টানটান ভারসাম্য বিকীর্ণ রসিকতা গড়ে তোলে। কিন্তু *মহাভারত* শিরোনামাঙ্কিত ছড়ায় যখন লেখেন, 'লোকালয়ে লোকজন / যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন', তখন নিরর্থ থেকে অর্থের দিকে বাঁক নেয় সেই ছড়া। সত্যিই তো যুধিষ্ঠির আর দুর্যোধনের মতো লোকজন নিয়েই আমাদের লোকালয়। যা মৃদুল আলোকিত করতে চান ভূত-প্রেত তাড়িয়ে। সেই মহাভারতের পটভূমি চাঁপাডাঙা থেকে কলকাতা। এই প্রখর চেতনাই নিরর্থ ছড়ার সারৎসার। শব্দের এক দিকে অর্থ





অন্যদিকে অনর্থ — এই দুই বিপরীতের মধ্যে দুলতে থাকে মৃদুলের ছড়ার ভুবন। যেখানে চন্দনা মাসি আর মেসো সাঁতরিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া গিয়ে দেখেন সেটা ভেঙেচুরে গেছে। অগত্যা তাঁরা উড়ে-উড়ে গ্রিসে চলে যান। ছোটোদের এভাবে বুঝিয়ে দেন রাশিয়া বিভাজনের বৃত্ত। *হঠাৎ-হঠাৎ* তাঁর ছড়ায় কবিতা ঢুকে পড়ে। অনায়াসে রচিত হয়, 'একেলা আঁধার রাতে / অচেনা শহরে / আকাশে দুইটি তারা / মিটমিট করে'। কিংবা, 'তখনও ঠিক তোমার জামায় স্নেহের সুতোয় থাকব মিশে / থাকব তোমার চোখে চোখেই, রাঙা ধুলোয় ধানের শিসে'। ছড়া তখন প্রকৃত কাব্যগুণে ঋদ্ধ হয়। মূলসুর কিন্তু ব্যাহত হয় না মোটেই। তেমনি *ব্রাজিল* ছড়ায় তাঁর মানসলোকের প্রতিফলন ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। 'রিওর সে বেলাভূমি / গরিবের ছেলে / ঘরে ঘরে জন্মাবে / আরও আরও পেলে'। ব্রাজিল দলের সাপোর্টার হয়ে লেখেন, 'শক্তি দিয়ে যতই রোখো / শিল্প তাকে ছাপিয়ে যায়'। খেলার ছড়ায় জ্যোতির্ময়ী, ফুটবল বা বিশ্বকাপ কিছুই বাদ পড়ে না। তাঁর খেলাধুলোর ছড়া আমোদ বা ফুর্তির নয়। মনোরঞ্জনের উপাদানের সঙ্গে মিশে থাকে বুদ্ধিদীপ্ত অনুষঙ্গ। মনকে আবিষ্ট করে বিচিত্র স্বাদে ধরা দেয়। মৃদুল ছড়ার গাড়ি চেপে হুগলি থেকে কলকাতা আসেন। বলেন, 'রোজই আমার লেট হয়ে যায়, হেঁট হয়ে যায় মাথা / চশমা পরে ধমক লাগায় আমাকে কলকাতা।' আবার পরণকথায় ভর করে শিকড়ের খোঁজ করেন। অনায়াসে লেখেন, 'বিশ পা হাঁটলে নদী এবং / দশ পা গেলে খাল / তিরিশ পদক্ষেপে সাগর / আমার বরিশাল'।

মৃদুল তাঁর ছড়ায় এক ভাষাসম্ভব জগতের খোঁজ দেন। সম্ভব-অসম্ভবের সহাবস্থানে বিস্ময়-কৌতুক যেন নিবিড় হয়ে থকে। তাই কাব্যভাষায় দেখি বিপরীতধর্মী পদের নিকট অবস্থান। জমে ওঠে অসংগতিজনিত কৌতুকরস। আকস্মিক ও সপ্রতিভ প্রয়োগে ঘনিয়ে আসে বিস্ময়লোকের আবহ। ধ্বনিগত উদ্ভটত্ব দিব্যি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। *ঝিকিমিকি ঝিরিঝিরি* ছড়াগ্রন্থে সকৌতুকে লেখেন, 'টুংটাং নদীতীরে ডিংডং গ্রামটি / সেখানে থামুক গিয়ে ৩নং ট্রামটি'। এই ট্রামে চেপেই ডিংডং গ্রামে একঝাক পড়ুয়ার ক্রিং ক্রিং ফুর্তি। ফের ৩নং বাসে চাপিয়ে পাঠকদের সরাসরি নিয়ে আসেন বাস্তবের রাস্তায়। বলেন, 'তাড়াতাড়ি যেতে চান? বসে যান সিটে / কলিকাতা যাইবেন সাতাশি মিনিটে'। তাঁর ৩নং বাসকে কিন্তু নীলাকাশ থেকে বিমানের পাইলট তাকিয়ে দেখে। সে-ও এই বাস চালাতে চায়। কল্পনা এখানে বাস্তবতার মাপকাঠিতে পঙ্গু হয়ে পড়ে না। মনে যা এল তা-ই যদি ছড়ার রূপ নেয় তাহলে সেটা পাগলামির প্রকাশমাত্র। উদ্ভট শিল্পমণ্ডিত ছড়া তাতে রচিত হয় না। উদ্দেশ্যহীনতার প্রতিচ্ছবি হলেও উদ্ভট শিল্পের একটা উদ্দেশ্য থাকে। মৃদুলের এইধরনের ছড়া তাই খণ্ডিত ও পারম্পর্যহীন মনে হলেও প্রকৃত অ্যাবসার্ডিটির ব্যঞ্জিত প্রতিভাস। এখানেই ছড়ার শৈল্পিক উত্তরণের রহস্য। সেই উন্মার্গ চিন্তাই ছড়া হয়ে ওঠে।

ঝিকিমিকি ঝিরিঝিরি-পর্যায়ভুক্ত অনেক ছড়াতেই আবেগযুক্ত শিথিল হাসির প্ররোচনা নেই। বরং ছড়ার তকমা ঝেড়ে ফেলে বাস্তবতার গভীরে অবস্থিত অনুভূতিগুলো কবিতা হয়ে উঠতে চায় অতি সংবেদনশীল কবিসত্তায় ভর করে।

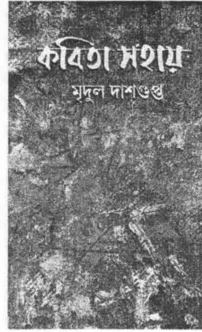


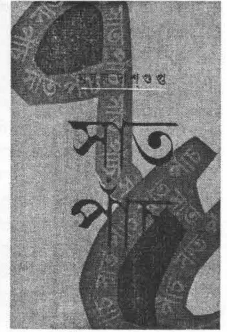
শোনা যায় অনায়াস উচ্চারণ, 'নাম বলেছি ধাম বলেছি এবং বয়স কত / সেই সঙ্গে এও বলেছি মা হয়েছেন গত'। অথবা, 'হাতের তালুর ওপর যেমন হাজার আঁকিবুকি / আমার জেলার চতুর্দিকে তেমনি নদীর উঁকি'। মৃদুল ছড়াতে স্বপ্ন দেখাতে জানেন। তাই স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না, 'ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে ছবির ফ্রেমে বন্দি যারা / আমার দিবাস্বপ্নে তারা রক্তমাংসে পায় চেহারা'। অবনীন্দ্রনাথের চেনানো পথে হাঁটতে-হাঁটতে অন্য পথেরও দিশা দেখান। বলেন, 'এবার তবে কোনখানে যাই, মাঠ পেরিয়ে দীঘির ধারে? / কোথায় সে মাঠ, পুকুর ভরাট! রাস্তা কেবল ঘুরিয়ে মারে'। ছড়াবাহিত হয়ে আমাদের চেতনায় ধরা দেয় চেনাজানা পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি। *ঝিকিমিকি ঝিরিঝিরি*-র শেষ ছড়ায় জিজ্ঞেস করেন, 'একটা ছড়া উধাও বনে বনে / কোন ছড়াটা ধরলো তোমার মনে?' সত্যিই মৃদুলের ছড়া তাঁর সৃষ্টিকুশলতায় বিচিত্র পথে বেগবান হয়েছে।

ছড়াগুলো কতটা স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বয়ংক্রিয় তার ন্যায্যতা প্রমাণের স্বার্থে *ছড়া ৫০* গ্রন্থটি ওলটাতেই হয়। বাছাই করা এই ছড়ার প্রকাশভঙ্গি, বিষয়বস্তু, আকৃতি ও পরিণতি আপন শিল্পমহিমায় মনের গভীরে আনন্দের সুর ঝঙ্কৃত করে। এমন একটি ছড়ার অংশ — 'সিধু কানু ডহরের অতি আশেপাশে / রামধনু ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে'। কিংবা, 'ও ফড়িং ও জোনাকি, ও চড়ুই পাখি / আমি ওই নোনাডাঙা বস্তিতে থাকি'। এখানে শিশু-কিশোরের মনে ভৌগোলিক সীমা ভেঙে দিতে চান মৃদুল। এই লেখাগুলিতে 'শিশুতোষ' ছাপ্পা লাগালে বালখিল্যতার পরিচয় দেওয়া হবে। তবে কি পোশাকি নাম হতে পারে 'কিশোর কবিতা'? এই রচনা তো কিশোরের মনোজগতের ইচ্ছে-খুশি নিয়েই গড়ে উঠেছে। কিন্তু কবিতা হিসেবে এর ভাব অতি সরল। এবং শব্দও যথাসম্ভব সহজবোধ্য। মনের ওপর চাপ পড়ে এমন কোনো সংকট এই কবিতার উপজীব্য নয়। তাই মৃদুলের কল্পনানুষঙ্গ পরিপার্শ্বের প্রকৃতি ও প্রাণিজগতেই বিচরণ করে। প্রাধান্য পায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আশা ও স্বপ্নময়তা। উঁকি দেয় আধুনিক রূপকথার জাদুর ভুবন। মৃদুলের মতো যোগ্যতাসম্পন্নের হাতে অলংকারের প্রয়োগ পাঠককে আনন্দভুবনের বাসিন্দা করে তোলে। আমরা জানি কিশোর বয়সে জীবনের সব গুরুভার অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়া যায় না। এই সময়কালে শৈশবের বিস্ময়সর্বস্বতার থেকে বেরিয়ে আসতে চায় কিশোর মন। জীবনকে তারা দেখে শৈশবকাল ও জীবনাভিজ্ঞতার সন্ধিক্ষণে। মৃদুল এই জীবনস্তর নিয়ে খুব সচেতন এবং শব্দপ্রয়োগে বলীয়ান। কল্পনাশক্তি নির্ভর ব্যঞ্জনার্থের দিকে জোর দেন। অনুষঙ্গ হয়ে আসে যেমন লাল ঘুড়ি দিয়ে আকাশ দখল করার ইচ্ছে, তেমনি জিজ্ঞাসা চিহ্ন আঁকেন, সরস্বতীর হাঁস কি এমএ পাশ করা? সরস্বতী নিজে কি বিদ্যালাভ করেছেন কেমব্রিজে? তাই শুধু কিশোর কেন, সবশ্রেণির কাব্যানুরাগীরা আস্বাদন করতে পারেন এই রচনার পূর্ণ স্বাদ। যেখানে উপজীব্য কিশোরমনের চাওয়া-পাওয়া, দুরন্তপনা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, দুঃখ-কষ্ট ও রহস্যময়তা। ছন্দদক্ষ মৃদুল কখনো স্বরবৃত্তে কখনো বা মাত্রাবৃত্তের বিভিন্ন চালে বৈচিত্র্যসন্ধানী নিরীক্ষায় মেতে ওঠেন। জীবনের কঠিনতম সত্যও এখানে খুশির রসে ডোবানো থাকে। যুক্তিহীনতার আঁকিবুকি দিয়ে হালকা করে দিতে চান জীবনের অনেক রূঢ়তা। এটাই মৃদুলের বৈশিষ্ট্য।

মৃদুলের ছড়ায় এমন অজস্র নির্মোহ উদাহরণ রয়েছে যেখানে দক্ষতা, সৃষ্টিশীলতা কিংবা উৎকর্ষের ছাপ মেলে। কোনো বস্তুর বাহ্যিক রূপের চাইতে অন্তরের উপলব্ধি প্রতিভার মাধ্যমে প্রকাশ করেন কল্পনা ও আবেগ জড়ানো ছড়ায়। ভাষা ও রূপারোপে রূপক ও প্রতীক ব্যবহৃত হতে দেখি বারবার। ছড়ায় বিকিরিত শব্দমালা শব্দের সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করে তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। শব্দ হয়ে ওঠে মানসলোকের প্রতিফলন। অঞ্চল-অতিক্রান্ত সর্বস্থলের সত্যি ছড়ার সামগ্রী তখন। অভিধান-অতিক্রমকারী জাদুময়তা ছড়া সৃষ্টিকর্মের প্রতিটি পদে-পদে উদ্ভাসিত হতে থাকে। যেন দৃষ্টিগোচরতায় অনুভব করার আবেগময় কৌশল। তাঁর ছড়া হয়ে ওঠে সময়, স্থান এবং অনন্তবোধের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টিগ্রাহ্যতার অনন্য প্রতীক। যা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কোনো বিশেষ নীতি বা মতাদর্শে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। বলা যায়, একধরনের রুচিশীল সূচীশিল্প। নকশিকাঁথায় যেমন সূচ-সুতো দিয়ে বিচিত্র চিত্রের মাধ্যমে ও আঙ্গিকে নান্দনিক অবয়ব সৃষ্টি করা হয়। সেটি তখন হয়ে ওঠে শিল্প পদবাচ্য। যার জন্ম-উৎস অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয় সংবেদনে। মনোবিশ্লেষণ-ধর্মীতা ও প্রতীকী পরিচর্যায় ছড়া স্থান পায় আত্মতৃপ্তির চরম শিখরে। সংকেতগর্ভ ভাষায় নির্মিত হয় কল্পনার ঈশ্বর্য। যা প্রাণোদীপ্ত, টানটান এবং রসমণ্ডিত ভাবসম্পদ। মানবিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতা, মননের দীপ্তি এবং বর্তমানতার প্রখর বাস্তববোধ তাঁর ছড়াকে মহিমান্বিত করে তোলে। নইলে মৃদুল কী করে লিখবেন, 'হতেও পারে এই পৃথিবী অবাক কত কাণ্ডে ভরা / রামধনুটির পাশে যে মেঘ, সে মেঘ যেন চশমা-পরা'। কিংবা, 'আয়রে আমার পূর্ণচন্দ্র স্কুলের যত বন্ধুসকল / আমরা লাফাই, আমরা ঝাঁপাই, আমরা করি রাজ্য দখল'। এখানে মৃদুল দৃশ্য বা অদৃশ্যকে নিজস্ব চিত্তরসে রসায়িত করে স্থিতিশীল রূপমহিমা দান করতে সচেষ্ট। অন্তরকে বাইরে এবং বাহিরকে অন্তরে প্রবেশ করানোতে যত্নবান স্বকীয় মুনশিয়ানায় আর তখনই মনে হয়, মৃদুলের সব ছড়াই ছড়া নয়। কোনো-কোনোটা কবিতা। শিশু-কিশোরদের জন্য নয়, শিশু-কিশোর মনের জন্য। তাঁর ছড়ার সব লাইন ছড়া নয়। কোনো-কোনো লাইন কবিতা। আবার ছড়ার ভেতরে কখনো বা একটি শব্দই উৎকৃষ্ট কবিতা। পাঠকের মনেও অধিক্ষেত্রের সীমবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখার ব্যাপ্তি, গভীরতা কিংবা বোধগম্যতার সীমারেখা বলে সত্যিই কি কিছু নির্ধারিত আছে? কালের পালাবদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের মনোজগতেও ঘটে চলেছে পরিবর্তন। ছড়ালিখিয়েরা অনেকেই এই ধারাটিকে সমভাবে ধরতে পারেননি। যাঁরা পেরেছেন তাঁদের ঘটেছে বৈপ্লবিক উত্তরণ। কিন্তু মৃদুলের ছড়া মনভোলানো হালকা বিনোদনের পদ-রচনা পর্যায়ে ঘুরপাক না খেয়ে অঙ্গে-অন্তরে বারবার বদলে গেছে। ছড়ায় স্থান পেয়েছে বিভিন্ন অসঙ্গতি-ছলা-কলার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও প্রতিবাদ। তবে সেই পঙ্‌ক্তিনিচয়ে উচ্চকিত সুর নেই। সামাজিক দায়বদ্ধ ছড়ার মেদহীন অঙ্গে লেগে গেছে উগ্রতাহীন ব্যঙ্গ। ছড়া এই যুগদ্রষ্টার কলমে হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ কবিতা। তখন মৃদুল সত্যকে দেখেন জীবনসত্যের আলোকদীপ্ত অন্তর-চেতনায় বর্তমানকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যত পরিণতি পর্যন্ত। ছন্দ-মিলের নিপুণ বিন্যাস দেখে মনে হয় ছড়া নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি নিখুঁত, নিটোল ছন্দের চাল আর মিলবিন্যাসের অঙ্ক কষে গেছেন। ছন্দ আর শব্দ তাঁর কাছে যেন পোষমানা পাখি। নির্দেশ অনুযায়ী সঠিক স্থানে-স্থানে বসে গেছে। এক-একটি পঙ্‌ক্তিতে ঝিলিক দিয়ে গেছে এক-একটি ছবি। সব ক-টিই টুকরো-টুকরো ছড়ানো। মৃদুল সেই ছড়ানো ছবির ছন্দিত কাঠামো তৈরি করেছেন তাঁর ছড়ায়। ছড়া যেন বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় নতুনভাবে বাঁক নেবার জন্য দম নিচ্ছে। যা প্রথাগত জীবন বা জীবনভাষ্যের বাইরে। হয়ে উঠেছে অনেক বোধসম্পন্ন, প্রায়োগিক চেতনার ধারক এবং যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক। গঠনশৈলী ও ভাবের ভিন্নতায় এ এক তরতাজা কাব্যচিত্রায়ন। যা শব্দের নৃত্যায়নে কল্পনার উৎসুকতাকে

দিচ্ছে পূর্ণবিকাশিত বুদ্ধির আনন্দ। যে ছড়া বাচিক শিল্পীদের কণ্ঠে শুনে মন ভরে না। অলস মনে একা-একা পড়ার সাধ হয়। নয়তো বর্ণের বদলে বয়েস ১০, ৩নং বাস কিংবা ২৭ মিনিটের মতো সংখ্যা ব্যবহারের মৃদুলীয় পেটেন্টের স্বাদ পাব কী করে? ছড়ার মিহি আবরণের তলবিতলে গভীর অর্থের দ্যোতনা টের পাব কী করে? মৃদুলের সৃষ্ট সামান্তরাল পৃথিবীর ভেতর ঢুকে ছড়াগুলোকে আবছা মনের সঙ্গী করে নিই। মৃদুল সেখানে সরাসরি বলেন, 'ভাবতে পারো আমায় পাগল, তাতে আসে যায় না কিছুই / এই দেখো না হাওয়ার ভেতর আমার মায়ের মুখখানি ছুঁই'। আপন সত্তা নিয়ে স্বকীয় ধারায় মৃদুল এসেছে মাটি খুঁড়ে, হৃদয়ের গহন খুঁড়ে, ছড়ার বন্ধ্যাত্ব কাটাতে। মৃদুলের ছন্দময় রচনাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, আমার প্যারাডাইমে সে কিন্তু ছড়াসাহিত্যিক।





মৃদুল দাশগুপ্তের গদ্য : দর্পণে বিম্বিত যেন...

জয়িতা দাশগুপ্ত

কবিতা সহায় বা *সাত পাঁচ* দেবতার হাতে লেখা নীল চিঠি মনে হয়। চূড়ান্ত ব্যক্তিগত অনুভব-সঞ্জাত, অথচ গাঠনিক দিক থেকে নির্মমভাবে সর্বজনীন যেন। এ অনুভব নিরুপায়ের, লাইনের পর লাইন জুড়ে সত্যির মতো রূপকথা, যা প্রকৃত ঘটনার চেয়েও বেশি প্রকৃত, তাকে এড়াতে না পারার ব্যর্থতায়। মৃদুল দাশগুপ্ত যে গদ্য লেখেন — তার কাঠামো অতীতচারণের, আর রক্তপ্রবাহে মিশে আছে, মৃদুলের পরিবারের কবিতা, কবিতার পরিবার। পড়তে-পড়তে মনে হয়, এমনটাই তো ভাবার কথা ছিল, বলার কথাও ছিল হয়তো। আর, যদি তাঁর গল্পের কথা ভাবি, যে সীমিত সংখ্যায় তিনি লিখেছেন, তার চেয়েও সীমিততর, যা আমার পড়া — কেমন যেন ঘেঁটে দেয় আমায়। *ধান... পান... তারামাছ* গল্পে অভ্রদীপের চেতনায় ফিরে-ফিরে আসে যা, 'তা এক সামন্তকন্যার হাসি, হাওয়ার হাওয়ায় যা চিরকালীন, ধানের পাশাপাশি পানের বরজেও যেন উমনো-ঝুমনো, পরতে-পরতে তার ঝাঁঝ'। তার মনে পড়ে, 'বাংলার নীল-সবুজ বটানির অপরূপ কুহেলিতে ওরা ঘুরছিল ভিয়েতনামি গেরিলা, ফিদেল রাউলের খুদে সাকরেদরা'। আবার সুধন বেরা '...পিতা নিবারণ বেরা, মল্লিক পাড়া, পুরন্দরপুর... তারকেশ্বরে টুলু পালের গদিতে খাতা লিখত, শেষে এই সার্কাসে' — সেও তো মিথ্যে নয়! সত্যি আর না-সত্যির মাঝখানে যে ধোঁয়া-স্তর, সেখানেই কেমোফ্লেজ করে থাকে মৃদুলের চরিত্ররা। তাই *পার্টি বলেছিল* গল্পে মধুসূদন বড়াল-চিরন্তন বসু বা *বাংলার ছোটোখুকি* গল্পে পৃথা-সুচরিতা বা আরও এগিয়ে গিয়ে *পুরুষের অভিমান* গল্পে দুই সোনালি সেনগুপ্ত, গালে টোল, আঙুলে আঙুল নিয়ে অক্ষয় বেঁচে থাকে। কী বলব একে? '...দর্পণে বিম্বিত যেন উপস্থিতি ছাড়া'?

গদ্যের বারান্দায় মৃদুলের অবস্থান বড়ো সংহত, নরম অন্ধকারে অনুচ্চার বসে থাকার মতো। মৃদুলের গল্পে যখন 'মক এনকাউন্টার' এসেছে, ওই সময়ে না-জন্মানো থ্রিলড আমি হয়তো ভেবেছি, 'হ্যান্ড-হেল্ড ক্যামেরায় জার্কি মুভমেন্টস'; ভেবেছি, 'মৃণাল সেন আ লা কলকাতা ৭১'। ভেবেছি, সেই রাঙা ঝড়ের প্রত্যক্ষ ঝাপটা লেগেছে যাঁর গায়ে, তাঁর গদ্যে ফিরে-ফিরে আসবে তথাকথিত রোম্যান্টিক আবেদন, সেইসব বাজারচলতি শব্দ যেগুলো আজও আমি উচ্চারণ করি, টাকরায় নিয়ে নুন-তেলে জারানো নিষিদ্ধ, সুস্বাদ আচারের মতো। কিন্তু, খাওয়া-ঘুমের মতো নিবিড় যাপনে আত্মস্থ করা আছে তাঁর সেই দিনের জীবন, তার স্পর্শটুকু শুধু রয়ে গেছে তাঁর লেখায়, ইশারার মতো। তিনি যখন সমসময়ের কথা বলেন, সেইসব চোরা আগ্নেয় স্রোত সমান্তরালে চলতে থাকে, হয়তো মৃদু ভূকম্পনের মতো কিছু শব্দ, বাক্য তৈরি হয়। বোঝা যায়, মৃত নয়, ঘুমিয়ে রয়েছে শুধু। তাই, ২০০১ সালে *দিবারাত্রির কাব্য*-র গল্প সংখ্যায় প্রকাশিত *অ্যাকশনের পর বিপ্লবীকে স্বাভাবিক থাকতে হয়* গল্পে সুশোভন খালি ভেবে চলে 'শ্রেণিশত্রু খতমের ৭টি পদ্ধতি'! অবশেষে অ্যাকশনের সময়!

> ...কৃষকদের কাছ থেকে নয়, ওষুধ, রাসায়নিক এত ঘাঁটাঘাটি করি আমি, পটাশিয়াম সায়ানাইডের ছোট বোতলটা জোগাড় করতে আমার অসুবিধা হল না। তারই একচিমটে হোমিয়োপ্যাথির শিশিতে ভরে আমি আমার জ্যাঠশ্বশুরের বাড়ি গেলাম গতকাল সন্ধেয়।
>
> ...গতরাতে আমি এক ফাঁকে সবার নজর এড়িয়ে দুধের গেলাসে হোমিওপ্যাথির শিশির সবটা ঢেলে মৌরি চিবুতে চিবুতে মোটরসাইকেলে ফিরে এলাম।
>
> এমন শান্তিপূর্ণ ঘুম জীবনে ঘুমোইনি। সকালে তুমি বললে মীনা, 'জেঠুর অ্যালসেশিয়ানটাকে সাপে কেটেছে। অ্যাসিডের জন্য জেঠু দুধ খায়নি, লুসি সে দুধ খেয়ে বাগানে যেতেই সাপের কামড়।'

এইভাবেই হয়তো বিপ্লব মুখ থুবড়ে পড়ে!

আদ্যোপান্ত পারিবারিক মানুষ মৃদুল দাশগুপ্ত, যাঁর লেখায় কিছু মায়া থেকে যায়, নিজের লেখা কখন হয়ে ওঠে নিজেদের লেখা, স্রেফ পারিবারিক অমরত্বের তাগিদে এক মগ্ন আত্মকথনে অনন্য হয়ে ওঠে। হঠাৎ মন-কেমন করে ওঠে আমার। আমিও যে বিশ্বাস করি '...এই যে — এইখানে, বেহুলাও গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে ...ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়... এই তো বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের বেহুলা বরিশালের — বরিশালের'। বরিশাল — যেখানে আমি তো কোন ছার — আমার মা-বাবাও জন্মাননি — সেই ক্ল্যানে আমি একাত্ম হয়ে যাই মৃদুলের লেখার সঙ্গে। 'আমি বরিশালের' — একথা বলতে এখনও ঈষৎ বিদ্যুৎস্পন্দন জাগে, সকৌতুকে আয়নায় দাঁড়িয়ে বুঝি, এ আমার পরম্পরা। বাবা বরিশালি, মা বরিশালি — এমন খাঁটি নিকটতম পূর্বপুরুষ পাওয়ার গর্বে কেন যে উল্লসিত হই — এ মৃদুল দাশগুপ্ত ছাড়া আর কেউ বুঝবেন না! ওইখানে আমার এক ঘর আছে, জানি না সিন্দুক আছে বা ছিল কি না, অতীতের শব্দ-গন্ধ — যা আমার পূর্বপুরুষের, তার কিছু অবশেষ আছে বা নেই... তবু যদি একবার ছুঁয়ে আসি... একবার ছুঁয়ে আসা যেত...

> আইথে শাল, যাইথে শাল, হ্যারই নাম বইরশাল। অর্থাৎ, আসতে বাধা, যেতেও বাধা, তারই নাম বরিশাল। শিশুকাল থেকেই জেনে এসেছি ওই আমাদের দেশ। এমনই নদীনালা, জলাভূমি, চর, দ্বীপময় ওই জেলা, যে ব্রিটিশরা রেলপথ স্থাপনে ওই ভূমিতে গিয়ে পরাভূত হয়েছে, এ নিয়ে সেই শৈশবে আমার পিতৃকুলের বর্ষীয়ানদের গর্বের অন্ত ছিল না।
>
> ...আমি নিজে বরিশালে জন্মাইনি। তাতে কী! চীনারা যে-দেশেই জন্মাক, তারা চীনা। তেমনই আমরা বরিশালের।

আমি জন্মেছি উত্তরপাড়ায়, পড়েছি শ্রীরামপুর কলেজে। আমার জন্মভূমি, চারণভূমির সঙ্গে দর্পণের বিম্বিত মিল মৃদুল দাশগুপ্তের। কিন্তু স্থানিক মিল নয়, মৃদুলের এইসব ব্যক্তিগত গদ্য আসলে চকমকির ঠোকায় তৈরি হওয়া ফুলকি, যা পাঠকের বহুদিন আগে জমিয়ে তোলা, ভুলে যাওয়া খড়কুটোয় আগুন উস্‌কে দেয়। শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া-বহরমপুর-বরিশাল-ফরিদপুর-চাঁপাডাঙা মিলে যায় কোনো এক জাদু-যোগাযোগে, মানুষ বিশ্বাস করে, অতীতের খোলাচিঠি একদিন তার কাছে পৌঁছোবেই, যার ডাকঘরের ছাপ একদিন তার স্মৃতির কাছে গচ্ছিত ছিল। এইখানেই মৃদুলের সার্থকতা — ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে নিজের কথা বলে যাওয়ার মতো — লেন্স যাকে অনুবাদ করে সকলের ভাষায়। মৃদুলের লেখায় বারবার ফিরে আসা বিনয় মজুমদার, দেবদাস আচার্য, বিশ্বনাথ গরাই — কবিতাসক্তের সুরা বটে, কিন্তু যারা কবিতার পাঠক্রমে আনাড়ি তাঁদের ক্ষেত্রে? যখন পড়ি, 'গুপ্ত পুথিগুলিই ক্রমে ধর্মগ্রন্থ হয়ে যায় এবং কবিরাই এর প্রণেতা', বা 'ধানের গন্ধ, মেঠো আলুর খুশবু লাগা এসব কবিতা গ্রাম চাঁপাডাঙা থেকে হুগলির শিল্পাঞ্চল পেরিয়ে চারনকের নগরের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। বরজের পানের মসৃণ ঝাঁঝেও ভরপুর এসব কবিতা। রোদে ঝলমল বা জ্যোৎস্নালোকিত এসব কবিতা কোথায় যাচ্ছে?' — কোথায় যাচ্ছে এসব ধর্মগ্রন্থ, বা কোথায় রয়েছে, ভবিষ্যৎ-অনুসন্ধিৎসুর অপেক্ষায় — এই আগ্রহেই হয়তো আরও কোনো নাম যোগ হয় বাংলা কবিতা-খেতের পাট্টাধারীর দলে। হয়তো সে-ও একদিন নিজের জমির স্বপ্ন দেখে, নিজের ফসলেরও।

মৃদুলের গদ্যে বারবার ফিরে আসে তাঁর কবিতারা। তাই *কবিতা সহায়*-এ পাই *ফুল* ও *নিজেকে নিদ্রিত দেখে*-র প্রসঙ্গ নির্মাণ আর *সাত পাঁচ*-এ ফিরে আসে *নিজেকে নিদ্রিত দেখে বিষয়ে আবার*। কিন্তু কেন? কবিতা যখন তাঁর কাছে 'স্বয়মাগতা', 'পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া', 'ধ্যানে প্রাপ্তি' — তখন জাস্টিফিকেশনের কী দায়বদ্ধতা তাঁর? এ প্রসঙ্গে খেয়াল করলে দেখা যায় দু-টি কবিতাই একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মুহূর্তের ফলন। তবে কি মৃদুল চাননি, এ কবিতা প্রত্যেক পাঠকের কাছে ব্যক্তিগত হয়ে উঠুক। এ দু-টি লেখাকে সর্বজনীন করে তোলায় কোথাও কি বাধা ছিল তাঁর? তাই কবিতার মন্ত্রগুপ্তি ছেড়ে, পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কমিউনিকেট করার জন্য গদ্যের হাত ধরতে হয়েছে তাঁকে।

> দ্বিধা কাটাতে এতোই সময় যায় আমার, থাকি এমনই সংকোচে যে, গদ্যে নিজের কবিতা বিষয়ে কিছু লেখার সামর্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগছে এখন। টের পাচ্ছি আত্ম অবরোধ, যেন মন প্রশ্ন তুলছে অধিকারবোধ নিয়েই। পথ কুড়িয়ে পাওয়া থেকে ধ্যানে প্রাপ্তি, স্তরের পর স্তর মেঘ সরিয়ে নেমে আসা কবিতার, — আমার বিশ্বাস এরকমই। কিন্তু সে বিশ্বাসে যদি একটু অহং লেগে যায়, আমি সেই লজ্জাভয়ে লুকিয়ে থাকি। কবিতাই দেয় সেই গোপনীয়তার আড়াল, কিন্তু গদ্যে সে নিভৃতি নেই।

এই আত্ম-অবরোধ পেরিয়ে ব্যক্তিগত গদ্য লিখতে বসা কি তবে অতি-ব্যক্তিগত কবিতার মালিকানা নিশ্চিত রাখার দায়ে?

১৯৭৭ সালে বেরিয়েছিল মৃদুলের প্রথম বই, নাম — *আমি আর পিপি*। কী আশ্চর্য, সে-বই কবিতার নয় — তিনটি গল্পের এক সংকলন। তবে, পরবর্তীকালে শুধুমাত্র কবিতার হাত ধরবেন বলে ওই বইটিকে তিনি অস্বীকার করতে থাকেন। ২০১০ সালে পৌঁছে তিনি *বোধশব্দ*-কে জানিয়েছেন, 'বইটি সম্পর্কে এখন আমার কোনো দুর্বলতা নেই। ...সে যেন হারিয়ে গিয়েছে।' তবু বড়ো অবাক হই এ দেখে যে, মৃদুলের লেখা গল্প তথাকথিত কবির লেখার গদ্যের সমধর্মী নয়। যে স্বচ্ছন্দ মুনশিয়ানায় তিনি কাট করে-করে এগোন দৃশ্যের পর দৃশ্যে, দৃশ্যকল্প জুড়ে-জুড়ে চোখের সামনে তৈরি করেন ছায়াচিত্র, তা দক্ষ কাহিনিকারের ধর্ম। মৃদুলের নিজের কথাতেই — 'এলোমেলোভাবে কবিতায় যা বলা, গদ্যে তা বলতে হলে, তা তো জলের ওপরে আনা মাছের অভিজ্ঞতা।' ঠিক সেইরকমই তাঁর গল্পের প্রতিটি



মৃদুল দাশগুপ্তের প্রথম বই; ১৯৭৭.

মোচড়, নাটকীয়তা — যেন দক্ষ গল্পকারের ঠাস বুননে স্পষ্ট। যে নিখুঁত ইশারাটুকু রয়েছে, তাতে কবিতার কুয়াশা নেই, গদ্যের বাঁক রয়েছে। ভালো বাণিজ্যিক ছবি তৈরির জন্য যেসব উপাদান প্রয়োজন, সে-সবই মজুত রয়েছে মৃদুলের গল্পের রান্নাঘরে। সবুজ কাচ-ঢাকা টেবিলে হাতের ছায়ার সঙ্গে জলতটে তিরতিরে তারামাছের অ্যানালজি — কী মোক্ষম সিনেম্যাটিক! বা, *পার্টি বলেছিল* গল্পে '...সন্ধ্যায় বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীতীরে লিলি আমার গালে কাদা লাগিয়ে দেয়, আমি ওকে জলে ভিজিয়ে দিই। এ বিবাহে শুকতারাটি সাক্ষী থাকে' — এ 'আত্রেয়ী বিবাহ' যেন *বিবাহ প্রস্তাব* কবিতার 'তোলো মুখ, এসো, ধরো হাত, চলো সঙ্গে' — পঙ্‌ক্তিটির দক্ষ চিত্রায়ণ! ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, গল্পের আঙিনায় মৃদুল যদি একখানা ঘর বাঁধেন, তা অনধিকারীর অনুপ্রবেশ হবে না। না-ই বা থাকলেন তিনি সেইখানে চিরস্থায়ী, আকস্মিক বিশ্রামেও যদি তাঁকে পাই, সেখানে সুবাতাস বইবে।

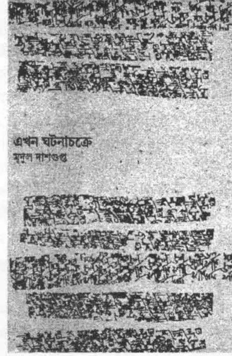
মৃদুলের গল্পে কোথাও যেন তিনি প্রচ্ছন্ন মিশে থাকেন গল্পের আঙ্গিকে, চরিত্রায়ণে বা হয়তো কোনো নামেও তাঁর ব্যক্তিজীবনের ছায়া পড়ে। কোথাও ১৯৯৯ সালের *ধান... পান... তারামাছ* গল্পে অভ্রদীপের প্রকাশিত কবিতার বই-এর নাম হয় 'সোনার বুদ্বুদ', আবার *পার্টি বলেছিল* গল্পে নকশালপন্থী গল্পকার মধুসূদন বড়ালের কবিবন্ধুরা ভাস্কর-তুষার-সুব্রত, প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁরা মৃদুলের অগ্রজ কবি। এইসব মিলে যাওয়ায়, যেন অঙ্কের সমীকরণে ডানপক্ষ আর বামপক্ষের সমতা প্রমাণের মতো উল্লাস বোধ হয়। নিজেকে তুখোড় গণিতবিজ্ঞানী ভ্রমে ভাবতে থাকি, মোরব্বা? সেও কি তবে? অথবা, তরুণ অধ্যাপক বালুরঘাটের অতীশ বিশ্বাস বা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশুমান ধর? এই ছায়া-ধরার খেলায় সুকৌশলে আমাদের প্রক্ষিপ্ত করেন মৃদুল। কারণ তিনি জানেন, যারা বন্ধু তারা বুঝে নেবে। যারা তাঁর মতো করে বোঝেনি, তারাও অন্যতর কোনো পথে অন্য কোনো ইশারা পাবেই, নিজেদের মতো করে।

এই লেখা লিখতে গিয়ে বারেবারেই ভেবেছি, কী স্পর্ধা আমার! জীবনের প্রথমতম গদ্য লেখার বিষয়ই মৃদুল দাশগুপ্তের গদ্য! এ কী সমাপতন, নাকি ফেঁসে যাওয়া! প্রচণ্ড ভীতিতে বেপরোয়া হয়ে কিঞ্চিত সাহসী হয়ে উঠেছি, তাই যেমনভাবে মনের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে অনুভবের পঙ্‌ক্তিমালা, সেভাবেই তাকে তুলে দিয়েছি অক্ষরে, কাজল-পমেটমের তোয়াক্কা না করে। এটুকু বলতে পারি, মৃদুলের কবিতার কাছে আমি নতজানু, তবু *কবিতা সহায়* বা *সাত পাঁচ*-এর মতো গদ্যসংকলন যদি আরও পাই, বা মৃদুলের একাধিক গল্পসংকলন, তা নিশ্চিতভাবে আমার বই-বাক্সের গহনা হয়েই থাকবে।

লিটল ম্যাগাজিন ও মৃদুল দাশগুপ্ত

সন্দীপ দত্ত

কবি মৃদুল দাশগুপ্ত (জন্ম ৩ এপ্রিল ১৯৫৫)-র প্রথম কাব্যগ্রন্থের (*জলপাইকাঠের এসরাজ*; এপ্রিল ১৯৮০) উচ্চারিত সংবেদ 'আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি' সমসময়ের জ্বলন্ত কণ্ঠস্বর। সত্তর দশকের উত্তাল রাজনৈতিক আবহাওয়া যখন মুক্তির দশক হিসেবে ঘোষিত, মৃদুলের বয়স তখন পনেরো-ষোলো। মৃদুলের ভাষায়, 'আমাদের যে সূচনা সময় ছিল, এত বছর পর সেদিকটায় তাকালে মনে হয় সেটা আসলে তৎকালীন সমাজ — রাজনীতির পরিস্থিতি — পালাবদলের একটা দিক ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তেই তখন ইতিহাসের মেলা শুরু হয়েছিল। এখানে কলকাতা-কেন্দ্রিকতা ভেঙে গিয়েছিল। গ্রাম-মফস্সলের একটা ঢেউ উঠেছিল।' (সাক্ষাৎকার, *পরিস্থিতি*, ১ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭)। গ্রাম-মফস্সল থেকে বেরোতে থাকে অজস্র লিটল ম্যাগাজিন। মৃদুলের কবিতা লেখালিখিও শুরু জন্ম-শহর শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হাতে লেখা কাগজ *ময়লা কাগজের বাক্স*-এ। কিশোর মৃদুলের কবিতাপ্রয়াস ওই হাতে লেখা কাগজে শুরু হলেও প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হল যে পত্রিকায়, তার নাম *শীর্ষবিন্দু*। এরপর মৃদুলের লেখালিখির জগতে ঢুকে পড়ল অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন। প্রথমপর্বে তার বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ধূর্জটি চন্দ সম্পাদিত *এবং* পত্রিকায়। একে-একে আলাপ হতে থাকে জয়-সুবোধ, কবি দেবদাস আচার্যর সঙ্গে। সারা পশ্চিমবঙ্গের নানা পত্রিকা জুড়ে মৃদুলের কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। হাওড়ার *অভিমান*, *উলুখড়*, *কবিকৃতি*, *রক্তমাংস*, *মহাপৃথিবী*; নদিয়ার *নির্জন*, *কবিতা যুগ*, *ভাইরাস*, *অনুক্ষণ*; পুরুলিয়ার *আকরিক*, *বীজ*, *আপেক্ষিক*, *শতভিষা*; কলকাতার *কণ্ঠস্বর*, *কবিতা দর্পণ*, *আত্মপ্রকাশ*, *শিলীন্ধ্র*, *কবিপত্র*, *সত্তরের কবিতা*, *পরমা*, *জনপদ*, *কবিতা সভ্যতা*, *কৃষ্ণপক্ষ*, *সংবেদ*, *দুই বাংলার কবিতা*, *কৃত্তিবাস*, *দেবীমুখ*; উত্তরবঙ্গের *ক্রুসেড*; বীরভূমের *পুনর্বসু*; মেদিনীপুরের *বররুচি*, *সম্প্রতি*; জামশেদপুরের *কৌরব*; হুগলির *শীর্ষবিন্দু*, *সাহিত্যসেতু*, *গোধূলিমন*, *সন্দীপন*; নবদ্বীপের *অজ্ঞাতবাস* প্রভৃতি অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনে।



শত জলঝর্নার ধ্বনি গ্রন্থমালা-র বই; ১৯৯১

কবিতা নিয়ে মৃদুলের বক্তব্য, কবিতার মধ্যে থাকে রহস্য-কুহক। কবির ভাষায় 'কুহক যাত্রা'। অপার্থিব রহস্যের মধ্য দিয়ে শব্দ-ভাষার টেকনিকে কবি খুঁজে পান কবিতার উত্তরণ। কবিতাভাবনা প্রসঙ্গে কবি বলেন — 'ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তা অল্পবিস্তর নিজের কথাই বলা। সে ভারী বিড়ম্বনার। হৃদয়-মস্তিষ্কের কবিতা প্রয়াসে নিজের কথাই বলি আমি, একেক সময় মনে হয়, তা আসলে একধরনের দিনলিপিই লিখে যাওয়া, কিন্তু তা কবিতার ভাষায় বলেই একটা আড়াল থাকেই —' (*বনানী*, ১৯ বর্ষ ১ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০০)।

সময়ের স্পন্দন থেকে কখনোই মৃদুল নিজেকে সরিয়ে নেয় না। সিঙ্গুরের কৃষিজমি উচ্ছেদ-ঘটনার আঁচ ওঁর মনকে বিদ্ধ করে। লিখে ফেলে সিঙ্গুর-ভাবনার কবিতাগুলি। উত্তরবঙ্গের একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনা থেকে বেরোয় সেই কাব্যগ্রন্থ *ধানখেত থেকে*।

কাহিনিকার্টুন



গিফ্‌ট দেখেই দে-ছুট

সাংবাদিকতার কাজে চম্বল। দস্যুদলের ঘনিষ্ঠ সুঘর সিং তোমার-এর সঙ্গে মোলাকাত। মাস দেড়েক বাগি-সঙ্গের শেষে ফিরবেন মৃদুল। বিদায়কালে সুঘর সিং উপহার দিতে চাইলেন একটি স্টেনগান ও একটি ময়ূর। অতঃপর, কার্যত পলায়ন! সোজা শ্রীরামপুর, ভায়া হাওড়া।

মৃদুলের কবিতার ভূগোল বিস্তৃত। 'পুরুলিয়ার সাহেব বাঁধে, চাঁপাডাঙার সিনেমাতলায়, কৃষ্ণনগরে জলঙ্গী কিনারে, শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের মোড়ে, তমলুকে মাতঙ্গিনী চত্বরে, ঢাকার শাবাগে আজিজ মার্কেটে, টাঙাইলের পূর্ব আদালত পাড়ায় আমাদের কবিতা কম্যান্ড' (*কবিতাভাবনা ও কবিতা, এবং মুশায়েরা*, ৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৮)। নিজেকে 'রঙিন মানুষ' ভাবতে ভালো লাগে মৃদুলের একারণেই। এহেন মৃদুলের প্রতিবাদীসত্তা বারবার উঠে এসেছে। গৌরবের সঙ্গে শ্লাঘার সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে থাকতে চেয়েছে, আবার 'প্রমোটারতুল্য জাল লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের সম্পর্কেও' থাকতে চেয়েছে সতর্ক। মনে পড়ছে ১৯৮৯-এ কৃষ্ণনগর স্টেডিয়াম সংলগ্ন জেলাপরিষদ কক্ষে দু-দিন ব্যাপী কবি-লেখক সমাবেশে ওর উত্তেজনা উৎসাহের অনুভূতি। লিটল ম্যাগাজিনের লেখক হিসেবে নিজেকে গর্বিত মনে করে বাণিজ্যিক কাগজে না লেখার প্রতিজ্ঞা করেছিল সেদিন। গর্বের সঙ্গে ওর উচ্চারণ — 'I am a product of little magazines' (The *Sunday Times*, ১ জুলাই ২০১২)।

নিজে কোনোদিন পত্রিকা সম্পাদনা করেনি, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা প্রসঙ্গে ওর মন্তব্য — 'লিটল ম্যাগাজিন করার কথা ভাবি, সবসময় ভাবি। কিন্তু এগুলো যাঁরা করেন তাঁদেরকে একটু সংগঠক হতে হয়। আমি এটাতে একেবারেই সক্ষম নই। ফলে কঠোরতার সঙ্গে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করার ইচ্ছে থাকলেও যেহেতু আমি সংগঠক নই, কিছু পারব বলে মনে হয় না' (সাক্ষাৎকার, *হিল্লোল*, মে ২০০২)। 'পারব বলে মনে হয় না' বললেও মৃদুল ১৯৮৯ সালে *শত জলঝর্নার ধ্বনি* নামে যে কবিতার সংকলনটি সম্পাদনা করেছিল সযত্নে, নানান লিটল ম্যাগাজিন, গ্রন্থ থেকে কবিদের কবিতা আহরণে, তা থেকে মনে করতেই পারি ওর সম্পাদনা-ক্ষমতাটি ঈর্ষণীয়। আসলে একথাও ঠিক, কবিতা লেখা আর সম্পাদনার কাজ একই সঙ্গে করা খুবই কঠিন। সৃজনশীলতার পাশাপাশি নিয়মিত সংগঠিতভাবে লিটল ম্যাগাজিন নির্মাণ করতে চায়নি মৃদুল।

১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করল হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী মৌলবাদীরা। মনে পড়ছে, ১৯৯৩-এর বইমেলায় হিন্দুত্ববাদী বাল ঠাকরের প্রতি ধিক্কার জানাতে মৃদুল কালো চুল দিয়ে বাঁধানো পাপোশ নিয়ে এসেছিল লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে। ওই পাপোশ লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের মাড়িয়ে যেতে হবে! আমরা এইভাবে প্রতিবাদ করেছিলাম সেদিন। সমস্ত পরিকল্পনাটাই ওর। অভিনব প্রতিবাদ নিঃসন্দেহে।

সত্তর দশকের এক ঝাঁক কবি ২০০২ সালের শেষদিকে বাংলাদেশের ঢাকায় ও নানা শহরে গেছিলেন। সেই দলে মৃদুলও ছিল। এক সুবোধিসম্পন্ন কবি ওখানে মন্তব্য করেন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা বলে কিছু নেই। বিনয় মজুমদার সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যও করা হয়। মৃদুল প্রতিবাদ করে সোচ্চারে এবং মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মৃদুলের রাগ বেরিয়ে আসে একজন সৎ কবি-লিখিয়ে হিসেবেই।

মৃদুল বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। মৃদুলের জয় হোক।

ঝলকে জীবন : কবি মৃদুল দাশগুপ্ত

সম্বিত পাল

বরিশালের গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রাম। একটি বাড়ির ধ্বংস্তূপের দিকে তাকিয়ে বাবা ও ছেলে। বাবার চোখে জল। ছেলের বুকে 'নাস্তিকের পুণ্যলাভ'-এর তৃপ্তি। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর বাবাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন এই ভগ্ন বাসস্থানের সামনে। এখান থেকেই একদিন জ্যোৎস্নাকুমার দাশগুপ্ত রওনা দিয়েছিলেন কলকাতার উদ্দেশে। সব কিছু ফেলে রেখে। চাকরির সন্ধানে। ১৯৪১-৪২ সাল নাগাদ। কলকাতায় সেনা বিভাগের অ্যাকাউন্টেন্টের চাকরি পেলেন। পরে জাপানি বোমার ভয়ে সে চাকরি ছেড়ে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে বাসা বাঁধলেন। বিয়ে করলেন যশোরের সান্ত্বনা দাশগুপ্তকে। যোগ দিলেন বিমা কোম্পানিতে।

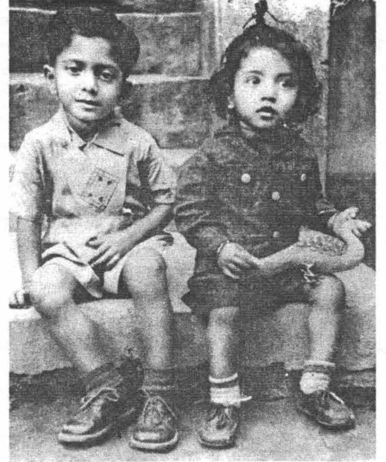
১৯৫৫

এঁদেরই বড়োছেলে মৃদুল দাশগুপ্ত। জন্ম ৩ এপ্রিল। শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে। তিন ভাই আর এক বোন। মৃদুলের নামকরণ করেছিলেন তাঁর এক পিসি। শোভনা। তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। সে-মৃত্যু খুব বেদনাদায়ক ছিল পরিবারের কাছে। তাই কোনো স্মৃতি রাখা হয়নি বাড়িতে, বাবা-কাকারা অবশ্য নিজের মতো করে ডাকনাম রেখেছিলেন মৃদুলের, বাবা ডাকতেন 'মিলন'। কাকা ডাকতেন 'চন্দন'। মামারা কেউ 'গৌতম', কেউ বা 'পার্থ' নামে ডাকতেন।

আর নিজে 'মৃন্ময় গুপ্ত' ছদ্মনামে লেখালিখি করেছেন। 'সেলিম পারভেজ' ছদ্মনামে এঁকেছেন নানা প্রচ্ছদ।

১৯৫৯

প্রথমবার স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়। তখন মৃদুলের বয়স চার। স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তখন পাড়ার মাঠে বাগানে ছুটোপাটিতেই আনন্দ। বেনেপাড়ার বাড়ির পিছনের মাঠে আলাপ একটি ছেলের সঙ্গে। সেই ছেলেটি দাবি করেছিল, সে মাঠ থেকে প্রজাপতি আর ফড়িং ধরে নিয়ে যায়। নিজের বাগানে পোষে। মজা পান মৃদুল। বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। সেই ছেলেটিই জীবনের প্রথম বন্ধু, তপনকুমার দত্ত।



শিশু মৃদুল (বাঁদিকে), সঙ্গে ভাই অঞ্জন; ১৯৬০

১৯৬০

এবার বিদ্যালয়-পাঠ শুরু। ভর্তি হলেন শ্রীরামপুরে পূর্ণচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রথম দিনেই একটি ছেলের সঙ্গে মারপিট হয়। মাস্টারমশাইরা বন্ধুত্ব করিয়ে দেন ছেলেটির সঙ্গে। কিন্তু স্কুল শেষের পর ইন্দ্রনাথ লুকিয়ে ছিল রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের পিছনে। চকিতে এসে মৃদুলকে ঘুঁসি মারে। প্রতিশোধ নেয়। পরে অবশ্য শত্রুতা থাকেনি। নির্বিঘ্নেই কাটে পরের চার বছর। এখন তুমুল বন্ধুত্ব।

১৯৬৪

শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হলেন মৃদুল। ঝোঁক ছিল ইতিহাস-ভূগোলে। আর প্রচণ্ড ভয় অঙ্কে। ম্যাপ দেখে দেশ বা নানা জায়গা খোঁজার অন্যরকম আগ্রহ ছিল তাঁর। স্ট্যাম্প জমানোর নেশা থেকে সে-ঝোঁক

বেড়েছিল আরও। আজ নানা দেশের দুষ্প্রাপ্য ও দামি প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার স্ট্যাম্পের বিয়াল্লিশটি অ্যালবাম তাঁর সংগ্রহে।

১৯৬৬

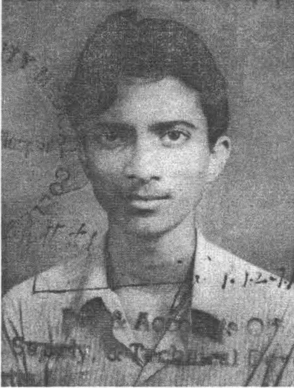
স্কুলজীবন থেকেই সাঁতার কাটতে আর ফুটবল খেলতে ভালোবাসলেও, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা জন্মাল লেখালিখির প্রতি। ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণি থেকেই। প্রথমে লিখতেন ছড়া। তারপর হাত পাকালেন কবিতায়। ১৯৬৬ সাল নাগাদ তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হল। স্কুল ম্যাগাজিনে। কবিতার নাম *মোমবাতি*। সেই সময়েই *ছোটদের কাগজ*-এ প্রকাশিত হল ছড়া।

১৯৬৮

স্কুল ম্যাগাজিনের বাইরে প্রথম ছাপার অক্ষরে কবিতা প্রকাশিত হল। *শীর্ষবিন্দু* পত্রিকায়। এ-বছরই *পল্লীডাক* কাগজে প্রকাশিত হল কবিতা *স্ফিঙ্কস্*।

১৯৬৭-৬৮

ছাত্রাবস্থাতেই রাজনৈতিক ঢেউ আছড়ে এসে পড়ল মৃদুল দাশগুপ্তের জীবনে। নকশালবাড়ির ঢেউ। সময় ও ঘটনার প্রবহমাণতা মিলিয়ে গেছে আজ। কিন্তু স্বপ্ন হারিয়ে যায়নি। তা রয়েছে কবিতায়।



উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী; ১৯৭১

১৯৭১

অঙ্কে এতই ভয় বরাবর, শুধুমাত্র পাশ নম্বর পাওয়ার মতো অঙ্ক কষেই পরীক্ষার উত্তরপত্র জমা দিয়ে চলে আসতেন তিনি। কিন্তু নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান শাখাতেই ভর্তি হতে হল তাঁকে। এক ইঞ্জিনিয়ার পিসেমশাই-এর চাপে। সেবার অবশ্য একশো নম্বরের উত্তরই দিয়েছিলেন। পেয়েছিলেন তিরাশি। পদার্থবিদ্যা-রসায়ন-অঙ্ক নিলেন। সঙ্গে চতুর্থ বিষয় জীববিদ্যা। পদার্থবিদ্যার অঙ্ক ভালো না লাগলেও, রসায়নের অঙ্ক মৃদুলের কাছে পদ্যের মতো লাগত। বিজ্ঞান নিয়েই ১৯৭১-এ হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলেন।

১৯৭৩-৭৪

পড়াশোনার সঙ্গে লেখালিখি চলছে তখন পুরোদমে। ১৯৭১ সালে ধূর্জটি চন্দ সম্পাদিত *এবং* লিটল ম্যাগাজিনে মৃদুলের সাতটি কবিতা ছাপা হয়। কবিতা সিংহ তার থেকে তিনটি কবিতা নিয়ে নেন। ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ কবিতা সিংহ প্রকাশ করেন তাঁর সম্পাদিত কবিতা সংকলন। *সপ্তদশ অশ্বারোহী*। সত্তর দশকের সতেরো জন নবীন কবির লেখা ছিল সেই সংকলনে। সত্তর দশকের কবিতার প্রথম সংকলন। কবিতা সিংহ সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, এই কবিদের কয়েকজন নিশ্চিতই একদিন দাপিয়ে বেড়াবে বাংলার কবিতাকাশে। ওই সংকলনে মৃদুলের সঙ্গে কবিতা ছিল অনন্য রায়, তুষার চৌধুরী, রণজিৎ দাশ ও আরও কয়েকজনের।

১৯৭৫

হায়ার সেকেন্ডারির পর মৃদুল ভর্তি হয়েছিলেন উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজে। কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে। পরে অবশ্য জুলজিতে চলে গেলেন। ১৯৭৪-এ ফাইনাল পরীক্ষা দিলেন। রেজাল্ট বেরোল ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি। স্নাতক হলেন তিনি।



প্রথম পুরস্কার, ন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাওয়ার্ড; ১৯৭৬

১৯৭৬

আবার নিজের স্কুলে ফিরলেন মৃদুল। তবে এবার শিক্ষক হিসেবে। বায়োলজির শিক্ষক। জীবনের প্রথম চাকরি। শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশনে। তবে মাস কয়েকের মধ্যেই ছেড়ে দেন শিক্ষকতার চাকরি। কারণ মজার!

১) তিনি মনে করেছিলেন, তাঁর শিক্ষকদের মতো যোগ্য নন তিনি।

২) তাঁর বয়স কম ছিল। ছাত্রদের শুধু বন্ধুর মতোই মনে হত। (১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে মাও সে তুং-এর মৃত্যুর দিন ছাত্ররা ছুটি চায়। মৃদুলই দরখাস্ত লেখেন হেডস্যারের কাছে। স্কুলে ছুটি দেওয়া হয়।)

৩) তাঁর কাছে স্কুলে পরে যাওয়ার মতো সাদা বা হালকা রঙের জামা ছিল না বিশেষ। সবই ছিল রং-চঙে।

এই বছরেই নবীন লেখক হিসেবে 'ন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাওয়ার্ড' পান মৃদুল দাশগুপ্ত। আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

আমি আর পিপি (১৯৭৭)
সংবর্ত প্রকাশনী, জগদ্ধাত্রীপাড়া, সেওড়াফুলি
দাম ১ টাকা

মৃদুল দাশগুপ্তের প্রথম বই। গল্পের বই। তিনটি গল্প। বাল্য বয়সে গোপন করে লেখা। হাংরি জেনারেশনের লেখকরা প্রভাবিত করেছিলেন তাঁকে। শেওড়াফুলির কিছু বন্ধু খানিকটা জোর করেই বের করেছিল এই বইটি।

১৯৭৮

সাংবাদিক হওয়ার একটা ইচ্ছে ছিল মনে-মনে। রাজনৈতিক কাগজে সাংবাদিকতাও করেছিলেন কম বয়সে। স্কুলের চাকরি ছেড়ে সাংবাদিকতাকে পেশা করলেন তিনি। যোগ দিলেন পাক্ষিক কাগজ *পরিবর্তন*-এ। পরে সাপ্তাহিক হয়। সেখানে পুরোদস্তুর রিপোর্টিং-এর কাজ।

পরিবর্তন-এর হয়েই একবার চম্বল যাত্রা। চম্বলে তখন ফুলনদেবী, মালকান সিং-দের রাজত্ব। দেড়মাস ছিলেন। দস্যুদের উত্থান-কাহিনির উপর প্রতিবেদন পাঠাতেন। পরে গেলেন দণ্ডকারণ্যে। বাঙালি উদ্বাস্তুদের সংবাদ সংগ্রহ করলেন। প্রায় মাস খানেক ধরে।

তবে *পরিবর্তন*-এ উল্লেখযোগ্য খবর করা বলতে, মৃদুলের মনে আসে জাহাজের নাবিকদের নিয়ে করা একটি কভার স্টোরি। ভারতীয় নাবিকরা মাঝ-সমুদ্রে মারা গেলে, তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হত। আর অফিসাররা মারা গেলে, কাছের কোনো বন্দর থেকে কফিনে করে পরিবারের কাছে মৃতদেহ পাঠানো হত। এই খবর লেখার পর, বিষয়টি উঠেছিল লোকসভায়। ডায়মন্ড হারবারের সিপিএম সাংসদ জ্যোতির্ময় বসু তুলেছিলেন বিষয়টি। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বদলে নতুন আইন হয়েছিল।

১৯৮০

স্কুল থেকেই আঁকাআঁকি করতেন। অভ্যাস ছিলই। আশির দশকের গোড়ায় রানাঘাটের 'প্রতিমা' নামে একটি দোকানের সাইনবোর্ডের লে-আউট করে দিয়েছিলেন। পরে হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের উপর একটি রেস্তোরাঁ 'পিপীলিকা'-র সাইনবোর্ডও তিনি করেছিলেন। এঁকেছেন পাঁচ-ছটি বই-এর প্রচ্ছদও। নিজের বই *আমি আর পিপি*-র প্রচ্ছদও তাঁর করা। *শত জলঝর্নার ধ্বনি*-র প্রথম প্রচ্ছদও তিনি এঁকেছিলেন।

জলপাইকাঠের এসরাজ (১৯৮০)
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৮০
সাহিত্যচক্র (দেশকাল), কলকাতা-২, দাম ৪ টাকা
দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৯২
প্রতিভাস, কলকাতা-২, দাম ১৫ টাকা
তৃতীয় প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১০
পরম্পরা, কলকাতা-৯, দাম ৬০ টাকা

মৃদুল দাশগুপ্তের প্রথম কবিতার বই। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত লেখা কবিতা। ছোটোবেলা থেকে কলেজ পাশ করে কর্মজীবনের শুরু পর্যন্ত লেখা নানা কবিতা রয়েছে বইটিতে।



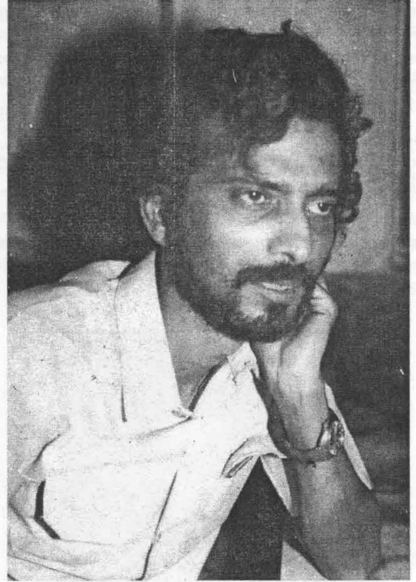
বন্ধু দীপক রায়চৌধুরীর (বাঁদিকে) সঙ্গে; ১৯৮০

১৯৮১

পরিবর্তন-এ গোল বাঁধল একটা সংবাদ নিয়ে। ব্যান্ডেলের দিকে এক সন্ন্যাসীকে মেরে ফেলা হয়েছিল। গণপিটুনিতে। ছেলেধরা সন্দেহে। সম্পাদকমশাই খবরটি অন্যরকমভাবে লিখতে বলেন। রাজনৈতিক কারণে। মৃদুল প্রতিবাদ করলে ঝগড়াঝাটি হয়। রেগে চাকরি ছেড়ে চলে আসেন। এরপর রাস্তায় কিছুদিন ঘোরাঘুরি।

১৯৮১-৮২

এই সময় একদম বেকার। কিছু উপার্জনের প্রয়োজন হল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিছু বই দিয়েছিলেন *দেশ* পত্রিকায় রিভিউ করার জন্য।



যুগান্তর-এর ক্যান্টিনে; ১৯৮৬

১৯৮২

একদিন শ্রীরামপুরে একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন মৃদুল। *যুগান্তর*-এর যুগ্ম সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী আক্ষরিক অর্থেই তুলে নিয়ে যান তাঁকে। *যুগান্তর*-এর বাগবাজার অফিসে বসান। মূলত ডেস্কের চাকরি হলেও বাংলাদেশে নির্বাচন কভার করতেও গিয়েছিলেন। প্রবীণ সাংবাদিকরা বলেছিলেন, স্পেশালাইজেশন করার জন্য বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কাকে বেছে নিতে। মৃদুল বাংলাদেশেই মনোনিবেশ করেন।

১৯৮৫

যদিও ১৯৭৪-এ লিখেছিলেন *বিবাহ প্রস্তাব*। কিন্তু যাকে প্রস্তাব, সেই মেয়েটি সাড়া দেয়নি। সাড়া পেলেন আরও অনেক পরে। অন্য একজনের কাছে। মাধবী। একটি পিকনিকে প্রথম আলাপ। ১৯৮৫-র ১০ মার্চ বিয়ে। স্ত্রীকে ডাকেন 'মুনমুন' নামে।

এভাবে কাঁদে না (১৯৮৬)
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৮৬
প্রতিভাস, কলকাতা-২, দাম ৬ টাকা

পরিবর্তন-এ যখন গণ্ডগোল চলছে, তখন লেখা এই বই-এর কবিতাগুলি। অনেকগুলিই অফিসে বসে লেখা। ডায়েরিতে। এই কবিতাগুলিই একমাত্র ডায়েরিতে লেখা হয়েছিল। বাকি সব লুজ কাগজে। রাজনৈতিক উত্থানপর্বের পর আশির দশকের শুরুতে আত্মসমর্পণের, মানুষের নতজানু হওয়ার সময়ের কবিতা এগুলি। এ বই-এর ভাষা সংযমের।

১৯৮৮

একমাত্র সন্তান মন্দাক্রান্তার জন্ম। ২৬ আগস্ট। জুলজিতে এমএসসি করে এখন কলকাতার একটি কলেজে গেস্ট লেকচারার। ইচ্ছে, গবেষণা করার। মন্দাক্রান্তার ডাকনাম 'ঘ্যাংঘুং'। ডাকনামকরণের পিছনে আছে ছোট্ট মজার গল্প। মেয়ের জন্মের পর স্ত্রীকে দেখতে যেতেন টালার নার্সিংহোমে। দেখে, অফিস যাওয়া। মাঝে এক চিনা রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়া সারতেন। 'তাইওয়া'। কাউন্টারে এক চিনা মহিলা ফুটফুটে একটি বাচ্চা কোলে বসে। ঠিক সে-সময় শিশুদের সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ মৃদুলের। মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাচ্চাটির নাম কী'? মহিলা উত্তর দিলেন, 'মি ফুং'। পাল্টা প্রশ্ন করলেন মহিলা, 'তোমার বাচ্চা আছে?' মৃদুল গর্বের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'।

— 'তার নাম কী?'

মুহূর্তে মৃদুল বানিয়ে বললেন — 'ঘ্যাংঘুং'!

সদ্যোজাতিকার নামকরণ হল।

গোপনে হিংসার কথা বলি (১৯৮৮)

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮৮

প্রতিভাস, কলকাতা-২, দাম ১০ টাকা

এই প্রথম সিরিজের কবিতা লেখা শুরু। এই বইতে কিছু অন্য কবিতা থাকলেও রয়েছে *রান্নাঘর* সিরিজের কবিতাই।

১৯৮৯

২৯-৩০ সেপ্টেম্বর। এক অভিনব সমাবেশ হল কৃষ্ণনগরে। বাংলা ভাষায় ছোটো পত্র-পত্রিকায় যাঁরা লেখালিখি করেন, তাঁরা একত্রিত হলেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়। আসাম, অবিভক্ত বিহার, এমনকী বাংলাদেশ থেকেও কবি-সাহিত্যিকরা এলেন। মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে মৃদুলও। তাঁরা একত্রে সাহিত্যের বাণিজ্যিকিকরণের বিরোধিতা করলেন। শপথ নিলেন, বাণিজ্যিক কাগজের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা নয়। প্রকাশিত হল 'শত জলঝর্নার ধ্বনি'-র প্রথম সংকলন। সম্পাদনা করলেন মৃদুল দাশগুপ্ত। সেলিম পারভেজ ছদ্মনামে আঁকলেন প্রচ্ছদ। 'শত জলঝর্নার ধ্বনি' হয়ে উঠল এক আন্দোলনের নাম।

১৯৯১

১৯৯০-এর শেষদিকে *যুগান্তর* বন্ধ হব-হব। দুই সম্পাদক অমিতাভবাবু ও দেবব্রতবাবু মৃদুলকে পরামর্শ দেন *আজকাল*-এর অশোক দাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করার। তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই *আজকাল*-এ যোগ দিতে বলেন মৃদুলকে। ১৯৯১-এর ১ জানুয়ারি তাঁর *আজকাল*-এর কর্মজীবন শুরু। এখানেও মূলত ডেস্কের কাজ। তবে আজকাল-এর হয়ে বাংলাদেশের তিন-চারটি নির্বাচনও কভার করেছেন তিনি। কখনো মৃত্যু-মুখ থেকেও ফিরে এসেছেন। সাংবাদিকের কলমে উঠে এসেছে নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা। এখন দাপট বেড়েছে টিভি সাংবাদিকতার। তবু দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবন দিয়ে মৃদুল উপলব্ধি করেছেন, সাধারণ মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে মুদ্রিত খবরকেই 'সত্য' বলে মনে করে।

এখন ঘটনাচক্রে (১৯৯১)

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ১৯৯১

শত জলঝর্নার ধ্বনি গ্রন্থমালা, দাম ৩ টাকা ৫০ পয়সা

এটা বই নয় সে অর্থে। এই পুস্তিকার লেখাগুলি ঢুকেছিল *সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ*-এর ভেতর।

১৯৯২

বাবরি মসজিদ ভাঙার আগেই শ্রীরামপুর ছেড়ে বরানগরের ভাড়াবাড়িতে চলে আসেন মৃদুল। পারিবারিক অঘটনের কারণেই বাসস্থান পরিবর্তন, মন খারাপ করেই প্রায় আঠেরো বছর কাটান বরানগরে। ষষ্ঠীতলা অঞ্চলে গোপাল দাস ঠাকুর রোডে দু-টি ভাড়াবাড়িতে। তবে শ্রীরামপুরের মাটিতে আবার ফেরার আয়োজন শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। কয়েকটি ছেলে শ্রীরামপুরে একখণ্ড জমি বিক্রি করেন তাঁকে। হাতে লেখা চুক্তিপত্রে। ধীরে-ধীরে টাকা শোধ করার প্রতিশ্রুতিতে হয়েছিল জমির লেনদেন।

ঝিকিমিকি ঝিরিঝিরি (১৯৯৭)

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৯৭

প্রতিভাস, কলকাতা-২, দাম ২০ টাকা

কেউ ছড়া চাইলেই ছড়া লেখেন মৃদুল। ছোটোবেলা থেকেই লেখেন। বেনামেও অনেক ছড়া লিখেছেন। অনেক হারিয়েও গেছে। সেইসব ছড়া নিয়েই তাঁর প্রথম ছড়ার সংকলন।

১৯৯৮

জলপাইকাঠের এসরাজ-এর জন্য 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার' পান মৃদুল দাশগুপ্ত।

সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ (১৯৯৮)

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

প্রতিভাস, কলকাতা-২, দাম ৩৫ টাকা

দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০৬

পত্রলেখা, কলকাতা-৯, দাম ৪০ টাকা

এই বই-এ *আরও রান্নাঘর* সিরিজের কবিতা রয়েছে। পনেরো-ষোলো বছর ধরে লেখা কবিতাগুলি।

আমপাতা জামপাতা (১৯৯৯)

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৯

কুসুমের ফেরা প্রকাশন, ডায়মন্ড হারবার, দাম ১০ টাকা

আশি-নব্বই দশকের নানা ছড়া নিয়ে মৃদুল দাশগুপ্তের ছড়ার বই।

একটি রূপকথা (১৯৯৯)

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৯৯

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণ কমিটি, কলকাতা-৩১, দাম ৮ টাকা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতাই লিখিত আকারে প্রকাশিত হয় *একটি রূপকথা* নামে।

নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৯)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৯৯

অফবিট, কলকাতা-৮৯, দাম ৫০ টাকা

নব্বই-এর দশক পর্যন্ত প্রকাশিত কবিতার সংকলন। প্রকাশিত বই-এর কবিতাগুলি ছাড়াও সংযোজিত হয়েছে কয়েকটি অন্য কবিতাও।

•

২০০০

সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ-র জন্য পান বাংলা আকাদেমির 'সুনীল বসু-অনিতা বসু পুরস্কার'।

প্রেমের কবিতা (২০০১)

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০১

পত্রলেখা, কলকাতা-৯, দাম ৮ টাকা

বাছাই করা কয়েকটি প্রেমের কবিতা রাখা হয়েছে বইটিতে।

২০০১-০২

মুক্ত মানুষের পদ্য-তে মৃদুল লিখেছিলেন — 'আমাকে তুলে ধরেছেন স্বয়ং বাঁকুড়া জেলা'। ২০০১-০২ সাল নাগাদ সেই বাঁকুড়া জেলাতেই গিয়েছিলেন তিনি। বিষ্ণুপুরের এক কবিতাপাঠক রিকশাচালকের সঙ্গে আলাপ। মৃদুলকে চিনতে পেরে সেই রিকশাচালক সদলবলে এসেছিলেন। তাঁর হাতে তুলে দেন দু-টি মাটির ঘোড়া। অনেক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। কিন্তু সেই উপহারই তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় 'পুরস্কার'। সেদিন, চোখে জল এনে দিয়েছিল।

ছড়া ৫০ (২০০১)
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০০১
পত্রলেখা, কলকাতা-৯, দাম ২০ টাকা
পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ের ছড়া রেখেছেন এই বই-এ।

কবিতা সহায় (২০০২)
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০০২
অফবিট, কলকাতা-৮০, দাম ৫০ টাকা
মৃদুল দাশগুপ্তের গদ্যের বই। লিটল ম্যাগাজিনে বিভিন্ন সময়ে লেখা গদ্য নিয়েই *কবিতা সহায়*। কবিতাময় ভ্রমণ।

ধানখেত থেকে (২০০৭)
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৭
কলম প্রকাশনী, জলপাইগুড়ি, দাম ১০ টাকা
দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১১
সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা-৯, দাম ৬০ টাকা
সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বের লেখা জায়গা পেয়েছে এই বই-এ। মৃদুল মনে করেন, এই কবিতাগুলি শুধু কবিতার পাঠকের জন্য নয়। জনসাধারণের উদ্দেশে লেখা। প্রতিবাদের কবিতা।

রঙিন ছড়া (২০০৮)
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৮
লিডার, কলকাতা-৩৬, দাম ৩০ টাকা
মূলত কেজি ক্লাসের বা প্রাথমিকের স্কুলপাঠ্য হিসেবে লেখা এই ছড়ার বই। যুক্তাক্ষর বর্জিত।

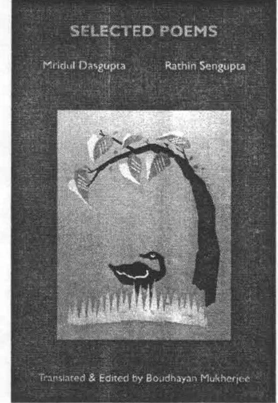
কবিতা সংগ্রহ (২০০৯)
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৯
অফবিট, কলকাতা-৯, দাম ১০০ টাকা
নির্বাচিত কবিতা-র বর্ধিত সংস্করণ। যুক্ত হয়েছে ১৯৯৯ থেকে ২০০৯-এর মধ্যে প্রকাশিত বই-এর কবিতা। কয়েকটি নতুন লেখাও।

সাত পাঁচ (২০০৯)
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০০৯
পত্রলেখা, কলকাতা-৯, দাম ৬০ টাকা
দ্বিতীয় প্রবন্ধের বই। নানাধরনের টুকরো গদ্যের সংকলন। মিশে আছে কবিতা, বেড়ানো, ব্যক্তিগত কথাবার্তা।

২০১০
আঠেরো বছর আগে স্বপ্নের বীজ বুনেছিলেন। তা বাস্তবের রূপ নিল। তৈরি হল 'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ'। শ্রীরামপুরের সেই একখণ্ড জমিতে নিজের বাড়ি। বরানগর থেকে স্বভূমে প্রত্যাবর্তন।

সোনার বুদ্বুদ (২০১০)
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১০
সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা-৯, দাম ৫০ টাকা
এই বইতে *নতুন কবিতা* লিখলেন মৃদুল। এই বই-এর কবিতাগুলি প্রায় বারো বছর ধরে লিখেছেন তিনি।

Selected Poems (২০১০)
with Rathin Sengupta (Translated by Boudhayan Mukherjee)
First Edition : September, 2010
Nandimukh Sansad, Kolkata-78, Price Rs. 50
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অবাঙালি অঞ্চলে কবিতাপাঠের আসরে নিজের কবিতার অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। উদ্যোগ নেননি। রথীন সেনগুপ্তের উদ্যোগেই তাঁর কবিতার অনুবাদ হল এই প্রথম।



২০১১
ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান পেরোগ্রাম। সেখানকার *অভিষেক* পত্রিকার তরফে মৃদুলকে 'ভারতচন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

প্রিয় ২৫ (২০১১)
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০১১
শব্দহরিণ, কলকাতা-৯৫, দাম ১০ টাকা
নিজের বাছাই করা পঁচিশটি কবিতার সংকলন। মূলত ভালোবাসার কবিতাই আছে এই সংকলনে।

২০১২
সোনার বুদ্বুদ কাব্যগ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান মৃদুল দাশগুপ্ত।

২০১৩
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের বাংলা পাঠক্রমে স্থান পেয়েছে মৃদুল দাশগুপ্তের বিভিন্ন লেখা।

'আমি শম্ভু রক্ষিতকে ঈর্ষা করি। তিনি সমস্ত জগৎ ভুলে কবিতার কাজ করে চলেছেন।' মৃদুলের সরল স্বীকারোক্তি। ব্যক্তিগতভাবে নিজেকেও সেই জায়গায় নিয়ে এসেছেন। এখন যে-কাজই করেন, তা কবিতারই কাজ মনে করেন। খবর লিখতে বসেও ভাবেন, এ কবিতারই কাজ। নাওয়া-খাওয়ার মতোই কবিতা তাঁর জীবনযাপনের অতি প্রয়োজনীয় কৃত্য। করতেও চান শুধুই কবিতাযাপন। বলেন, 'শম্ভু রক্ষিতের মতো হতে পারিনি এখনও'। সেই ইঙ্গিত লক্ষ্যেই হেঁটে চলেছেন অক্লান্ত 'কবিতা-কৃষক' মৃদুল দাশগুপ্ত।

মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা



www.facebook.com/groups/bodhshabdo/
https://twitter.com/#!/Bodhshabdo

ষোড়শ সংখ্যা, ত্রয়োদশ বর্ষ : পৌষ ১৪১৯, জানুয়ারি ২০১৩

বিনিময় মূল্য : ১০০ টাকা